Written strictly according to the Syllabuses of Calcutta
and Burdwan Universities for
POLITICAL SCIENCE (PAPER II)
For Three-year Degree Course

আধুনিক শাসনব্যবস্থা

(Paper II)

[Constitutions]

ত্রিবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের
পাঠ্যপুস্তক

স্কটিশচার্চ কলেজের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক
ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেকচারার এবং পশ্চিমবঙ্গ
বিধান পরিষদের সদস্য, 'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে'র অন্যতম গ্রন্থকার
অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ. এল. এল. বি.

ও

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক 'ধনবিজ্ঞান ও
পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা' ও 'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে'র অন্যতম গ্রন্থকার
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চক্রবর্তী এম. এ.

নবারুণ প্রকাশনী
সি ৫১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
সুবোধ রায়
নবারুণ প্রকাশনী
সি ৫১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট—১৯৬০

ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রক

শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

দিলীপ মুখোপাধ্যায়
বাণীরেখা প্রেস
২৭৫, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

* এই পরিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে 'দ্বিতীয়' পরিচ্ছেদ—মুদ্রণপ্রমাদের ফলে 'তৃতীয়' হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং ইহার ভিত্তিতেই পরবর্তী সব পরিচ্ছেদগুলি পর্য্যায়ক্রমে সংখ্যাভুক্ত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সব পরিচ্ছেদগুলির সংখ্যাই এক কমাইয়া গণনা করিতে হইবে।

সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

ভূমিকা

গত বৎসর প্রকাশিত আমাদের 'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান' অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে জ্ঞানান্বেষী পাঠক সাধারণ কর্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা 'আধুনিক শাসনব্যবস্থা' নামক বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রণয়নে উৎসাহিত হইয়াছি। 'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান' ত্রি-বার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার প্রথম পত্রের পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে লিখিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকখানি ত্রি-বার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার দ্বিতীয় পত্রের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রণীত হইয়াছে।

আমরা কতদূর সফলকাম হইয়াছি, তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক মণ্ডলী বিচার করিবেন। যদিও পুস্তকখানি ত্রি-বার্ষিক বি. এ. পাশ পরীক্ষার (Pass Course Examination) জন্য লিখিত, তথাপি পুরাতন বি. এ. (পাশ) পরীক্ষার্থী, অনার্স পরীক্ষার ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠকবর্গ এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি।

শ্রীনির্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীশ্যামল কুমার চক্রবর্তী

শাসনব্যবস্থার ভূমিকা

১। শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি

শাসনব্যবস্থার স্বরূপ :
১। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল ও
২। জাতির ঐতিহ্য ও জীবন-বোধের প্রতীক

মনুষ্য জীবনের যেমন একটি আদর্শ ও উদ্দেশ্য আছে, তেমনি রাষ্ট্রজীবনও উদ্দেশ্যবিহীন নহে। প্রতি রাষ্ট্রের গতি ও কর্মপন্থার মূলে কোন না কোন লক্ষণীয় আদর্শ সক্রিয় রহিয়াছে। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এই আদর্শকেই প্রতিফলিত করিতেছে। শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র তাহার অভীষ্টলাভে সচেষ্ট হয়। তাই শাসন ব্যবস্থাকে নিছক যন্ত্র হিসাবে গণ্য করা উচিত নহে। ইহা জাতীয় রাষ্ট্রের ও জাতীয় সভ্যতার পরিচয় বহন করে। জাতীয় ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে এক একটি রাষ্ট্রে এক এক প্রকার শাসনব্যবস্থা প্রকটিত হয়। এখানে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইতিহাস বলিতে আমরা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং জাতির ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথাই বুঝি। অর্থাৎ রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা অনেকাংশে জাতির সামগ্রিক জীবন বিকাশের প্রতীক।

যুক্তরাজ্যের শাসন পদ্ধতির প্রকৃতি :
১। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র
২। পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা

যুক্তরাজ্যের শাসন ব্যবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ব্রিটিশ জাতির ধ্যান ধারণা, মনন-আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম ও মানবতাবোধ, স্বাধীনতা লিপ্সা ও শৃঙ্খলা বোধ ও অর্থনৈতিক আদর্শ যুক্তরাজ্যের শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে। ব্রিটিশ জাতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও জনগণনির্বাচিত বিধান-মণ্ডলীর (পার্লামেন্টের) নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। ১২১৫ সালে ভূস্বামীবর্গ রাজা জনের নিকট হইতে নাগরিকগণের অধিকার সম্বলিত সনদ আদায় করিয়া লইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাজা প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লস-এর বিরুদ্ধতা করিয়া পার্লামেন্টের সর্বময়তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। ১৬২৮ সালের 'অধিকারের দরখাস্ত' (Petition

of Rights) এই সাহসী প্রয়াসের প্রমাণ বহন করিতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পিউরিটান বিপ্লব ও ১৬৮৮ সালের 'মহান বিপ্লব' (Glorious Revolution) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য দিতেছে। দেখা যাইতেছে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্ষমতাশালী রাজন্য-বর্গের সহিত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংঘর্ষ হইয়াছে। ইহার ফলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মালিকের নিরঙ্কুশ অধিকার, পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মধ্যে এই নীতিগুলি স্থায়ী স্থান অধিকার করিয়া ইহাকে একটি বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্রিটিশ জাতির রিফরমেশন (ষোড়শ-শতাব্দী) যুগের ধর্মবিষয়ক মতামত ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের শিল্প বিপ্লব যুক্ত রাজ্যের শাসনপদ্ধতির উপর স্থায়ী ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। সুতরাং সংক্ষেপতঃ বলা চলে যে, ব্রিটিশ জাতির জীবন-বোধ, যাহা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা শাসনপদ্ধতির উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা গঠন করিয়াছে যাহার ভিতর দিয়া যুক্তরাষ্ট্রবাসীর ইতিহাস এবং ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ জীবন বিষয়ক চিন্তাধারা প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক মতামতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে একদল ইংরেজ নিজস্ব ধর্মমতের স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকাতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহারা ইতিহাসে Pilgrim Fathers নামে পরিচিত। এই সমাজটি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে ম্যাসাচুসেট্‌স্ নামক স্থানে নূতন বাসস্থান পত্তন করিয়া শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। Pilgrim Fathers প্রবর্তিত স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নীতি পরবর্তীকালে উত্তর আমেরিকার সকল উপনিবেশ গুলিকে প্রভাবিত করে এবং উত্তর আমেরিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের পর, যখন স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় তখন ঐ নীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য হয়। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার উপনিবেশগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং প্রতিটি উপনিবেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৯ পর্যন্ত আপনাপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে। যখন এই স্বাধীন উপনিবেশগুলিকে একত্রীভূত করিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ফিলাডেলফিয়া সংবিধান পরিষদে আলোচিত হয় (১৭৮৭-৮৯) তখন স্বাভাবিক,

যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ :
১। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য
২। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা

ভাবেই প্রতিটি স্বাধীন উপনিবেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নীতি গৃহীত হয়। এই কারণেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল তাহার ইতিহাসে নিহিত রহিয়াছে।

সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনপদ্ধতির মূলকথা—গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন জাতির রাষ্ট্রনৈতিক সমন্বয়

সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে এই ক্ষুদ্র জাতিটি মধ্য যুগ হইতে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বিরুদ্ধ শক্তি অস্ট্রিয়ার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত আপন স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা স্পৃহা এই জাতির ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে লিখিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সুইটজারল্যাণ্ডের প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীগণ তাহাদের আঞ্চলিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। তাই দেখিতে পাই যে, সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন পদ্ধতিতে প্রাগ্রসর প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ও যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিতর দিয়া আঞ্চলিক আত্মকর্তৃত্ব রক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ সুইটজারল্যাণ্ড প্রাচীনকাল হইতে অন্ততঃ তিনটি সভ্যতার মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী, জার্মান ও ইটালিয়ান সংস্কৃতি এই দেশে পাশাপাশি দীর্ঘকাল বিরাজ করিয়াছে। এই মিলনের ফলে এই তিনটি বিভিন্ন ধারা শাসনপদ্ধতিতেও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সরকারী ভাষা ও সরকার গঠন পদ্ধতির মধ্যে এই তিনটি ভাষাভাষী মানুষের অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এই স্থলেও আমরা দেখিতে পাই যে, শাসনতন্ত্র এক হিসাবে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

রাশিয়ার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি—শ্রেণীহীন সমাজ, সমাজতন্ত্র, ও শেষ পর্যায়ে কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদ স্থাপন

আধুনিক রাশিয়ার ইতিহাস ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লব হইতে শুরু হইয়াছে। শ্রেণী ও ধনতন্ত্রের বিনাশ, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অবশেষে সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন এই বিপ্লবের মূলনীতি; সোভিয়েট শাসনপদ্ধতি এই কয়টি নীতির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ সোভিয়েট শাসনপদ্ধতির মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সোভিয়েট বিপ্লবের মৌলিক আদর্শগুলির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য।

ভারতীয় সংবিধানে ভারতবাসীর পুরাতন ঐতিহ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বোধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, শান্তিপ্রাণতা, অশিক্ষা, ও সামাজিক অসাম্যের

অবসানের আধুনিক সজ্জা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কল্পে ভারতবাসীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা ভারতীয় শাসন পদ্ধতির উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অন্য পক্ষে ব্রিটিশ শাসন আমলের বিভিন্ন কালে প্রবর্তিত ভারতের শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন আমাদের সংবিধানটিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, ও রাষ্ট্র দর্শনে শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীগণ দীর্ঘকাল হইতে যুক্ত রাজ্যের ও আমেরিকার গণতন্ত্রকে প্রশংসার চক্ষে দেখিয়াছে। ভারতীয় সংবিধান যখন গঠিত হয় তখন এই বুদ্ধিজীবীগণই নেতৃত্ব করিয়াছেন। তাই ভারতের সংবিধানে যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার শাসনপদ্ধতির সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের আলোকে আমরা ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই।

ভারতীয় সংবিধান
১। স্বায়ত্ত শাসন ও স্বাধীনতার আন্দোলন
২। পাশ্চাত্য গণ-তান্ত্রিক আদর্শ ও
৩। ব্রিটিশ আমলের ভারত শাসন আইন

শাসনপদ্ধতি মোটামুটি ভাবে জাতীয় চরিত্রের প্রকাশক, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। জাতীয় জীবন নানা ভাবে বিকশিত হয়। সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও জীবন যাত্রার প্রণালীর মধ্যে যেমন জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাহাদের শাসনব্যবস্থাও জাতি-সত্তাকে উদ্ঘাটিত করে।

সমাজ-দার্শনিক কার্ল মার্কস্ শাসনব্যবস্থাকে জাতির ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়া বলিতেছেন যে, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রতি দেশের বিভিন্ন কালের শাসনপদ্ধতি শ্রেণী স্বার্থবাহী। অর্থাৎ যে অর্থনৈতিক শ্রেণী উৎপাদন প্রথার উপর আপন ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হয় এবং ধনোৎপাদনের উৎসগুলি করায়ত্ত করিতে পারে, দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাই আপনাদের স্বার্থ কায়েম করিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া বসিয়াছে ও তাহা শাসনপদ্ধতির মধ্য দিয়া ব্যবহার করিয়াছে। লেনিন বলিয়াছেন যে, ক্ষমতাশালী মালিক শ্রেণী মাঝে মাঝে শোষিত শ্রেণীর স্বার্থানুকূল ছোট-খাটো অধিকার দিয়াছে। তিনি আরও বলিতেছেন যে, মালিক শ্রেণীর ক্ষমতা কায়েম করাই এই অনুগ্রহ বণ্টনের গূঢ় উদ্দেশ্য। প্রাচীনকালের দাসপ্রথা, মধ্যযুগের ভূম্যধিকারীগণের শাসন এবং শিল্প বিপ্লবের পরে পুঁজিপতিদের একাধিপত্য শ্রেণী শাসনব্যবস্থা বই কিছুই নহে।

শাসনতন্ত্রের মার্কস্‌বাদী ব্যাখ্যা

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিপতিগণের স্বার্থানুকূল শাসনপদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাসনব্যবস্থার সহিত রাষ্ট্র ও সমাজে ক্ষমতাশালী মালিক শ্রেণীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। সুতরাং শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ বুঝিতে হইলে তাহার পশ্চাতে যে ক্ষমতাশালী মালিক শ্রেণী সক্রিয় রহিয়াছে তাহাদের প্রকৃত রূপ জানিয়া লইতে হইবে।

শাসনব্যবস্থা বিষয়ে আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিকগণের মন্তব্য

আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিকেরা অনেকে মার্কস-এর এই বিশ্লেষণ স্বীকার করিয়া লইতেছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন : "The State, as it operates, does not deliberately seek general justice, or general utility, but the interest in the largest sense, of the dominant class in society." অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বলা যায় যে রাষ্ট্র তাহার শাসনব্যবস্থার ভিতর দিয়া প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তৎপর হয়। অধ্যাপক ফাইনার শাসনব্যবস্থার উপর অর্থনীতির প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে মোটামুটি ভাবে মার্কস্-এর নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন : "He who has, governs"। অর্থাৎ সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাই শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইহা সাধারণ ভাবে সত্য। তবে মানুষের শুভবুদ্ধি ও তজ্জনিত প্রচেষ্টা কখনও কখনও, স্থানে স্থানে এই নিয়ম হইতে বিচ্যুতি ঘটাইতে প্রয়াস পাইয়াছে।

২। কন্‌স্টিটিউশন শব্দের অর্থ (Meaning of Constitution)

Constitution শব্দটির দুই অর্থ—
১। সংবিধান

পাশ্চাত্য জগতে রাষ্ট্রশাসন-আইনের (Constitutional Law) আলোচনায় Constitution শব্দটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল দেশে লিখিত সংবিধান আছে, সেই সকল দেশে Constitution বলিতে সংবিধানকেই বুঝায়। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যে লিখিত সংবিধান আছে তাহাতে ঐ দেশগুলির শাসনব্যবস্থার প্রায় সকল নীতিগুলিই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সংবিধানকেই ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে Constitution বলা হয়। বলা বাহুল্য যুক্তরাজ্যে এইরূপ লিখিত সংবিধান নাই। যদিও শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু বিষয়ে বিচ্ছিন্ন দুই [illegible] আইন পাওয়া যায়, তথাপি ইহা সত্য যে ব্যাপকভাবে লিখিত শাসন [illegible]

শাসন দেওয়া যাইতে পারে। ফরাসী রাষ্ট্রশাসন-আইন-বিদ্ টকেভিল (Toqueville) সেইজন্য বলিয়াছেন "...The English Constitution has no real existence"—অর্থাৎ ইংলণ্ডে Constitution বা সংবিধান বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যুক্তরাজ্যের বাইরে Constitution বলিতে সংবিধানকেই মনে করাইয়া দেয়।

কিন্তু Constitution কথাটির অন্য অর্থ রহিয়াছে। ইংরেজ রাষ্ট্র আইনজ্ঞগণ Constitution বলিতে সমগ্র শাসনব্যবস্থাকেই মনে করেন। তাহারা বলেন যে, এই শাসনব্যবস্থার কিছুটা অংশ লিখিত থাকিতে পারে, কিছুটা আবার প্রয়োগ ব্যবস্থা ও চিরাচরিত প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মাবলী লইয়াই Constitution গঠিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধান আছে বটে, কিন্তু শাসনপদ্ধতির কিছুটা লক্ষ্যণীয় অংশ দীর্ঘকাল-আচরিত প্রথার উপর নির্ভর করিতেছে। লিখিত সংবিধান ও প্রথা সমষ্টি—এই সমস্ত লইয়াই যে শাসন ব্যবস্থা গঠিত হইযাছে তাহাকেই Constitution বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রশাসন আইনবিদগণের মতে Constitution অর্থাৎ সংবিধান এবং Government বা শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তাহাদের মতে Constitution বলিতে শাসন সংক্রান্ত সমগ্র বিধানাবলীকেই বুঝায়।

২। Government বা শাসন ব্যবস্থা

আমাদের দেশে লিখিত:সংবিধান রহিয়াছে। ইহা সংবিধান মণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত হইয়া ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি প্রবর্তিত হইয়াছে। Constitution বলিলে লিখিত সংবিধানকেই লক্ষ্য করা হয়। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নানা প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে। সংবিধান ও উপরোক্ত প্রথা সমষ্টিকেই শাসন ব্যবস্থা বলা সমীচীন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, Constitution-এর এক অর্থ হইতেছে সংবিধান; অন্য অর্থে—Constitution সমগ্র শাসনপদ্ধতির দ্যোতক।

৩। শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু
(Content of the Constitution)

যে সকল লিখিত আইন ও প্রথাদ্বারা দেশের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনপদ্ধতি পরিচালিত হয় তাহাকে শাসনব্যবস্থা . Constitution or Government

বলা যাইতে পারে। শাসন ব্যবস্থার বিষয়বস্তুগুলি নিম্নলিখিত ভাবে উল্লেখ করা যায় :—

১। প্রথমতঃ সকল রাষ্ট্রই আইনের ভিত্তিতে গঠিত। এইজন্য আইন বিভাগ (The Legislative) সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। এই আইন ব্যবস্থার অংশ হিসাবে রাজনৈতিক দল সম্বন্ধীয় আলোচনা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

২। দ্বিতীয়তঃ শাসন বিভাগ (The Executive): এই বিভাগটি আইনানুযায়ী জীবন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকারী। সেই কারণে শাসনতন্ত্রের আলোচনা অবশ্য করণীয়। শাসন বিভাগ বলিলে আমরা উচ্চ-নীচ সর্বশ্রেণীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও তাহাদের কর্মাবলীর কথা বুঝি। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে ভারতের রাষ্ট্রপতি হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের নগণ্য চৌকিদার পর্যন্ত সকলেই এই অর্থে শাসন বিভাগের অন্তর্গত।

দেশের কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতি উভয়ই শাসন বিভাগের অংশ বিশেষ। সেইজন্য নাগরিক শাসন ব্যবস্থা (Municipal Government) ও গ্রামীন শাসন পদ্ধতিও (Village Government) এই বিভাগের আলোচনার বস্তু। আবার যুক্তরাষ্ট্র পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির আলোচনা শাসন ব্যবস্থা আলোচনার অপরিহার্য অঙ্গ।

৩। তৃতীয়তঃ বিচার বিভাগ : উচ্চ ও নীচ সর্বপ্রকারের বিচার ব্যবস্থার আলোচনাও শাসন ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অংশ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ভারতে সুপ্রীম কোর্ট হইতে শুরু করিয়া গ্রামীন পঞ্চায়েতী বিচার পদ্ধতিরও শাসন ব্যবস্থার আলোচনায় স্থান আছে।

৪। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় শাসন ব্যবস্থার অন্য একটি আলোচনার বিষয়। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা বণ্টন. একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ নির্ণয় শাসনব্যবস্থা আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৫। ব্যাপক ভাবে বিবেচনা করিলে কেন্দ্রীয় শাসন এবং নাগরিক ও গ্রামীন শাসন ব্যবস্থার আর্থিক সঙ্গতি বিষয়ক আলোচনাও শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

৬। অনেক আমেরিকান শাসনব্যবস্থাবিদ দেশের আন্তর্জাতিক নীতি

নিয়ন্ত্রণকেও শাসনপদ্ধতি আলোচনার অংশীভূত করিয়াছেন। কারণ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালনের অপরিহার্য অঙ্গ।

৭। নাগরিকত্ব ও নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় নীতি ও আইন কানুন আধুনিক সংবিধান ও শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য বিষয়। যে সকল দেশে লিখিত সংবিধান আছে, সে সকল দেশেই নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক নীতিগুলি সংবিধানে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং নাগরিক অধিকার শাসনব্যবস্থা আলোচনার অংশীভূত। যুক্তরাজ্যে লিখিত সংবিধান নাই, তথাপি সেখানে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আইন ও বিচারালয়ের বিধানানুসারে নাগরিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮। সংবিধান ও শাসন ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাগ। [এই অংশটুকুর আলোচনার জন্য বর্তমান গ্রন্থকারদ্বয় লিখিত "আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের" অন্তর্গত দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ (১১ পৃঃ হইতে ৩৬ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

আধুনিক শাসনব্যবস্থা

॥ গ্রেটব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য ॥

প্রথম অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভের প্রথম পর্যায়েই ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে চর্চা ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। বিশেষ করিয়া শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের আলোচনার প্রথম পাঠ ইহাকে লইয়াই শুরু করা অপরিহার্য। ভারতে সুদীর্ঘ ইংরেজ-শাসন, ভারতীয়দের সহিত ইংরেজজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও অসংখ্য সূত্রের বন্ধন, এবং আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের উপর, বিশেষতঃ ভারতীয় রাষ্ট্র-নৈতিক চিন্তাধারার উপর ইংরেজদের প্রভাব হইতেই যে এ প্রয়োজনের উদ্ভব, তাহা নহে। বস্তুতঃ খাস ইংল্যাণ্ডে অবাধ ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র হইতে জনপ্রতিনিধিগণের নিকট রাষ্ট্র-ক্ষমতার হস্তান্তর ও বহু শতাব্দীব্যাপী আন্দোলন, সংঘর্ষ, নিষ্পত্তির ভিতর দিয়া সাধারণের বিভিন্ন অধিকারের ক্রম-স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা, সর্বদেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুশীলনের বিষয়বস্তু হইয়াছে। অনেকে ইংল্যাণ্ডকে 'Mother of Parliaments', বা, 'পরিষদীয় শাসনব্যবস্থার জননী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিগত তিনশত বৎসর ধরিয়া ইংরেজগণ পৃথিবীর নানা অংশে উপনিবেশের পত্তন করিয়াছে, এবং সর্বত্রই বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে নিজস্ব শাসনপদ্ধতির কৌশল ও ঐতিহ্য। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত অবস্থা ও পরিবেশের সহিত প্রয়োজনমত মিলাইয়া লইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার মৌলিক রূপটি প্রায় সর্বত্রই পরিস্ফুট। শুধু ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা, প্রভৃতি পুরাতন ডোমিনিয়নগুলিই নয়, স্বাধীন সাধারণতান্ত্রিক ভারতবর্ষও ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে বহুলাংশে অনুসরণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধিকারী ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার প্রভাব বিভিন্নদেশের শাসনপদ্ধতির উপর ব্যাপকরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। এই সকল কারণেই বলা

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র অনুশীলনের গুরুত্ব

হইয়া থাকে যে ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি ঠিকমত বুঝিতে পারিলে পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার একটি মূলসূত্র অধিগত করা যাইবে।[1]

ইতিপূর্বেই আমরা 'ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা,' 'ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা', প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। আসলে ইহার সরকারী নাম হইল 'Uni'ed Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,' বা, গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য'; সরকারী দলিলে অনেক সময়ে শুধুই 'যুক্তরাজ্য' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।ইংল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও ইংলিশ্ চ্যানেলের দ্বীপকয়টি লইয়া গ্রেট ব্রিটেন। সুতরাং সুবিধার জন্ম আমরা এখানে বহুপরিচিত 'গ্রেট ব্রিটেন' নামটি ব্যবহার করিলেও, ইহা যে সমগ্র যুক্তরাজ্য সম্পর্কেই উল্লিখিত হইতেছে তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

নাম সমস্তা

প্রকৃতি ও মানুষ

শেক্‌স্‌পীয়ার সোচ্ছ্বাসে গাহিয়াছেন ঃ

"This precious stone set in a silver sea,
Which serves it in the office of a wall,
Or as a moat defensive to a house
Against the envy of less happier lands."[2]

বস্তুতঃ ব্রিটেনের দ্বীপচরিত্র তাহার রাষ্ট্রনীতিকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করিয়াছে। সুদূর অতীতে অবশ্য এংগ্‌ল্‌স, স্যাক্‌সন্‌স, জুট্‌স, ডেন্‌স্ (Angles, Saxons, Jutes, Danes) প্রভৃতি বিভিন্ন জনসমষ্টি দলে দলে সমুদ্রপথ বাহিয়া একের পর এক আসিয়া এই দ্বীপপুঞ্জের উপর আক্রমণ অভিযানে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। শেষ অভিযান ঘটে ১০৬৬ সালে, যখন নর্ম্যানরা (Normans) ইংল্যাণ্ড জয় করিয়া তাহাদের শাসন প্রবর্তিত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে সহস্রাধিক বৎসর, বিমান

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

[1] "The person who understands British Government, therefore, has a clue to the governments of many of the world's democracies." Major Foreign Powers: The Government of Great Britain—Carter, Herz, Ranney.

"Hence it is difficult for anyone to have a true understanding of any other free government unless he first gains some knowledge of its English antecedents." The Governments of Europe—Munro and Ayearst.

[2] Shakespeare: King Richard the Second, Act II, Scene I.

ও রকেটযুগের পূর্ব পর্যন্ত, ইউরোপীয় মহাদেশ হইতে আক্রমণমুখী অভিযানকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে দুর্গের চারিপাশ ঘেরা পরিখার ন্যায় প্রায় বাইশ মাইল প্রশস্ত ইংলিশ চ্যানেল।

বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে এইরূপ স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকার ফলে এখানে শক্তিশালী স্থায়ী স্থলবাহিনী (Standing Army) জিয়াইয়া রাখার প্রয়োজন ঘটে নাই। সুতরাং ইউরোপীয় মহাদেশের অন্যত্র স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তি, যথা ফ্রান্সে বুর্বঁ (Bourbons) বা স্পেনে হাপস্‌বুর্গ (Hapsburgs) রাজারা, যখন তাঁহাদের স্থলবাহিনীকে ব্যবহার করিয়াছেন জাগ্রত প্রজাশক্তিকে অবদমিত কবিবার প্রয়োজনে, সেস্থলে ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তি স্থায়ী বৃহৎ স্থল-বাহিনী গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় বিফলকাম হইয়াছেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের Bill of Rights বা 'অধিকারের বিল' পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে যে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে স্থায়ী স্থলবাহিনী বজায় রাখা বিধি-বহির্ভূত ("The maintenance of a standing army in time of peace without the consent of parliament is contrary to law.") ফলে এখানে জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে।

সাগরবেষ্টনী আবার সমুদ্র অভিযানের এক দীর্ঘ গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে নূতন নূতন বাণিজ্যপথ খুলিয়া যাইবার পর ব্রিটেন বিশ্ব-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায়। জলদস্যুতা, দাস-ব্যবসায় ও বাণিজ্যের মুনাফা এই ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে অকল্পিত অর্থের সঞ্চয় ঘটায়। বাণিজ্যের প্রেরণা ও সঞ্চিত মূলধনের শক্তির সহিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যোগাযোগে পৃথিবীর প্রথম শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হইল এই দ্বীপেরই মাটিতে। বাণিজ্যরক্ষার তাগিদে বাণিজ্যবহরের পাশাপাশি গড়িয়া উঠিল সুবৃহৎ ও প্রচণ্ড শক্তিশালী নৌ-বাহিনী। শিল্পজাত উপকরণ, লগ্নীর উপযোগী মূলধন ও শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর উপর ভর করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িল ব্রিটেনের উপনিবেশ, সাম্রাজ্য ও সমরোপযোগী নৌঘাঁটি। পাঁচ কোটি লোকের মাত্র ৮৯,০৪১ বর্গমাইলের উপর অবস্থিত (উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডকে ধরিলে ইহার সহিত আরও ৫২৪৪ বর্গমাইল যোগ করিতে হইবে) ব্রিটিশ রাষ্ট্রের বিশ্ব-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের উপর সূর্য কখনও অস্ত যাইত না ("The sun never sets on the British Empire.")।

অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সে যুগের অবসান ঘটাইয়াছে। বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতির রঙ্গমঞ্চে ব্রিটেনকে পূর্বতন প্রাধান্যের আসন ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। বিশাল পরিবর্তনের ভিতর দিয়া সাম্রাজ্য আজ কমনওয়েলথের রূপ ধারণ করিয়াছে। পারমাণবিক বোমা ও রকেট অস্ত্রের যুগে ব্রিটেনের প্রাক্তন নিরাপত্তাও আজ অন্তর্হিত হইয়াছে। আর্থিক দিক হইতেও পূর্বেকার শক্তি আর অটুট নাই।

ব্রিটেনের ক্ষুদ্রাকৃতি ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প জনসংখ্যার কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়নের প্রায় ১২,৫৯,৭৯৭ বর্গমাইল পরিধি ও ৩৬ কোটির ঊর্ধ্বে জনসংখ্যার সহিত তুলনা করিলেই পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ভারতীয় ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়ারও এত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য নাই। দেশের অধিকাংশ জনসমষ্টি অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসর এলাকায় বাস করে—লণ্ডন হইতে ট্রেণে বা মোটরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইহাদের নিকট পৌঁছান সম্ভব। স্কট্‌ল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্ প্রধানতঃ পাহাড়িয়া অঞ্চল। কিন্তু স্কটিশ্ ও ওয়েল্‌শীয় জনসমাজ সামগ্রিক জনসমষ্টির ছয়-ভাগের একভাগও নয়। এ সকলের ফলেই এক অপূর্ব জাতীয় ঐক্য এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। স্কট্‌ল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের অধিবাসিদিগের মধ্যে কিছুটা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তাহা বিভেদমূলক রূপ ধারণ করে নাই। অবশ্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় স্কট্‌ল্যাণ্ডের জন্য একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রী রহিয়াছেন এবং ১৯৫১ সালে চার্চিল তাঁহার মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর বিশেষ করিয়া ওয়েল্‌স্ সম্পর্কীয় বিষয়গুলির ভার অর্পণ করেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে ব্যাপক জনতার ভিতর আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক মনোভাব নাই। সাধারণ মানুষ মূলতঃ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নের বিচার করিয়া থাকে। ভাষাগত বা রাজ্যগত বিভেদ যেখানে প্রবল সেই ভারতীয় ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুলনা করিলেই ইহার গুরুত্ব বোঝা সহজ হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি বাছাই করিবার সময় দলগুলিকে খেয়াল রাখিতে হয় যে একজন পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা হইলে, অপরকে পশ্চিম বা মধ্য-পশ্চিম অঞ্চল হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতীয় ইউনিয়নেও উত্তরাপথ বা দাক্ষিণাত্যের সমস্যা রহিয়াছে। ব্রিটেনের মানুষ জাতীয় নেতারা কোন এলাকার লোক তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না; হাউস অব কমন্‌সের প্রার্থীকেও নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা হইতে হয় না।

জাতীয় সংহতি

লক্ষ্য করিতে হইবে যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থা (centralised government) সহজসাধ্য করিয়াছে এবং শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ সংযোগ ও পরিবহণের সুবিধার উপর ভর করিয়া সুসংহত অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে।

কেল্ট্, এঙ্গ্ল্, স্যাক্সন্, জুট, ডেন, নর্ম্যান,প্রভৃতির মিশ্রণে যে ব্রিটিশ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ভাষায়, ধর্মে ও জীবন-ধারণের পদ্ধতিতে এক অপরূপ ঐক্য ও সমন্বয়ের উদাহরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওয়েলসের শতকরা ত্রিশভাগ এখনও ওয়েল্স্ ভাষা (Welsh) বা স্কট্ল্যাণ্ডের সামান্য কিছু অংশ এখনও গেলিক (Gaelic) ভাষা হয়ত ব্যবহার করে; তাহা ছাড়া কিছু আইরিশ্, মধ্য-ইউরোপীয় বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান আগন্তুক হয়ত বর্তমান জনসমষ্টিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছে; তৎসত্ত্বেও মার্কিণ দেশের নিগ্রো সমস্যার মত কোন সংখ্যালঘু সমস্যা এখানে নাই। দলীয় নেতাদেরও নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের জাতি, কুল, বর্ণ (Caste—ভারতীয় ইউনিয়নের বৈশিষ্ট্য) প্রভৃতি খুঁজিয়া দেখিতে হয় না।

ধর্মের দিক হইতে এ জাতির মধ্যে মিলটাই প্রকট, গরমিল সামান্য। অধিকাংশ জনসমষ্টিই মূলতঃ প্রটেষ্টাণ্ট; ৫ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৪০ লক্ষের মত ক্যাথলিক। ফ্রান্স বা ইটালীতে যে ভাবে ক্যাথলিক পার্টির উদ্ভব হইয়াছে এখানে সে সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে বিভেদ রহিয়াছে। শতকরা ৫০ জন চার্চ অব্ ইংল্যাণ্ড (Church of England বা Anglican Church)-এর পথাবলম্বী; ইহা রাষ্ট্রস্বীকৃত ও রাষ্ট্রসমর্থিত (Established Church)। প্রায় এক চতুর্থাংশ মেথডিষ্ট, ব্যাপিষ্ট, কন্‌গ্রিগেসন্যালিষ্ট বা প্রেসবিটারিয়ান (Methodists, Baptists, Congregationalists or Presbyterians) প্রভৃতি প্রচলিত ধর্মের ভিন্নমতাবলম্বী পথানুসারী। চার্চ অব্ ইংল্যাণ্ডের প্রধান হইলেন রাজা বা রাণী স্বয়ং। লর্ডসভায় চার্চের কয়েকজন প্রধানের আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় সমর্থনের ফলে বিশেষ মর্যাদায় অধিকারী ইঁহারা। চার্চ অব্ ইংল্যাণ্ডের অনুসরণকারীদের ভিতর হইতেই রক্ষণশীল দলের বৃহত্তম সমর্থন সংগৃহীত হয়; রক্ষণশীল দলও নিজেকে চার্চ অব্ ইংল্যাণ্ডের বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া মনে করে।

ধর্মের প্রভাব

ইংরেজ নন্‌কনফর্মিষ্টদের (Nonconformists) ভিতরে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রতি কিছুটা সন্দিগ্ধ মনোভাবে অতীত অত্যাচারের স্মৃতিই পরিলক্ষিত হয়।

ব্যাপটিষ্ট ও কন্‌গ্রিগেসন্যালিষ্টদের ধর্মীয় সংগঠন মূলতঃ গণতান্ত্রিক ; সুনির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে বিশ্বাসীদের মিলিত সভার (Congregation) উপরই কর্তৃত্বভার ন্যস্ত রাখাই ইহাদের বৈশিষ্ট্য ; যে কোন সদস্যেরই গোষ্ঠিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার অধিকার থাকে। বুঝিতে কষ্ট হয় না যে এইরূপ ধর্মবিশ্বাস রাষ্ট্রকর্তৃত্বকে জনতার সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে প্রতিবিম্বিত হইবে। প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূলশক্তি যোগাইয়াছিল এই ননকন্‌ফর্মিষ্টরা ; মার্কিন ও ফরাসী বিপ্লবের প্রধান সমর্থন আসিয়াছিল ইহাদেরই ভিতর হইতে। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সীমাবদ্ধ করার আদর্শের বাহক উদারনৈতিক দল (Liberal Party) ইহাদের সমর্থনে পুষ্ট হইয়াছে ; বর্তমানেও শ্রমিক দলের (Labour Party) সমর্থকদের মধ্যে ননকন্‌ফর্মিষ্টদের বাহুল্য দেখা যায়।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে যেন এ ধারণা না করা হয় যে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি ধর্মের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সেরূপ চিন্তা ভ্রান্ত। আমরা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলনটুকুই লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। সেই দিক হইতে ইহাও বলা যায় যে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি সহনশীলতার ঐতিহ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মত ও দলের প্রতি সহনশীলতার পটভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছে। উপরন্তু রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিবেকের অনুশাসন মানিয়া চলার দাবি রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতায় সাধারণতঃই এমন আদর্শবাদী সুরের অনুরণন জাগাইয়া তোলে যাহা বিদেশীর নিকট অনেক সময়ে নিছক ভণ্ডামি বলিয়া প্রতিভাত হইলেও জনসাধারণের আস্থা অর্জনের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়। উপরন্তু, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠিত চার্চের পক্ষে সম্ভব না হইলেও নন্‌কনফর্মিষ্টগণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনতার সহিত আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ফ্রান্স বা রাশিয়ায় অপরিহার্য হইলেও, ব্রিটেনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাত্রকেই আক্রমণ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই। বরং ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গঠনের ইতিহাসে ধর্মীয় সংগঠনেরও একটা অবদান রহিয়াছে। এবং এই ধর্মীয় প্রভাব শ্রমিকদলের অভ্যন্তরে চরম শ্রেণী-সংঘর্ষের চেতনাকে অবদমিত রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে গ্রেট ব্রিটেনে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি হইল ৫৩৩।

ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের শতকরা ৮১ জন এবং স্কটল্যাণ্ডের শতকরা ৭০ জন শহরে বাস করে। জনসংখ্যার শতকরা ৫ জন কৃষি ও ৫৫ জন শ্রমশিল্পের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিনির্ভর গ্রাম্যজীবন বহুখ্যাত ঘটনা। তুলনায় এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জনসংখ্যার শতকরা ৬৩ জন শহরবাসী, এবং শতকরা ১১.৫ জন কৃষিজীবী ও ৩৭ জন শ্রমশিল্প, খনি, যানবাহন প্রভৃতিতে নিযুক্ত। ফলে ভারতবর্ষের নির্বাচনী প্রতীকে বলদ-জোয়াল, কাস্তে-ধানের শীষ, প্রভৃতি প্রতীকের প্রাধান্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও শুধুমাত্র শহরবাসী শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে কোন রাষ্ট্রনৈতিক দল সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হইতে পারে না। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে প্রতি তিনটি ভোটের দুইটি দেয় এই শহুরে শ্রমিকরা। ফলে, শুধুমাত্র এই শহরবাসী শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনের ভিত্তিতে এখানে নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সরকার গঠন সম্ভব এবং ১৯৪৫ সালে 'শ্রমিক দল' (Labour Party) তাহাই ঘটাইয়াছিল। প্রতি নির্বাচনেই সেই এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটিবার কারণ হইল এই যে সব শ্রমিক শুধু একটিমাত্র দলকেই ভোট দেয় না। সেই জন্যই অন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলের উপরেও শ্রমিক সাধারণ, বিশেষতঃ White-collar বা Black-coated শ্রমিকের (ইঁহাদের বুদ্ধিজীবী বা মসীজীবী শ্রমিক বলিয়া অভিহিত করাই বোধহয় সঙ্গত হইবে) প্রভাব লক্ষণীয়।

জীবনযাত্রা প্রণালী

ব্রিটিশ শ্রমিকদের অধিকাংশই কাজ করে বড় ফ্যাক্টরিতে। ইহাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী। ৯৫ লক্ষ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ; কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (T. U. C.) সদস্য সংখ্যা ৮০ লক্ষাধিক। টি. ইউ. সির সহিত 'শ্রমিক দলের' সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়; 'শ্রমিক দলকে' টি. ইউ সির রাষ্ট্রনৈতিক কার্যক্রমের অঙ্গ বলিয়া মনে করা হয়। মালিকশ্রেণী প্রধানতঃ Federation of British Industries এবং অন্যান্য সংগঠনের ভিতর সংঘবদ্ধ, এবং বৃহৎ মালিকশ্রেণী দ্বিধাহীনভাবে Conservative Party বা 'রক্ষণশীল দল'কে সমর্থন করিয়া থাকে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি ও সমবায়ী দলের কিছু প্রভাব রহিয়াছে; তাহারা 'শ্রমিক দলের' সহযোগিতায় কাজ করে। কৃষিজীবীদের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র নিজস্ব জমিতে চাষ করে। অন্যেরা হয় স্বল্পসংখ্যক বৃহৎ খামারের মাহিনা-পাওয়া কৃষি-শ্রমিক অথবা পরের জমিতে প্রজা। তথাপি 'শ্রমিক দলের' উপেক্ষার জন্যই হউক, অথবা, প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্র ধরিয়াই হউক, কৃষকগণ প্রধানতঃ

রক্ষণশীল দলেরই সমর্থক।. উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ জীবনে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্যের জন্য ইউরোপীয় মহাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা অনেক সময়ে বৃটনদের Nation of shopkeepers বা 'দোকানদারের জাতি' বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। কিন্তু ক্রমে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী সমাজে ফাটল দেখা দেয়। স্বল্পসংখ্যক বৃহৎ ব্যবসায়ীরা একদিকে উচ্চবিত্ত অভিজাতদের সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে; মধ্যবিত্তদের অপরাংশ স্বাধীন জীবিকা হারাইয়া চাকুরীর জন্য রাষ্ট্র ও মালিক সমাজের উপর নির্ভরশীল, দোকান-কর্মচারী ও নানাবিধ 'সেবামূলক' প্রতিষ্ঠানের চাকুরিয়াতে (Providers of personal and public services) পরিণত হইয়াছে। সুতরাং 'দোকানদারদের জাতি' বর্তমানে 'শ্রমিক, কেরাণী, চাকুরিয়াদের জাতি'তে পরিণত হইয়াছে বলা বোধ হয় খুব ভুল হইবে না। অবশ্য উপরোক্ত নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণী নিজেদের ফ্যাক্টরি শ্রমিক হইতে পৃথক ও উচ্চ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করে, এবং নির্বাচনের সময়ে ইহাদের ভোট প্রধানতঃ রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের বাক্সে জমা হয়। আর্থিক দিক হইতে ইহারা অনেক সময়েই দক্ষ শ্রমিক অপেক্ষা কম আয় করে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্র' (The Welfare State) আজ ব্যাপক জনসমাজেরমৌলিক চাহিদা।

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ: এ্যাংলো-স্যাক্সন রাজাদের সময়ে শাসনকার্য পরিচালনায় 'উইটান' (Witan) নামক এক পরিষদের সাহায্য গ্রহণ করা হইত বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এই 'উইটানের' গঠনপদ্ধতি, ক্ষমতাবলী, প্রভৃতি এখনও অনেকাংশে বিতর্কের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। নর্মান শাসনের সময় হইতে ইংল্যাণ্ডে সামন্ততান্ত্রিক বা Feudal শাসনপদ্ধতি চালু হয়। কিন্তু ইউরোপীয় মহাদেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রজারা যেরূপ তাহাদের সম্পূর্ণ আনুগত্যটুকু নিজস্ব ভূস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিত, ইংল্যাণ্ডে তাহার কিছুটা প্রকারভেদ ঘটে। ধরিয়া লওয়া হইত যে সকল প্রজারই প্রধান আনুগত্য রাজার প্রতি, নিজ নিজ জমিদারবর্গের প্রতি আনুগত্য তাহার পরে। ইহার ফলে, এখানে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার উদ্ভব শুরু হইয়াছিল ইউরোপের অপরাপর দেশের তুলনায় অনেক আগে হইতে। নর্মান রাজারা শাসনকার্যের সুবিধার্থে নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে Magnum Concilium বা মহাপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতেন। এই মহাপরিষদে সমবেত হইতেন ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, যথা,

পার্লামেন্ট

"archbishops, bishops and abbots, earls, thegns and knights", অর্থাৎ, ধর্মযাজক ও অভিজাত ভূস্বামীদিগের প্রধানেরা। রাজা আইনপ্রণয়ন, বা কর বসাইবার জন্য মহাপরিষদের সহিত পরামর্শ করিতেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে রাজকোষের মূল ভিত্তি ছিল রাজার নিজস্ব জমিদারি এবং সে জমিদারি হইতে কর আদায়ের জন্য কাহারও পরামর্শের প্রয়োজন হইত না। এই মহাপরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বাস্তব রাজ্যশাসনে রাজার সহায়ক উপদেষ্টামণ্ডলী Curia Regis বা 'রাজসভা' অথবা, 'ক্ষুদ্র পরিষদ' নামে পরিচিত ছিল। নর্মান রাজারা ঘোষণা করিতেন যে "the laws of Edward the Confessor" (খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এড্ওয়ার্ডের আইন সমূহ) বজায় রহিল। ফলে, অভিজাত ভূস্বামী শাসনের পাশাপাশি প্রাচীন এ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা, যথা, the moots, the country and hundred courts, প্রভৃতি কিছুটা টিঁকিয়া যায়। রাজসভায় ভূস্বামী ছাড়াও জমিদারির সহিত সম্পর্কবিহীন রাজকর্মচারীরা স্থান পায়। রাজার বিচার ভূস্বামী-প্রধানদের বিবাদের ক্ষেত্র ছাড়াও সাধারণের জীবনে অনুপ্রবেশ করে রাজস্ব-সংগ্রাহক ও শান্তি-সংরক্ষক রাজকর্মচারী শেরিফদের মারফৎ। রাজা দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকালে ভ্রাম্যমাণ বিচারক দ্বারা বিচারকার্য প্রচলনের ফলে শাসনব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে এবং সারা দেশে একই আইন প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

'ম্যাগ্না কার্টা' বা 'মহাসনদ'

বেশ কিছুকাল অপশাসনের ফলে সর্বশ্রেণীর সমর্থন-বিচ্ছিন্ন দুর্বল রাজা জন ১২১৫ সালের ১৫ই জুন তারিখে, লণ্ডন ও উইণ্ডসরের মধ্যবর্তী রানিমিড্ প্রান্তরে, প্রখ্যাত Magna Carta বা 'মহাসনদে' নিজস্ব শীলমোহর অঙ্কনের দ্বারা,—(তিনি স্বাক্ষর করিতে জানিতেন না)—সম্মতি জানাইতে বাধ্য করা হয়। এ সংঘর্ষে জনসাধারণের কোন ভূমিকা ছিল না; ইহার নায়ক ছিলেন একদল ভূস্বামী-প্রধান। ইহাতে সমাজের নীচের তলার সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধা বা অধিকারের কোন কথা ছিল না। বস্তুতঃ যাজক ও অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের স্বার্থে প্রচলিত নীতি-নিয়মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ইহার মূল উদ্দেশ্যে ছিল। তথাপি এই 'মহাসনদ' ব্রিটিশ গণতন্ত্রের অন্যতম মূল ভিত্তিপ্রস্তর এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ইহার উদ্ভব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রচুর কল্পনাবিলাস প্রচলিত থাকিলেও উপরোক্ত ধারণার মধ্যে নির্ভুল সত্যের সারবস্তু নিহিত রহিয়াছে।

মহাসনদের দ্বারা এ নীতি নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হইল যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্ত রাজাকে তাঁহার পরিষদের মতামত গ্রহণ করিতেই হইবে; এখন হইতে, এরূপ পরামর্শ গ্রহণ আইনের নির্দেশ, রাজার খেয়াল-খুশীর বিষয় নয়। ভূস্বামীগণ এই ব্যবস্থাতে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগত প্রথা বলিয়া যাহা মনে করিতেন তাহারই প্রাধান্ত নির্দিষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সাফল্যের ফলে নির্দিষ্ট হইয়া গেল যে জাতির শাসন চলিবে বিধি-অনুযায়ী রাজার মর্জি অনুযায়ী, নয়; রাজা বিধি লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলে, হয় তাঁহাকে আইন সম্মত পথে চলিতে বাধ্য করা হইবে, নতুবা, অনুরূপ চলিতে ইচ্ছুক অপর কোন রাজার হস্তে শাসনভার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। আধুনিক গণতন্ত্র বা স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার শাসনতান্ত্রিক সংকোচনের কথা তৎকালীন ভূস্বামীগণ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তথাপি এই পথেই সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ঘটিল।

অপরদিকে মহাসনদে অভিজাত ও যাজকপ্রধানদের জন্ত যে সকল অধিকার ঘোষিত হইয়াছিল, কালের পরিবর্তনের সহিত সেই অধিকারগুলি সমাজের অন্তান্ত শ্রেণীতে প্রযুক্ত বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিতে লাগিল। মহাসনদের ৩৯ নং ধারায় বলা হইয়াছিল যে আইনের নির্দেশ ব্যতীত, অথবা সমকক্ষ ব্যক্তিদের বিধিসঙ্গত বিচার ব্যতিরেকে, কোন স্বাধীন মানুষকে গ্রেপ্তার, বন্দী, সম্পত্তির অধিকারভ্রষ্ট, আইনের আশ্রয়বঞ্চিত অথবা নির্বাসিত করা চলিবে না।* 'স্বাধীন মানুষ' কথাটি আদিতে সীমাবদ্ধ সমাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলেও যুগে যুগে ইহার অর্থের ব্যাপ্তি ক্রমে এই ধারাকে সাধারণ মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার নিশানায় পরিণত করিয়াছে।

এদিকে কালের অগ্রগমনের সহিত ক্রমেই ক্ষুদ্র পরিষদের উপর শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কার্যের চাপ বাড়িতে লাগিল। কর্মবিভাগ ও কর্মের নির্দিষ্ট করণের মারফৎ, আধুনিক বিচার বিভাগের প্রারম্ভ হিসাবে ক্ষুদ্র পরিষদ হইতে এক্সচেকার কমন্ প্লীজ, কিংস্ বেঞ্চ এবং চ্যান্সারী বিচারশালার (Courts of Exchequer, Common Please, King's Bench and Chancery)

*"No free man shall be arrested, or imprisoned, or dispossessed of his land, or outlawed, or exiled, or in any other way harassed, nor will we impose upon him, nor send him our commands, save by the lawful judgment of his peers or by the law of the land." (Article 39)

উদ্ভব হয়। পরে এই ক্ষুদ্র পরিষদ স্থায়ী পরিষদে (Permanent Coun পরিণত হয়; আরও পরে ইহার ভিতর হইতে জন্মলাভ করে রাজার খাস-মন্ত্রণাসভা বা Privy Council।

যাজক ও অভিজাতদের মধ্যে যাঁহারা সর্বোচ্চ মহাপরিষদে তাঁহাদেরই ডাক পড়িত। আবার নূতন কর ধার্য করিবার সময়ে তাহাতে সম্মতি জানাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গীয় ভদ্রমহোদয়গণেরও আহ্বান আসিত রাজসভা হইতে। ১২১৩ সালে রাজা জন, ১২৫৪তে তৃতীয় হেনরি, (পার্লামেণ্ট নাম এই সময় হইতেই প্রচলিত হইতে থাকে) ১২৬৫তে সাইমন ডি মণ্টফোর্ট, বিভিন্ন জেলা হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি স্থানীয় নাইটদের (Knights) সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালে প্রথম এডওয়ার্ড আহূত আদর্শ পার্লামেণ্টে যাজক, ভূস্বামী ও নাইট ছাড়াও বিশিষ্ট পুরবাসীগণ (Burgesses) আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বৃহৎ অভিজাতবর্গ ছাড়া নাইট বা বিশিষ্ট পুরবাসী যাঁহারা আহূত হইতেন, তাঁহারা কোন না কোন পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে আসিতেন।

মনে রাখিতে হইবে এই সময়ে পার্লামেণ্টে উপস্থিত হইবার সুযোগকে সকলে সুনজরে দেখিতেন না। কারণ, এ সভার মূল উদ্দেশ্য হইল নিজেদেরই করভার বাড়ানো; তাহার উপর ছিলো যাতায়াতের অসুবিধা, অর্থ ও সময়ের অপচয়, ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা। ফলে, রাজকীয় নির্দেশে পার্লামেণ্টে উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক।

প্রথম দিকে অভিজাত, যাজক-সম্প্রদায় ও সাধারণের প্রতিনিধি, এই তিনভাগে ভাগ হইয়া পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসিত। ক্রমে নিম্নবর্গীয় যাজকগণ এ আসর হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন; অভিজাত বংশীয় উচ্চপদস্থ যাজকগণ অভিজাতদের সহিত সভায় মিলিত হইতেন। ক্ষুদ্রতর ভূস্বামী, নাইট প্রভৃতি যাঁহাদের অনেকেরই অভিজাতবংশের জ্যেষ্ঠেতর সন্তান হিসাবে বংশগত সম্পত্তি ও মর্যাদা-সূচক খেতাবে অধিকার ছিল না, সাধারণের সভায় আসন গ্রহণ করিতেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে পার্লামেণ্টের দুই পরিষদগত চরিত্র স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে;

পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের উদ্ভব

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই কমন্স কক্ষে (House of Commons) অর্থ সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রথম সূত্রপাতের নীতি স্থিরীকৃত হইয়া যায়। পার্লামেণ্ট প্রথম দিক হইতেই কিছুটা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্জন করে।

অভিযোগ দূরীকরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে রাজার নিকট আবেদন করিবার অধিকার পূর্ব হইতেই স্বীকৃত ছিল; ক্রমে 'কমন্সসভা' সম্মিলিততভাবে এই আবেদন পেশ করিতে সুরু করে। রাজারা ক্রমেই বুঝিলেন যে আবেদন প্রথমে মানিয়া লইলে করের বিষয়ে কমন্স সভাকে রাজি করা সহজ হয়; সুতরাং কমন্স সভার প্রস্তাবে লর্ড-সভার (House of Lords) সম্মতিক্রমে রাজা আইন প্রণয়ন আরম্ভ করেন। আইনে কমন্স সভার আবেদনের মূল বিষয়বস্তু পরিবর্তিত করা হইবে না,—এ নীতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্বীকৃতি পায়।

অর্থ ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ওয়ারস্ অব্ দি রোজেস্ (Wars of the Roses)-এর মারফৎ অভিজাত প্রধানেরা পারস্পরিক ধ্বংসকার্যের মাধ্যমে অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ করিয়া আনেন। সপ্তম হেন্‌রির রাজত্বে বহুবাঞ্ছিত নিরাপত্তা ও শৃংখলাবিধানের ফলে রাজকীয় ক্ষমতা দৃঢ়তা লাভ করে। শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্র হিসাবে দেখা দেয় 'প্রিভি কাউন্সিল', পার্লামেণ্ট রাজার বশংবদ অনুচরের ভূমিকা গ্রহণ করে। পরবর্তী রাজা অষ্টম হেন্‌রির সময়ে পার্লামেণ্টের সুনাম ছড়ায় রাজার পাশে দাঁড়াইয়া পোপ ও রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের বিরোধিতার জন্য। প্রথম এলিজাবেথের সময়ে দেখা গেল পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দ যথেষ্ট আত্মপ্রতিষ্ঠ বোধ করিতেছেন; রাজকীয় কর্মকাণ্ডের মুখর সমালোচনাও পার্লামেণ্ট-কক্ষে ধ্বনিত হইতেছে। পরবর্তী রাজা প্রথম জেম্‌স্ ছিলেন 'রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকারের' (Divine Right of Kings) প্রবক্তা; স্বভাবতঃই তাঁহার সহিত পার্লামেণ্টের বিরোধ প্রকট হইয়া উঠে।

বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করিল প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে। দুইবার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া, ১৬২৮ সালে পুনর্বার পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিলে পর রাজার স্বেচ্ছাচারের নিন্দা করিয়া ও প্রাচীন অধিকারের উল্লেখ করিয়া 'অধিকারের' আবেদন (Petition of Rights) চার্লসের নিকট উপস্থিত করা হয়। তিনি সাময়িকভাবে তাহা মানিলেও অচিরেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। পার্লামেণ্টের সহিত রাজার ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মূল নিষ্পত্তি আসে ১৬৪২ হইতে ১৬৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘায়ত গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়া। রাজা প্রথম চার্লস্ পরাজিত হন; বিচারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ধার্য হয় ও সে দণ্ড কার্যকরী করা হয় ১৬৪৯ সালে। ঐ বৎসর রাজতন্ত্র ও লর্ডসভা তুলিয়া দেওয়া হয়। পার্লামেণ্টের

বিপ্লব

সেনাবাহিনীর নায়ক অলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Cromwell) ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইংল্যাণ্ডের প্রথম ও একমাত্র লিখিত শাসনতন্ত্র, 'শাসনব্যবস্থার দলিলের' (Instrument of Government) ভিত্তিতে 'লর্ড প্রোটেক্টর' (Lord Protector) নামে রাষ্ট্র পরিচালক হইয়া বসেন। তাঁহার সহিতও পার্লামেন্টের বিরোধ ঘটে ও তিনি পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে লিখিত শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটে; দ্বিতীয় চার্লসকে ডাকিয়া আনিয়া পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। রাজার পুরাতন স্বৈরাচারী ক্ষমতার পুনঃপ্রবর্তন আর সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় চার্লসের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় জেম্‌সের সহিত পার্লামেন্টের বিরোধের ফলে রাজাকে পুনরায় রাজত্ব ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হয়; পার্লামেন্টের আহ্বানে দ্বিতীয় জেমসের কন্যা মেরী ও তাঁহার স্বামী উইলিয়াম (William of Orange) আসিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৬৮৮ সালের বিনা রক্তপাতে সাধিত রাষ্ট্রবিপ্লব "গৌরবময় বিপ্লব" (The Glorious Revolution) বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। উইলিয়াম ও মেরীর রাজ্যভার গ্রহণের সময়ে ষ্টুয়ার্ট বংশের রাজ্যকালব্যাপী দীর্ঘ বিপ্লবের ফলগুলিকে সুসংহতরূপে রূপদান করিয়া যে আইন পাস করা হয়, তাহাই অধিকারের বিল বা Bill of Rights নামে ইতিহাসে খ্যাত।

ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের কুকীর্তিগুলির উল্লেখ করিয়া এই আইনে তাহার পুনরাবৃত্তি চিরতরে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হইল। ঘোষণা করা হইল,—আইনের

অধিকারের বিল

রদ-বদল করিবার অধিকার রাজার নাই; পার্লামেন্টের সম্মতি ব্যতীত রাজা কর ধার্য করিতে পারিবেন না; খুশিমত রাজকীয় কমিশন বা বিচার সভা স্থাপন করা চলিবে না; পার্লামেন্টের সম্মতি ব্যতিরেকে শান্তির সময়ে স্থায়ী সেনাবাহিনী বজায় রাখা চলিবে না; প্রজাদের রাজার নিকট আবেদনের অধিকার অক্ষত থাকিবে; প্রটেষ্টাণ্টদের আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রবহন করিবার অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিবে, পার্লামেন্টের সদস্যদের বক্তৃতা ও বিতর্ক করিবার ব্যাপারেও থাকিবে অখণ্ড স্বাধীনতা। উপরন্তু পার্লামেন্টের সদস্যদের নির্বাচনও হইবে স্বাধীন ও রাজকীয় হস্তক্ষেপমুক্ত এবং পার্লামেন্টের অধিবেশন ঘনঘন বসাইতে হইবে।

অধিকারের বিল প্রণয়নের পর দীর্ঘকাল গত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে; শাসনব্যবস্থার রূপও প্রভূত পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিলে নির্বাচক মণ্ডলীর প্রাধান্য আইনের কর্তৃত্ব, পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার যে পথচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র মূলগতভাবে তাহা হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

ইহার পরবর্তীকালে শাসনতান্ত্রিক বিকাশের মূল পদক্ষেপগুলিকে আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামায় ভূষিত করিতে পারি। বস্তুতঃ এইগুলি লইয়া বিশদ আলোচনা আধুনিক শাসনতন্ত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই করিতে হইবে; নিম্নে বিষয়গুলির নামোল্লেখ করা হইল মাত্র: (১) রাজকীয় ক্ষমতার ক্রমবিলোপ; (২) ক্যাবিনেট প্রথার বিকাশ; (৩) কমন্সসভার গণতন্ত্রীকরণ বা তাহার জনপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তির প্রসার; (৪) লর্ডসভার ক্ষমতার হ্রাস; (৫) দলীয় প্রথার উদ্ভব; প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের চরিত্র

'শাসনতন্ত্র',—এই নামটি সম্পর্কে চিন্তার যথেষ্ট অস্বচ্ছতা দেখা যায়। শাসনতন্ত্র বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় কোন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মূল গঠনপদ্ধতি, তাহার আইন-বিভাগ, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক, নাগরিকদের অধিকার প্রভৃতি—এক কথায় রাষ্ট্রব্যবস্থার সমগ্রিক পরিচালনা-পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন মৌলিক লিখিত আইন। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের ইতিহাসেই এমন এক সন্ধিক্ষণ আসে যখন তাহার শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পদ্ধতি, শাসনযন্ত্রের গঠন, কার্যক্রম, প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনামার প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পারিক ক্ষমতাসম্পর্কের পরিবর্তনের সময়েই এই পরিবর্তন বিশেষরূপে অনুভূত হয়। বিদেশীর নিকট হইতে স্বাধীনতালাভের সময়, দেশের ভিতরে গুরুতর সামাজিক ও রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমন্বয়, বা বৃহৎরাষ্ট্রের বিভক্তির ফলে, নূতন করিয়া শাসনব্যবস্থার রূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে ঘোষণার প্রয়োজনে লিখিত শাসনতন্ত্রের উদ্ভব হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় ইউনিয়ন, প্রভৃতি রাষ্ট্রে এইরূপ শাসনতন্ত্র রহিয়াছে, কিন্তু গ্রেটব্রিটেনে নাই।

শাসনতন্ত্র বলিতে কি বুঝায়

অবশ্য কি নাই, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝা দরকার। শাসনতন্ত্র বলিতে যদি বুঝি যে,—

(ক) ইহা কোন বিশেষ শাসনপ্রণয়ন পরিষদ কর্তৃক রচিত এবং বিশেষ একটি দিবস হইতে প্রচলিত হইল বলিয়া ঘোষিত ;

(খ) এই শাসনতন্ত্রে বর্ণিত আইনের সহিত সাধারণ আইনের মৌলিক পার্থক্য থাকিবে ; সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির দ্বারা শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করা চলিবে না এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের সহিত সাধারণ আইনের সংঘর্ষ ঘটিলে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন শাসনতান্ত্রিক আইনই বজায় থাকিবে, সাধারণ আইন বাতিল হইয়া যাইবে ;—তাহা হইলে গ্রেটব্রিটেনের শাসনতন্ত্র প্রকৃতই নাই। কারণ ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লসের পতনের পর ক্রমওয়েলের শাসনকালে ইংল্যাণ্ড একবার শাসন-পরিচালনা

বিধি বা Instrument of Government নামক শাসনতন্ত্র প্রচলন করে। কিন্তু পার্লামেণ্ট ইহাকে কোনদিনই স্বীকৃতি দেয় নাই। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর অল্প কিছুকালের মধ্যেই পার্লামেণ্ট ঘোষণা করে যে রাজ্যের প্রাচীন ও মৌলিক আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হইবে ("according to the ancient and fundamental laws of the kingdom")। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে অপর কোন সামগ্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা হয় নাই; পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকেও কোন বিশেষ আইন দ্বারা সঙ্কুচিত করা হয় নাই। এ্যানসনের ভাষায়; "আমাদের পার্লামেণ্ট বনের পাখী বা সমুদ্রের ঝিনুক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেমন আইন প্রণয়ন করে, রাষ্ট্র ও গীর্জার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে, বিশ লক্ষ লোকের হস্তে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করিতে, অথবা নির্বাচনী কেন্দ্র নূতন করিয়া গঠন করিতেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করিবে।" *

বস্তুতঃ এইটুকু নয়, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইহা অপেক্ষাও অনেক গুরুতর বিষয়ে অত্যন্ত সাধারণ পদ্ধতিতেই আইন প্রণয়ন করিতে পারে ও করিয়াছে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই এ্যালেক্সিস্ ডি টক্‌ভিল (Alexis D.-Toqueville) সোচ্চারে জানাইয়াছেন "ইংল্যাণ্ডে শাসনতন্ত্র ......এরূপ কিছু নাই" ("En Angliterre la constitution......elle on existe point !")।

"ইংল্যাণ্ডে শাসনতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই"—ডি টক্‌ভিল্

পূর্বে বার্কের (Burke) ফরাসী বিপ্লবের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়া টম পেইনও (Tom Paine) ঘোষণা করিয়াছিলেন "মিঃ বার্ক কি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র দেখাইতে পারেন? না পারিলে, আমরা ন্যায্যতঃই সিদ্ধান্ত করিব যে এ সম্পর্কে বহু বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র বস্তুটি নাই, কখনও ছিলও না।" (Can Mr. Burke produce the English constitution ? If he cannot, we may fairly conclude that though it has been so much talked about, no such thing as a constitution exists, or ever did exist."

যে যুগে লোকে "মানুষের অধিকারের" নিরাপত্তা খুঁজিয়া পাইত একমাত্র

* "Our Parliament can make laws protecting wild birds or shell-fish, and with the same procedure could break the connection of Church and State, or give political powers to two millions of citizens, and redistribute it among new constituencies." Anson: Law and Custom of the Constitution

লিখিত শাসনতন্ত্রে, তখন পেইনের পূর্বোল্লিখিত মন্তব্য করা বিস্ময়কর ছিলনা। শাসনতন্ত্রকে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হইতে প্রসূত এবং সাধারণ আইনের আওতার বহির্ভূত দেখিতে অভ্যস্ত ফরাসী ডি টকভিলের বক্তব্যের যুক্তিও বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এরূপ মত ভ্রান্ত; কারণ উভয়েই শাসনতন্ত্রের মূল বস্তুকে না ধরিয়া কেবল বহিরঙ্গের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন।

রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র ও শাসনপদ্ধতির মূল ব্যবস্থাগুলি লইয়াই শাসনতন্ত্র। যদি সর্বসাধারণ শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি আইনকানুন, রীতিনীতি ব্যবস্থাকে শাসন পরিচালনার ভিত্তি হিসাবে মানিয়া লয়, তবে সেইগুলিই হইল শাসন তন্ত্র। মৌলিক আইন হিসাবে একমাত্র দলিলের মধ্যে তাহা গ্রথিত থাকুক, নানা দলিলে ছড়াইয়া থাকুক বা কোন দলিলেই তাহাকে খুঁজিয়া নাই বা পাওয়া যাক। (ল্যাটিন Constitueree, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করা—হইতে আসিয়াছে ইংরেজী constitution। শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহাই শাসনতন্ত্র, তা সে শাসনতন্ত্র-প্রণেতৃ-পরিষদ কর্তৃক রচিত হউক অথবা যুগ যুগ ধরিয়া বিবর্তনের মধ্য দিয়াই উদ্ভূত হউক। অধিকাংশ শাসনতন্ত্রই প্রথম পদ্ধতিতে আসিয়াছে; দ্বিতীয় পদ্ধতির সেরা উদাহরণ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র।

বস্তুতঃ ব্যাপকতর অর্থে শাসনতন্ত্রকে একটিমাত্র মৌলিক আইনের দলিল বুঝায় না; এই দলিলকে ঘিরিয়া থাকে বহুতর নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি, আইন, প্রথা, আচার পদ্ধতি ও নানাবিধ ব্যাখ্যা। সবকিছু লিখিত দলিলে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না,—তবু সব মিলাইয়াই শাসনতন্ত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা বিচার করিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের লিখিত দলিলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। দলিলটি আকারে বড় নহে; ব্রাইস বলিয়াছেন,—কুড়ি মিনিটেই এটি পড়িয়া ফেলা যায়। কিন্তু অনেক বেশী সময় ব্যয় করিয়া বারবার দলিলটি পড়িলেও তো জানা যাইবে না এখানকার আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, জাতীয় শাসন সংগঠন, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন পদ্ধতি, রাজ্য-শাসনব্যবস্থা, আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা, পার্টি-সংগঠন এবং আরও অনেক কিছু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও নানাবিধ লিখিত-অলিখিত বিষয়বস্তুর সহিত শাসন-তন্ত্রের দলিলটি মিলাইয়া বুঝিলে তবেই প্রকৃত শাসনতন্ত্রের পরিচয় মিলিবে।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্যার আইভর জেনিংস বলিতেছেন; "গ্রেট ব্রিটেনের কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই। আধুনিক রাষ্ট্রের বহুবিধ

করণীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় তাহার উদ্ভব হইয়াছে যুগে যুগে প্রয়োজনের তাগিদে। আশু প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উদ্ভূত, সে প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিস্তৃততর, কখনও ভিন্নতর কার্যে ব্যবহারের জন্য খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হইয়াছে। কালের পরিবর্তনের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ হইতেই সংস্কারের দাবি উঠিয়াছে। নয়া আবিষ্কার, সংস্কার ও পরিবর্তিত ক্ষমতা-বণ্টনের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া চলিয়া আসিয়াছে। গৃহখানিতে ক্রমাগতই নূতন সংযোজন ঘটিয়াছে, জোড়াতালি পড়িয়াছে, আংশিক পুনর্গঠনও হইয়াছে, ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইহা নূতন করিয়া ব্যবহারে লাগিয়াছে; কিন্তু কখনও ইহাকে গুঁড়াইয়া মাটিতে মিশাইয়া নূতন ভিত্তির উপর নূতন করিয়া গাঁথা হয় নাই। শাসনতন্ত্র বলিতে যদি প্রতিষ্ঠান-সমূহের বর্ণনামূলক দলিলকে না বুঝাইয়া, আসল প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বুঝায়, তবে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে সৃষ্টি করা হয় নাই, ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে,—আর দলিল এখানে নাই। *

স্যার আইভর জেনিংস আরও বলিতেছেন: "ব্রিটেনে লিখিত শাসনতন্ত্র থাকিলে যে সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিত সেগুলি যুগ যুগ ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কখনও সুচিন্তিত নির্বাচনের মাধ্যমে, কখনও বা রাষ্ট্রনৈতিক নানাবিধ চাপের ফলে। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম, বিচারশালাগুলি, পরিষদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নিতান্তই আপেক্ষিক গুরুত্বহীনতা ও কর্মের বিশিষ্টতার জন্য। প্রথমদিকে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা হইত অনন্যসাধারণ ঘটনা হিসাবে, পরে নিয়মিত পদ্ধতি হিসাবে, শেষপর্যন্ত

* "Great Britain has no written constitution. The institutions necessary for the exercise of the multifarious functions of the modern State have been established from time to time as the need arose. Formed to meet immediate requirements, they were then adapted to exercise more extensive and sometimes different functions. From time to time political and economic circumstances have called for reforms. There has been a constant process of invention, reform and amended distribution of powers. The building has been constantly added to, patched, and partially reconstructed, so that it has been renewed from century to century; but it has never been razed to the ground and rebuilt on new foundations. If a constitution consists of institutions and not of the paper that describes them, the British constitution has not been made but has grown—and there is no paper."

c

Sir Ivor Jennings—The Law and the Constitution. p. 8.

বাধ্যবাধকতার দায়ে। ইহা প্রথমে সাহায্য করিত, পরে জেদ ধরিত; শেষে, দুইটি বিপ্লবের অন্তে, চূড়ান্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসিল। মন্ত্রিরা প্রথমে রাজাকে সাহায্য করিতেন কেরাণী বা সচিব হিসাবে, পরে তাঁহার পক্ষ হইতে ভারার্পিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতেন, অবশেষে নিজস্ব দায়িত্বেই চলিতেন, প্রয়োজনবোধে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া লইতেন মাত্র। এইরূপে শাসনতান্ত্রিক সম্পর্কসমূহ নির্ধারণের নীতিগুলি কর্মধারার ভিতর দিয়াই মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামে বিজয়ের ভিতর দিয়া সুনির্দিষ্ট হইয়াছে; যদিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে আইনপ্রণয়নই এই বিকাশের মূল যন্ত্র হিসাবে দেখা দিয়াছে।" *

সুতরাং টম্ পেইন বা ডি টক্‌ভিল যাহাই বলিয়া থাকুন না কেন, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব ও সজীবতা সন্দেহাতীত। মান্‌রো ও এয়ার্স্টের ভাষায়: "প্রতিষ্ঠান, নীতি ও আচার-পদ্ধতির ইহা এক জটিল মিশ্রণ; সনদ ও আইন, বিচারকের ব্যাখ্যা, প্রচলিত বিধান, নজির, প্রথা, ও দীর্ঘ পারম্পর্যসম্পন্ন রীতিনীতির সন্নিবেশ। কোন একটি দলিলে ইহা নাই; ইহা ছড়াইয়া আছে শতশত দলিলে। একটি সূত্র হইতে ইহার উদ্ভব হয় নাই, হইয়াছে নানা সূত্র হইতে। ইহা সম্পূর্ণাঙ্গ নহে, বরং ক্রমপ্রসরমান।"†

* "The institutions of Great Britain which would be regulated by a written constitution if there were one have developed through the ages, sometimes by deliberate choice, sometimes as the resultant of political forces. The earliest of them, the courts, separated from the council merely because of the comparative unimportance and the technical nature of their work. Parliament was at first summoned as an exceptional measure, then as a general practice, and finally as a matter of obligation. It first assisted, then insisted, and finally, after two revolutions, achieved supremacy. Ministers first assisted the king as clerks or secretaries, then acted on his behalf as his delegates, and finally acted on their own behalf, consulting the king when necessary. Thus the principles governing constitutional relationships have been established primarily through the growth of practice, insisted upon, in some cases, through victory in arms; though in more recent period legislation has been the chief instrument of development."

Sir Ivor Jennings—The Law and the Constitution, P. 88

† "It is a complex amalgam of institutions, principles and practices; it is a composite of charters and statutes, of judicial decisions, of common laws of precedents, usages, and traditions. It is not one document, but hundreds of them. It is not derived from one source, but from several. It is not a completed thing, but a process of growth."—Munro and Ayearst. The Governments of Europe—P. 28

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উপাদান (Elements composing the constitution): ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মূল রূপটি লইয়া উপরিলিখিত আলোচনার পর কোন কোন উপাদান লইয়া এ শাসনতন্ত্র গঠিত তাহা বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য হইবে। উপাদানগুলিকে মূলতঃ তুইভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) শাসনতান্ত্রিক আইন (law of the constitution) ও (২) শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (customs or conventions)। বলিয়া রাখা ভালো যে এই বিভাগকে যেন লিখিত ও অলিখিত অংশের (written and unwritten) বিভাগের সহিত সমার্থক বলিয়া মনে না করা হয়; কারণ, শাসনতান্ত্রিক আইনেরও বহু অংশ আজ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। আসলে মোটা কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে বিচারসভার বিচারকার্যে শাসনতান্ত্রিক আইন স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয়। বাস্তব শাসনকার্যে "রীতিনীতি" সমান গুরুত্ব-সম্পন্ন হইলেও বিচারালয়ে তাহার স্বীকৃতি নাই। বরং সে স্বীকৃতি যদি দেওয়া হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার রূপান্তর ঘটিবে; অর্থাৎ, "রীতিনীতির" পর্যায় হইতে তাহা "আনুষ্ঠানিক আইনের" পর্যায়ে উঠিয়া আসিবে।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উপাদান

শাসনতান্ত্রিক আইনের আবার প্রকারভেদ রহিয়াছে।

শাসনতান্ত্রিক আইন

ক। প্রথমেই স্মরণ করিতে হয় কতকগুলি ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে গৃহীত সনদ বা চুক্তির কথা (charters or agreements)। উদাহরণ স্বরূপ পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত মহাসনদ (Magna Carta), অধিকারের আবেদন (Petition of Rights), অধিকারের বিল (Bill of Rights), প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

১। সনদ

খ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধভাবে গৃহীত বিভিন্ন বিধান (Parliamentary statutes), যেগুলি রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত বা সম্প্রসারিত করিয়া, নাগরিক স্বাধীনতা সন্নিবেশিত করিয়া, ভোটের অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া, বিচারশালা, আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা, শাসনযন্ত্র, প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে তাহার আধুনিক রূপ দান করিয়াছে। বহু উদাহরণের মধ্যে কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে, যথা, ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস আইন (Habeas Corpus Act of 1679), ১৭০১ সালের (সিংহাসনে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে) মীমাংসার আইন (The Act of Settlement of 1701), ১৮৩২, ১৮৬৭ ও

২। বিধিবদ্ধ আইন

১৮৮৪ সালের সংস্কার বিধিসমূহ (The Reform Acts of 1832, 1897 and 1884), ১৮৩৫ সালের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিধি (The Municipal Corporations Act of 1835), ১৮৭২ সালের পার্লামেণ্টারী ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনী আইন (The Parliamentary and Municipal Elections Act of 1872), ১৮৮৮, ১৮৯৪, ১৯২৯, ১৯৩৩ সালের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় বিধিসমূহ (The Local Government Acts of 1888, 1894, 1929, 1933), ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৬ সালের আদালত সম্পর্কীয় আইনসমূহ (The Judicature Acts of 1873-76), ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইন (The Parliament Acts of 1911 and 1949), ১৯১৮ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব বিধি (The Represntation of People Act of 1918) ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রিত্ব আইন (The Ministers of the Crown Act of 1937), ১৯২০ সালের আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা আইন (The Goverment of Ireland Act of 1920), ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনষ্টার বিধি (The Statute of Westminster of 1931), প্রভৃতি।

৩। বিচারকের ব্যাখ্যা

গ। তৃতীয়তঃ উল্লেখ করিতে হয় সনদ ও বিধিবদ্ধ আইন সম্বন্ধে বিচারকদের ব্যাখ্যার (Judicial decisions) কথা। ভাষার অর্থ লইয়া দ্বিমত হইবার সম্ভাবনা সর্বদাই রহিয়াছে। সুতরাং আইন প্রকৃত কি নির্দেশ দিতেছে সে সম্পর্কে চরম রায় দেন বিচারকেরা। এ ব্যবস্থা সর্বত্রই বিদ্যমান। তবে, মনে রাখিতে হইবে যে পার্লামেণ্ট প্রণীত কোন আইনকে সংবিধান-বহির্ভূত বলিবার অধিকার ব্রিটেনের কোন আদালতেরই নাই।

৪। প্রচলিত বিধান

ঘ। চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল শাসনব্যবস্থার ক্ষমতা কার্যক্রম, পদ্ধতি-প্রকরণ, বিভিন্ন অঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রচলিত বিধানের (Common law) নীতি নিয়ম-কানুনসমূহ। এই সকল বিধান কখনও পার্লামেণ্টের দ্বারা রচিত হয় নাই; ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে প্রচলিত প্রথা ও আচার-পদ্ধতি হইতে, বিচারকের সিদ্ধান্তের সহায়তায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রিটেনের আইন ও শাসনব্যবস্থায় ইহারা আইন বলিয়াই স্বীকৃতি পাইয়া আসিতেছে। রাজার বিশেষ অধিকার (prerogatives of the Crown), আইন-প্রণয়ন পার্লামেণ্টের চরম ক্ষমতা, জুরির বিচার, বাক্ স্বাধীনতা, প্রভৃতির ভিত্তি হইল এই প্রচলিত বিধান।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (Conventions of the Constitution) বাস্তব শাসন-প্রক্রিয়াকে চালু রাখা হয় নানাবিধ রীতিনীতি প্রথানিয়মের অজস্র বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়া, অথচ সেগুলি খাঁটি 'আইন' নয়। "আইনের স্বীকৃতি" না পাইলেও আইনের সহিত ইহাদের কোন অসামঞ্জস্য নাই; আর আইনের মতই নিখুঁতভাবে ইহাদের বর্ণনা করা চলে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে এরূপ আইনের প্রাধান্য সকল বিশেষজ্ঞই স্বীকার করেন। জন্ স্টুয়ার্ট মিল ইহাদের "the unwritten maxims of the constitution" বা "শাসনতন্ত্রের অলিখিত ধ্রুব-বাণী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বিশ বৎসর পরে ডাইসি ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন "শাসনতন্ত্রের রীতিনীতি" (the conventions of the constitution)। আর "শাসনতন্ত্রের প্রথা" (the custom of the constitution) বলিয়া ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন এ্যানসন। ইহাদের কোন একটি নাম দিয়াই বিষয়টির সমগ্র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যায় না। তথাপি ডাইসি-প্রদত্ত নামটিই দীর্ঘ ৭৫ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

স্যার আইভর জেনিংস বলেন: "আইনের শুষ্ক অস্থিতে রক্ত-মাংসের প্রলেপ চড়ায় উহারাই; আইন বর্ণিত শাসনতন্ত্রকে উহারাই কার্যকরী করে; চলমান চিন্তা-চেতনার সহিত উহারাই পা মিলাইয়া চলে।" *

আসলে শাসনতন্ত্রকে চালু রাখে তো মানুষ। সারা দেশের মানুষের প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় পুঁথির পাতায় লেখা আইনগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়া সজীব মানুষের জীবনধারাকে পরিচালিত করে। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি এই সহযোগিতাকেই সম্ভব করিয়া তুলে।

"উপরন্তু, জাতীয় জীবনের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সাথে শাসনতন্ত্রের কার্য্যকারিতাকেও পরিবর্তিত হইতে হইবে। নূতন প্রয়োজনবোধ হইতে চাহিদা আসে নূতন গুরুত্ব-অর্পণের, নূতন দৃষ্টি ভঙ্গির, যদিও আইন তখনও একই থাকিয়া যায়। পুরাতন আইন ব্যবহার করিয়াই মানুষকে নূতন প্রয়োজন

* "They provide the flesh which clothes the dry bones of the law; they make the legal constitution work; they keep it in touch with the growth of ideas." —Sir Ivor Jennings. The Law and the Constitution—Pp. 81-82.

মিটাইতে হয়। তাহা সংসাধিত করার নিয়ম-কানুনই হইল শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি।"*

সুতরাং শাসনতন্ত্র বাস্তবে কি ভাবে চলিতেছে তাহা বুঝিতে গেলে তাহার এই রীতিনীতিগুলি লক্ষ্য করিতে হইবে। কারণ, প্রথমতঃ ইহার মাধ্যমেই আইন কার্যে প্রযুক্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ, আনুষ্ঠানিক শাসনতন্ত্রকে প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক তত্ত্বের সহিত মিলাইয়া চালাইবার দায়িত্বও ইহারাই পালন করে। সেইজন্যই জেনিংস ইহাদের "শাসনতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি" বা "motive power of the constitution" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির বহু গুরুত্বপূর্ণ নিয়মই ক্যাবিনেট-শাসন সম্পর্কীয়। ১৬৮৯ সালের 'অধিকারের বিল' দ্বারাই নিষ্পত্তি হইয়া গেল যে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে পার্লামেণ্টের হস্তে; রাজার ক্ষমতা রহিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু পার্লামেণ্ট নিয়মিত শাসন-কার্য্য (administration) চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিল না। ধরিয়া লওয়া হইল যে পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক, বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান, বিচারক-নিয়োগ অথবা অপরাধীর দণ্ডমকুব, সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব অথবা কর আদায়, এইরূপ শতবিধ শাসনকার্যের দায়িত্ব রাজাই তাঁহার নিযুক্ত মন্ত্রি-কর্মচারী দিয়া চালাইয়া লইবেন। অবস্থা এই যে শাসনকার্য চালাইবার জন্য রাজার প্রয়োজন পার্লামেণ্টকে, পার্লামেণ্টের প্রয়োজন রাজাকে। উভয়ের ভিতর সেতুর কার্য করিল মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট। রাজা এমন মন্ত্রিপরিষদ নিয়োগ করিলেন, পার্লামেণ্টে যাঁহাদের যথেষ্ট সংখ্যক সমর্থক থাকার ফলে প্রয়োজনীয় আইন বা করের প্রস্তাব পাস করানো যাইত। দল-প্রথার (party-system) উদ্ভবের ফলে পার্লামেণ্টের সমর্থন নিশ্চিত হইল। কিন্তু দলপ্রথার চাহিদা হইল নূতন ধরনের। রাষ্ট্রনেতাগণ দল গড়িতে লাগিলেন, দল আবার দলীয় নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসাইবার প্রতিশ্রুতি লইয়া আসিল। ফলে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নূতন পরিস্থিতিতে নূতন বুঝাপড়া, অর্থাৎ নূতন রীতিনীতির প্রবর্তন ঘটিল।

ক্যাবিনেট শাসন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

---

* "Also the effects of a constitution must change with the changing circumstances of national life. New needs demand a new emphasis and a new orientation even when the law remains fixed. Men have to work the old law in order to satisfy the new needs. Constitutional conventions are the rules which they elaborate."—Ibid. P. 82.

অবশ্য ইহার প্রারম্ভিক ফল হিসাবে দেখা গেল যে রাজার রাজপদাধিকার হেতু বিশেষ ধরনের অধিকারগুলি (prerogatives) মন্ত্রিসভার নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। কারণ, তত্ত্ব হইতেছে যে রাজা মন্ত্রিসভার মন্ত্রণা (advice) শুনিয়া কাজ করেন; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সে উপদেশ না শুনিয়া চলিবার উপায় নাই। কারণ, পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দ লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভাকে বিদায় দিলে নূতন মন্ত্রিসভা এ পার্লামেন্ট হইতে আর জুটিবে না। ফলে নূতন রীতিনীতির পত্তন হইল যাহাতে রাজার বিশেষ অধিকারগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহাই নির্দিষ্ট হইল। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিরা রাজকর্মচারী (Servants of the Crown) হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ কর্মচারী হইতে মন্ত্রিসভার পার্থক্য স্থিরীকৃত হইল। নূতন রীতিনীতির ভিত্তিতে নূতন ধরনের শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হইল। এই মন্ত্রিপরিষদের শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে শাসনবিভাগের প্রতিটি অংশের সংহতি এবং শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের সুসমঞ্জস সংযোগ সাধিত হইল।

পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মতবিরোধে লর্ডসভাকে যে কমন্স-সভার নিকট নত হইতে হইবে, ডাইসি ইহাকে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট আইনের ফলে ইহা আর রীতিনীতির পর্যায়ে নাই, আইনে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য লর্ডসভার বিচার সম্পর্কীয় কার্যে যে শুধু 'ল' লর্ডরাই (Law Lords) যুক্ত থাকিবেন, তাহা এখনও রীতিনীতির পর্যায়েই রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, পার্লামেন্টারী কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কে অগণিত নিয়ম-নীতি এখনও রীতিনীতির আওতায় পড়ে। এই রীতিনীতিগুলির দ্বারা বিরোধী পক্ষের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার কার্যকরী হয়।

পার্লামেন্ট সম্পর্কীয় রীতিনীতি

স্যার আইভর জেনিংস্ বলেন: "ব্রিটিশ্ শাসনতন্ত্র বর্তমানে যে ধারায় চলিতেছে তাহাতে রীতিনীতি তাহার ভিত্তি এ কথা বলা যদি সঠিক হয়, তবে অধিকতর সত্যতার সহিত বলা যাইতে পারে যে কমনওয়েলথ অভ্ নেশনস্‌ও রীতিনীতির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত।"*

রীতিনীতি ও কমন্‌ওয়েল্‌থ্

* "If it is almost true to say that the British Constitution, as now operated, is founded on conventions, it is even more true to say that the Commonwealth of Nations is founded on conventions." Sir Ivor Jennings : The Law and the Constitution. P. 92.

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাবিনেট-প্রথা বহুলাংশে ব্রিটিশ রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে ইহাও ঠিক যে আধুনিকতর শাসনতন্ত্র-গুলিতে রীতিনীতিগুলি আইনের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলা হইতেছে। পূর্বে কমনওয়েলথ দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক মূলতঃ প্রচলিত রীতিনীতির দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল। পরে ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনষ্টার আইনের দ্বারা (Statute of Westminster, 1931) সেগুলি আইনে গ্রথিত হয়। কিন্তু এখনও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের যে কোন দেশের চুক্তি সম্পাদনের ও বৈদেশিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্যক্রমের পদ্ধতি আইনের বাহিরে রীতিনীতির নিয়মে আবদ্ধ; তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে বিভিন্ন সাম্রাজ্যিক সম্মেলনের (Imperial Conferences) রিপোর্টের মধ্যে।

'আইন' ও 'রীতিনীতি'

ডাইসি তাঁহার 'Law of the Constitution' নামক বিখ্যাত পুস্তকে আইন ও রীতিনীতির ভিতর নিম্নলিখিতরূপ পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন: আদালতের মারফতে যে সকল নিয়মকে বলবৎ করা হয় তাহা আইন, যেগুলি তাহা করা যায় না তাহা রীতিনীতি।

পার্থক্যটি অবশ্য অত সহজে বোঝা যায় না। কারণ আধুনিক আইন প্রণীত হয় আইন বিভাগের দ্বারা, শাসনবিভাগ সেগুলিকে বলবৎ করে। বিরোধ বাধিলে বিষয়টি আদালতে উপস্থিত হয়। তখনও আদালত শুধু ব্যাখ্যাই করে; বলবৎ করে শাসনবিভাগ। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে 'স্পীকারকে' (Speaker); উপরন্তু বলা হইয়াছে যে স্পীকারের ব্যাখ্যাই চরম, তাহা লইয়া আদালতে মামলা করা চলিবে না। অর্থাৎ, ইহা আইন. কিন্তু আদালতের এক্তিয়ার-বহির্ভূত। অনুরূপ লর্ডসভা, কমন্সসভা প্রভৃতি লইয়া আরও বহুবিধ সমস্যা তোলা যায়।

লিখিত শাসনতন্ত্র থাকিলে এত অসুবিধায় পড়িতে হইত না। বলা যাইত, লিখিত দলিলে যে সকল নিয়ম রহিয়াছে, অথবা উহার দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যে সকল নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আইন; উহার চৌহদ্দির বাহিরে যে সকল নিয়ম গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলি হইল রীতিনীতি। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ত্রুটীমুক্ত না হইলেও, ইহার আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব রহিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে এ সুযোগও পাওয়া যাইবে না।

আসলে রীতিনীতি ও আইনের ভিতর মৌলিক পার্থক্য নাই। শাসনতন্ত্র চালু থাকে জনসম্মতির উপর ভর করিয়া। যদি সংগঠিত জনমত ইহাকে আপত্তিকর বলিয়া মনে করে, তবে আইনের ভিত্তির প্রশ্ন লইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে দ্বিধা করিবে না। আদালত কোন নিয়ম গ্রাহ্য করিল তাহা লইয়া জনসাধারণ মাথা ঘামায় না, ইহা বিশেষজ্ঞদের বিষয়। আর বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে আইন ও রীতিনীতির মধ্যে তিনটি পার্থক্য স্যার আইভর জেনিংস উপস্থিত করিতেছেন: *

প্রথমতঃ, তুলনা করিলে আইনকে অধিকতর অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র বলিয়া মনে হয়; আইন ভঙ্গ করিতে অনিচ্ছা অনেক বেশী দেখা যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, আইন ভঙ্গ করা হইতেছে কি না সে সম্বন্ধে আদালতের সুস্পষ্ট রায় পাওয়া সম্ভব এবং আদালতই বলিয়া দিবে আইনের মর্যাদা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কি কি করণীয়। অথচ শাসন কর্তৃপক্ষ রীতিনীতি মানিয়া চলিবেন ইহা সুনির্ধারিত হইলেও, রীতিনীতি কখন ভঙ্গ করা হইল তাহা ঘোষণা করিবার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নাই, এবং ভঙ্গ করা হইলেই বা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা বলিবারও কোন কর্তৃপক্ষ নাই। অবশ্য আদালত কর্তৃক 'বলবৎ' (enforce) করা এখানে মুখ্য বিষয় নয়। কারণ রানীর নামে মন্ত্রিসভা আইন ভঙ্গ করিলে আদালতের হুকুমে পুলিশ আসিয়া মন্ত্রিসভাকে বাধ্য করিতেছে, এ চিন্তা অবাস্তব। আসলে আদালতের রায়ের কার্যকারিতা নির্ভর করে আইনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্ট ঘোষণায়, আইনের সর্বস্বীকৃত পবিত্রতা ও মর্যাদায় এবং জনমতের শক্তিতে। শাসনতান্ত্রিক আইন ভঙ্গ করিলে পর সরকার জনসমক্ষে গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন দেখাইয়া তাহা সমর্থন করিবেন। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ভঙ্গের অভিযোগ উঠিলে, প্রকৃতই কোন অপরাধ হইয়াছে কি না, অর্থাৎ, যাহাকে রীতিনীতি বলা হইতেছে তাহা রীতিনীতি কি না, তাহা লইয়াই বিতর্ক চলিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, আইন প্রায় সর্বত্রই নির্দিষ্টরূপে নিরূপিত (precisely formulated); রীতিনীতি নিরূপণ করা কাহারও দায়িত্ব নহে। অবশ্য সকল রীতিনীতি সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। যেমন, কমনওয়েলথ সম্পর্কীয়

---

* Sir Ivor Jennings. Cabinet Government. Chapter 1, Section 1 and 2 Pp 3-13.

রীতিনীতি বা রানীর সহিত সরকারের সম্পর্কের রীতিনীতি প্রায় প্রচলিত আইনের (common law) মতই যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট।

বস্তুতঃ, আইনের সহিত রীতিনীতির পার্থক্য বিশেষ নাই। স্যার আরস্কিন মে (Sir Erskine May) রচিত Parliamentary Practice গ্রন্থে যে পার্লামেন্টের আইন ও আচার-প্রকরণ গ্রথিত হইয়াছে তাহাতে আইনের সর্বপ্রকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়, যদিও কড়া আইনজ্ঞের বিচারে তাহাকে হয়ত আইন বলা যাইবে না। আবার বহু আচার-ব্যবহার রহিয়াছে যাহা আইন কি রীতিনীতি সে সম্বন্ধে বিবাদ-নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে আদালতের রায় পাইবার পূর্ব পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত করা যাইবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কোনগুলি প্রকৃত রীতিনীতি তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিবার ভারপ্রাপ্ত কোন সংস্থা নাই। আচার-ব্যবহারের ভিতর হইতে, নজিরের (precedents) পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, রীতিনীতির উদ্ভব হয়।

রীতিনীতির উৎপত্তি

কিন্তু আদালতে যেমন নজির থাকিলেই তাহা বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত, রীতিনীতির ক্ষেত্রে তাহা হইবে না। বহু নজির রহিয়াছে যাহা হইতে রীতি প্রচলিত হয় নাই; নজির-ভিত্তিক বহু রীতি অব্যবহারে অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আসলে নজির হইতে নিয়মের উদ্ভব হয়, নিয়ম হইয়াছে—এই স্বীকৃতি পাওয়ার ভিতর দিয়া ("Precedents create a rule because they have been recognised as creating a rule".—Jennings)। অথচ বহু সাম্প্রতিক নজিরের ভাগ্যে এরূপ সুস্পষ্ট স্বীকৃতি জুটে না। সেইসকল নজিরই এ স্বীকৃতি পায় যখন সকলেই মানিয়া লয় যে পরিবর্তিত বা পরিবর্তনশীল বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শাসনকার্য সুসম্পাদনের প্রয়োজন হইতেই এ নজিরের জন্ম হইয়াছে এবং সে কারণেই ইহাকে অনুসরণ করা দরকার।

আদালত রীতিনীতি মানিয়া চলিবার নির্দেশ না দেওয়া সত্ত্বেও কেন রীতিনীতি মানিয়া চলা হয় সে প্রশ্ন অনেককে বিচলিত করিয়াছে। ডাইসি বলেন যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিবার মূল কারণ হইল এই যে রীতিনীতি লঙ্ঘন করিলে শেষ পর্যন্ত আইনও ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। সুতরাং যেহেতু আদালতের মারফতে আইন বলবৎ করা হয়, সেজন্য পরোক্ষভাবে হইলেও রীতিনীতি মান্য করার পিছনে আদালতের নির্দেশ রহিয়াছে। উদাহরণ

রীতিনীতি মানিয়া চলার কারণ

স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে বৎসরে অন্ততঃ একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন হইবার যে রীতি আছে তাহা ভঙ্গ করিলে সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী (বার্ষিক) আইন পাস করা যাইবে না; ফলে স্থায়ী সামরিক বাহিনী বজায় রাখা বেআইনী হইয়া পড়িবে। বাৎসরিক অর্থসম্পর্কীয় আইনও পাস করা হইবে না, ফলে কতকগুলি কর আদায় ও কয়েকটি ব্যয় বেআইনী হইবে। মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা হারানোর পরও পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর রায়ের জন্য আবেদনও করিতেছে না, অথচ গদি আঁকড়াইয়া আছে,—এইরূপ পরিস্থিতিতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে।

ডাইসি যেরূপভাবে আইন ভঙ্গ হইবার বর্ণনা দিয়াছেন, সেরূপ না ঘটিতেও পারে। জুলাই মাসের মধ্যেই সাধারণতঃ উপরিলিখিত আইনগুলি পাস হইয়া যায়। তাহা হইলে জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের এপ্রিল, এই নয় মাস কমন্স-সভার আস্থা হারাইয়াও মন্ত্রিসভার পক্ষে টিঁকিয়া থাকা সম্ভব। রাজার ঋণ করিবার অধিকার রহিয়াছে; ঋণের মারফৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যয়ভার পরিচালনা করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, বহুবিধ রীতিনীতি রহিয়াছে যেগুলি লঙ্ঘন করার ভিতর কোন আইনভঙ্গের আশঙ্কা নাই। যেমন, লর্ডসভার বিচার পরিচালনার সময় 'ল লর্ড' (Law Lords) ছাড়া আরও দশজন সাধারণ লর্ড যদি জুটিয়া যান তদ্দারা কোন আইনই ভঙ্গ করা হইবে না। কমনওয়েলথ সম্পর্কীয় বহু রীতিনীতির অবস্থাও এরূপ। এমন কি পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রিসভার সম্মিলিত দায়িত্বের সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিও তো ১৯৩২ সালের 'জাতীয় সরকার' ভাঙ্গিয়াছিল। মন্ত্রিসভার কিছু সদস্য একদিকে ভোট দিলেন, বাকিরা অপর-দিকে। তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও বলা হইল যে মন্ত্রিসভা অন্য সমস্ত ব্যাপারে একমত থাকার ফলে, জাতির ইচ্ছায় ও প্রয়োজনের তাগিদে একটি ব্যাপারে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন সঠিক হইয়াছে। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার টিকিয়া গেল, আইন ভঙ্গ হইল না।

জেনিংস বলেন যে ডাইসির ভুল হইতেছে এই কারণে যে তিনি শুধু আইনকে বলবৎ করার কথাই ভাবিতেছেন। আইনকে বলবৎ করা যায় আইনভঙ্গকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির বিরুদ্ধে। সরকারের বিরুদ্ধে তাহা করা সম্ভব নয়। সরকারের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা যায় একমাত্র সফল বিপ্লবের মারফতে। কিন্তু বিপ্লব সফল হইলে যে সিদ্ধান্ত বলবৎ করা হয়, তাহার পশ্চাতে পূর্ববর্তী আইনের সমর্থনের খুব বেশী গুরুত্ব থাকে না।

আসলে সরকার শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলে আদালতের ভয়ে নয়; ইহার কারণ ভিন্ন। শাসনতান্ত্রিক রীতি ভঙ্গ করিলে, বিরোধীপক্ষের অভিযোগে পার্লামেন্টের সভা মুখর হইয়া উঠিবে। শুধু পার্লামেন্টের সদস্যদিগের নিকটেই নহে, পার্লামেন্টের মাধ্যমে, সমগ্র জাতির সম্মুখে সরকারকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হইবে। কমন্সসভার বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাহাই থাকুক না কেন, ভবিষ্যৎ নির্বাচনের ভাবী নির্বাচকমণ্ডলী সরকারকে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না, যদি না সরকার কৃতকার্যের ঔচিত্য সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এই রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ন্ত্রণই সরকারকে রীতিনীতি মানিতে বাধ্য করে। নির্যাসে বলিতে গেলে বলা যায় যে রীতিনীতি মানিয়া চলার পিছনে মূল যুক্তি হইল: (১) ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও (২) জনমত সম্বন্ধে আগ্রহ। ইহার সহিত পূর্বোল্লিখিত এ যুক্তিও মনে রাখা প্রয়োজন যে শাসনতান্ত্রিক আইনের কঠিন কাঠামোকে বর্তমান প্রয়োজন ও বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার প্রয়োজন মিটানোই রীতিনীতির মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যেগুলি তাহা করে তাহা মানিয়া চলাই স্বাভাবিক। যতক্ষণ সমাজে 'বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন' ও 'বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণা' সম্বন্ধে ব্যাপক ঐক্যমত থাকিবে, ততক্ষণ 'রীতিনীতি' মান্যকরা সম্বন্ধে বিশেষ সমস্যা উঠিবে না। কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আবহাওয়া ঝটিকাসঙ্কুল হইয়া উঠিলে, তখন 'রীতিনীতি' সম্বন্ধে একের ব্যাখ্যা অপরের নিকট সম্পূর্ণ অগ্রহণীয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু সেরূপ মৌলিক আলোড়নে শুধু রীতিনীতিই নয়, ব্যাপকতর ও গভীরতর বিষয় লইয়াই টান পড়িবে।

এখানে শুধু আর একটি কথা বলা প্রয়োজন: আমরা এই অধ্যায়ের বর্তমান অংশে যাহাকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উপাদান (elements) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাকেই কোন কোন লেখক আবার শাসনতন্ত্রের উৎস (sources) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সূত্রে তাঁহারা আরও একটি উৎসের বিষয় অবতারণা করেন, তাহা হইল ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক আইন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ কতকগুলি পুস্তকের কথা। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়, বেজহটের 'ইংল্যাণ্ডীয় শাসনতন্ত্র' (The English Constitution by Bagehot), এ্যানসনের "শাসনতন্ত্রের আইন ও প্রথা" (Law and Custom of the Constitution by Anson), মে-এর 'পার্লামেন্টীয় আচার-পদ্ধতি' (Parliamentary Practice by May), ডাইসির 'শাসনতন্ত্রের আইন'

(Law of the Constitution by Dicey), জেনিংসের 'ক্যাবিনেট সরকার' (Cabinet Government by Ivor Jennings), ইত্যাদি। স্বভাবতঃই এগুলি আইন নয়; কিন্তু প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা শাসনতন্ত্রকে বুঝিতে, বুঝাইতে এবং কার্যতঃ শাসনতন্ত্রের বিকাশ ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Characteristic features of the British Constitution) ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য সকল অনুসন্ধানীর দৃষ্টিই আকর্ষণ করে, তাহা হইল ইহার সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতার সহিত তাল রাখিয়া ক্রমপরিবর্তনশীল চরিত্র (Continuity and Change)।

ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের মিশ্রণ

প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত খাপ খাওয়াইয়া আধুনিকতম প্রয়োজন এই শাসনতন্ত্র কি করিয়া মিটাইতেছে তাহার অনুশীলন বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার। অতীত প্রকরণকে বর্তমান প্রয়োজনের সহিত মিলাইয়া চলাই যেন ইহার স্বভাব। অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে একমাত্র ক্রমওয়েলের সময় ছাড়া অতীতকে উপড়াইয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ নূতন শাসনতন্ত্র রচনার প্রচেষ্টা ইংল্যাণ্ডে আর কখনও হয় নাই। অথচ দেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। অবাধ রাজশক্তি স্বল্পসংখ্যক ধনী ব্যবসায়ী, ভূম্যধিকারী, প্রভৃতির হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ছাড়িয়া দিল; উনবিংশ শতাব্দীতে আবার নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট সরকারের দায়িত্বশীলতার গণতান্ত্রিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সমস্ত অবস্থাতেই দৃশ্যতঃ একই শাসনতন্ত্র মৌলিক পরিবর্তন ব্যতিরেকেই কাজ করিয়া চলিয়াছে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু ব্রিটেন তাহার প্রাচীন প্রকরণ ত্যাগ করে নাই; বিপ্লবের মধ্যেও সে রক্ষণশীল।*

ইহারই ফলে উদ্ভূত হইয়াছে ইহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য,—তাত্ত্বিক বর্ণনা ও বাস্তব কার্যক্রমে পার্থক্য (the gap between theory and practice)। বলা হইয়া

তত্ত্বে ও বাস্তবে পার্থক্য

থাকে রাজকীয় সরকার, রাজার আইন, রাজার বিচার, মন্ত্রিরা রাজার উপদেষ্টা কর্মচারীমাত্র, রাজার নির্দেশ ছাড়া নির্বাচন হইবে না, রাজার সম্মতি ব্যতীত আইন পাস করা

* "....the Englishman is conservative even in his revolutions."
—Ogg and Zink. Modern Foreign Governments. P. 33.

যাইবে না, রাজার আদেশ ব্যতীত কোন কর্মচারী নিয়োগ করা যাইবে না। এগুলি আসলে তাত্ত্বিক বর্ণনামাত্র। বাস্তবে রাজার এইরূপ সর্বব্যাপক ও সর্বগ্রাসী কার্যাধিকার নাই। তাঁহার কাজ মন্ত্রিরাই করেন। আসলে ভিতরের সারবস্তুটি পাল্টাইয়া গিয়াছে বাহিরের আনুষ্ঠানিক রূপটি পুরাতনই রহিয়া গিয়াছে।

একককেন্দ্রিক সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় নহে

তৃতীয়তঃ, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হইল এই যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে শাসনক্ষমতা এমনভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে যে উভয় পর্যায়ের সরকার নিজনিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে কার্য করিবার ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বপ্রধান; কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, কেহ কাহারও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ব্রিটেনে আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা আছে ঠিকই। কিন্তু তাহাদের শাসনক্ষমতার উৎস হইল পার্লামেণ্টের আইন। পার্লামেণ্ট আবার আইন করিয়া ইহাদের শাসনক্ষমতার রদ-বদল বা বিলোপ-সাধন করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এ বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ, সেখানে শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টরূপে শাসনক্ষমতা বণ্টিত রহিয়াছে। একে অপরের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করা সংবিধান বিরোধী, তথা বেআইনী, হইবে।

সীমাবদ্ধ ক্ষমতা বিভাজন

চতুর্থতঃ, ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-বিভাজন নীতির সীমিত প্রয়োগ দেখা যায় (limited separation of powers)। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মঁতেস্ক্যু (Montesquieu) যখন ব্রিটেনের উদাহরণ সম্মুখে রাখিয়া "আইনের প্রাণবস্তু" (Spirit of Laws) নামক তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থে ক্ষমতাবিভাজন নীতি ব্যাখ্যা করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহার পূর্বেই ব্রিটেনের শাসনগত চরিত্র অন্যরূপ ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে। মঁতেস্ক্যু ভাবিয়াছিলেন: পার্লামেণ্ট আইনবিভাগ, রাজা শাসনবিভাগ ও বিভিন্ন আদালত মিলিয়া বিচারবিভাগ,—ব্রিটেনে এইরূপ একটি সুসমঞ্জস ত্রিবিধ ক্ষমতা-বণ্টন সংসাধিত হইয়াছে। অথচ, ততদিনে ব্রিটেনে ক্যাবিনেট প্রথা জন্মলাভ করিয়াছে, আইন ও শাসন বিভাগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় বলা যায় ক্যাবিনেট-প্রথার মাধ্যমে ব্রিটেনে 'দায়িত্বের কেন্দ্রীকরণ' ("concentration of responsibilities"—

Ramsay Muir) ঘটিয়াছে, ক্ষমতা-বিভাজন নয়। কারণ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা শাসনবিভাগের শীর্ষে থাকিয়া রাজার নামে শাসন পরিচালনা করিতেছে। আবার, মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল, অর্থাৎ, মন্ত্রিসভার কার্যকাল নির্ভর করিতেছে পার্লামেণ্টের সমর্থন বা অসমর্থনের উপর। মন্ত্রিসভা গঠিত হয় কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে কেন্দ্র করিয়া, তাঁহার পছন্দমত দলীয় পার্লামেণ্ট-সদস্যদের মধ্য হইতে। অর্থাৎ, সকলেই পার্লামেণ্টের সদস্য, সকলেই অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, প্রশ্নের জবাব দিতেছেন, বিল উত্থাপন করিতেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত থাকায় তাঁহাদের সম্মিলিত ইচ্ছা সমর্থিত হইতেছে। এককথায়, একই সংস্থা,—মন্ত্রিসভার উপর আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের নেতৃত্বভার ন্যস্ত রহিয়াছে। উপরন্তু লর্ডসভা হইল আইনবিভাগের উচ্চতর কক্ষ, অথবা, লর্ডসভাই দেশের উচ্চতম আপীল-আদালত এবং লর্ডসভার সভাপতি লর্ডচ্যান্সেলর (Lord Chancellor) মন্ত্রিসভার সদস্য।

তথাপি, বিচার-বিভাগ সম্পর্কে ক্ষমতাবিভাজন নীতির সীমাবদ্ধ প্রয়োগ রহিয়াছে বলা ভুল হইবে না। কারণ ১৭০১ সালের নিষ্পত্তি আইন (Act of Settlement of 1701) আদালতের বিচারপতিগণের নির্দিষ্ট মাহিনা (fixed salaries) নিশ্চিত করিয়াছে, সৎ কার্যকালের (tenure during good behaviour) মধ্যে চাকরির স্থায়িত্ব নিরাপদ করিয়াছে। রাজার নিকট পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মিলিত আবেদনের মারফতেই কোন বিচারককে অপসারিত করা চলিবে। সুতরাং বিচারকদের স্বাধীন কার্যক্রমের পথে কোন প্রতিবন্ধক নাই এমন কি লর্ডসভা উচ্চতম আপীল-আদালত হওয়াতেও নীতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ, লর্ড-সভা সাধারণ অধিবেশনে বিচার করিতে বসে না, ভিন্ন পদ্ধতিতে ভিন্ন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা এই দায়িত্ব পালিত হয়।*

তুলনায় মার্কিন শাসনতন্ত্র ভিন্নপথ ধরিয়াছে। লক্, মঁতেস্কু, ব্ল্যাক্‌ষ্টোন (Locke, Montesquieu, Blackstone), প্রভৃতির মন্ত্রে দীক্ষিত মার্কিন

* "The circumstance that one branch of Parliament, the House of Lords, is the highest court of appeal in the judicial system is not incompatible with the judicial independence asserted, since in its judicial and legislative capacities, the body operates with quite different personnel and by somewhat different procedures."—Ogg and Zink—Modern Foreign Governments. p 39

শাসনতন্ত্রের প্রণেতৃগণ ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া ক্ষমতাবিভাজন নীতির ছক বাঁধা প্রয়োগ করিয়াছেন। কালের যাত্রাপথে প্রয়োজনের তাগিদে শাসন ও আইনবিভাগের মধ্যে সেতু রচনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ফলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আজ নানাভাবে আইন সভাকে প্রভাবিত করিতে পারেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সহযোগিদের সহিত মিলিয়া নিয়মিত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহার সহিত কোন তুলনা হয় না।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

পঞ্চমতঃ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনতঃ চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতাই বোধ হয় এ শাসনতন্ত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অবশ্য আমরা 'পার্লামেন্ট' বলিলেও, আইনসিদ্ধ ভাষা হইল 'পার্লামেন্ট সমেত রাজা' (King-in-Parliament)। কিন্তু এ ভাষায় আসলে ইতিহাসের পদচিহ্ন লক্ষিত হইবে; বাস্তবে রাজা পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনে সম্মতিদান করিতে কখনই অস্বীকার করেন না। উপরন্তু, পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান নহে। পরবর্তী বিশদ আলোচনায় দেখা যাইবে যে কমন্সসভা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে লর্ডসভার বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া নিজ-ইচ্ছাকেই আইনে পরিণত করিতে পারে,—অবশ্য সেক্ষেত্রেও রাজার সম্মতি লাগে। সুতরাং পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলিতে বুঝায় নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়: (ক) পার্লামেন্ট যে কোন আইন (statute) প্রণয়ন, সংশোধন বা রদ করিতে পারে, যে কোন প্রচলিত আইন (Common law) সংশোধন বা বাতিল করিতে পারে, যে কোন আদালতের রায়কে (Judicial decision) নাকচ করিতে পারে, যে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি (established convention) বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে; এবং (খ) পার্লামেন্টের কোন কাজকেই আইন-বহির্ভূত ঘোষণা করার অধিকার কাহারও নাই। পার্লামেন্টের ক্ষমতার উপর প্রত্যক্ষ এমন কি আইনগত নিয়ন্ত্রণ (Positive and even legal limitations) রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই দাবি করিয়াছেন। কিন্তু, বাস্তব রাষ্ট্রনীতির খাতিরে কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও তাহার নেতৃত্ব কি করিবে সে কথা ছাড়িয়া দিলে, —প্রকৃতপক্ষে নীতির অনুশাসন, জনমত, আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রভৃতি অনেক কিছু ভাবিয়াই তাহাদের অগ্রসর হইতে হয়,—আইনের দিক হইতে পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বপ্রধান, ইহাকে বাঁধিবার কোন উচ্চতর ক্ষমতা নাই। তবে

একটিমাত্র সীমাবদ্ধতার কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারি, যদিও তাহা পার্লামেন্টের প্রাধান্য ও গরিমাই নির্ধারিত করিতেছে। তাহা হইল, পার্লামেন্টের কোন আইনই ভবিষ্যতের হাত বাঁধিয়া দিতে পারে না। অর্থাৎ, পার্লামেন্ট এমন কোন আইন করিতে পারে না, যাহা পরের পার্লামেন্ট পরিবর্তন বা রদ করিতে পারিবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মৌলিক পার্থক্য এখানেই স্বপ্রকাশ। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা কংগ্রেসের ক্ষমতা লিখিত দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র দ্বারা সীমিত; ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অপরিসীম। এই কারণে উভয় দেশে 'সংবিধান-বিরোধী' কথাটির অর্থও দুইপ্রকার। মার্কিন দেশে যখন 'সংবিধান-বিরোধী' কথাটি উচ্চারণ করা হয়, তখন তাহার অর্থ হইল এই যে, কোন আইন বা কোন কার্য লিখিত শাসনতন্ত্রের নির্দেশ ভঙ্গ করিতেছে এবং তাহা আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে বা হইবে। ব্রিটেনে কিন্তু পার্লামেন্টের কোন আইনকেই শাসনতন্ত্রবিরোধী বলা চলে না। তথাপি ব্রিটেনেও কথাটি প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে ইহার অর্থ হইল এই যে, বক্তার মতে পার্লামেন্টের ঐ আইনটি ব্রিটেনের ঐতিহ্য-বিরোধী, শাসনতান্ত্রিক সরকারের আদর্শ-বিরোধী, প্রচলিত ও সর্বজনমান্য নীতি-লঙ্ঘনকারী—এক কথায় অত্যন্ত আপত্তিকর। অবস্থা গুরুতর হইলে সারা ব্রিটেনে জনমত তীব্র নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিবে। তবুও আসল কথা এই যে এদেশে 'সংবিধান-বিরোধী' এ অভিযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কোন আদালতের নিকট নয়, ইহা ব্যাপক জনমতের বিচারের নিকট আবেদন।

'সংবিধান বিরোধী' কথার অর্থ

ষষ্ঠতঃ সাধারণভাবে বলা হইয়া থাকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয় (unwritten and flexible)। লিখিত শাসনতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র যে তাহা নয়, সে কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আসলে, শাসনতন্ত্রের 'লিখিত' ও 'অলিখিত' এই বিভাগের গুরুত্ব নিতান্তই বিশেষজ্ঞদের জন্য। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'লিখিত' শাসনতন্ত্রেও অলিখিত অংশের গুরুত্ব প্রচণ্ড; সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে। আবার ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে 'লিখিত' অংশের প্রাচুর্যও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে ইহাকে

শাসনতন্ত্র অলিখিত ও নমনীয়

সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয় (flexible) শাসনতন্ত্র বলা হইয়া থাকে। সুপরিবর্তনীয়তার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে যে এরূপ শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতেই সংশোধিত করা যায়। ব্রিটেনের এ বৈশিষ্ট্য সন্দেহাতীত। পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলোচনায় ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রিটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আইন প্রণয়নকারী ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই*

কিন্তু তাহা হইলেও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত বা সংশোধিত হয় কি কি পদ্ধতিতে এবং বাস্তবে তাহা কতটা সহজসাধ্য সে প্রশ্নের স্বতন্ত্র বিচার প্রয়োজন। কারণ, পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের (statutes) মারফতেই শুধু শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হয় না। পূর্ববর্তী আলোচনা স্মরণ করিলেই দেখা যাইবে যে রীতিনীতি ও আদালতের রায়ের (conventions and judicial decisions) এখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন আইন শাসনতন্ত্রসম্মত কি না এ বিচার চলে, ব্রিটিশ আদালতের সে ক্ষমতা নাই। তথাপি মামলার বিচার করিতে বসিয়া ব্রিটিশ আদালতও আইনের অর্থ ও উদ্দেশ্য (meaning and intent of statutes as well as common law) লইয়া আলোচনা করে এবং নিজস্ব ব্যাখ্যা দ্বারা শাসনতান্ত্রিক নীতি প্রভাবিত করে। আবার পার্লামেণ্ট ইচ্ছামত শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে পারে একথা যেমন সত্য, ইহাও সত্য যে বাস্তবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অত্যন্ত সাবধানী, শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার পূর্বে বহু চিন্তা করিয়া, বহু সময় ব্যয় করিয়া, ব্যাপক জনমতের সমর্থন সংগ্রহ করিয়া, তবেই আইনগত পরিবর্তন করিতে অগ্রসর হয়। ভোটাধিকার সম্প্রসারণ শুরু হয় ১৮৩২ সালের সংশোধনী আইনের মারফৎ; সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণতা লাভ করে ১৯২৮ সালের আইনে, যখন ২১ বৎসর ও তদূর্ধ্ব-বয়স্ক স্ত্রীলোকদেরও ভোটের অধিকার প্রদান করা হয়। দীর্ঘকালের রীতিনীতি উত্তরণ করিয়া, বহু কনফারেন্স, কমিশন পার করিয়া, তবেই ১৯৩১ সালের ওয়েষ্ট-মিনষ্টার আইন পাস হয়। ১৯১১ সালে পার্লামেণ্ট-আইনের ক্ষেত্রেও

শাসনতন্ত্র পরিবর্তন পদ্ধতি

* "In Great Britain....there is no legal difference between *constituent* authority and lawmaking authority such as exists in the United States."—Munro and Ayearst—The Governments of Europe p. 23.

দেখা যায় যে পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে দুই বৎসরব্যাপী তীব্র সংগ্রাম, মন্ত্রিসভার দুইবার পদত্যাগ ও দুইটি সাধারণ নির্বাচনে সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত জনসাধারণের অভিমতের সমর্থনের ভিত্তিতেই এ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল।

বস্তুতঃ শাসনতন্ত্র সংশোধন করা সহজ কি দুঃসাধ্য তাহা নির্ভর করে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, ধারণা, মেজাজ এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চরিত্রের উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধন করা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য। কিন্তু সেদেশে একশত তিয়াত্তর বৎসরের পুরাতন শাসনতন্ত্রকে নবীন ও সতেজ রাখা গিয়াছে মূলতঃ আদালতের রায় ও রীতিনীতির বিকাশের মাধ্যমে। সুতরাং ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় এই শ্রেণীবিভাগের উপযোগিতা সীমাবদ্ধ। মান্রো ও এয়ার্ষ্ট বলিতেছেন: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মতই সমান সজীব ও সদাপরিবর্তনশীল; কিংবা তাহার চেয়ে কিছুটা বেশীও হইতে পারে। এমনও বলা যাইতে পারে যে প্রতি সোমবার সকালে সুপ্রীম কোর্টের নূতন রায় বাহির হইবার সাথে সাথেই শাসনতন্ত্রের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। কোন সজীব, সতেজ জাতি প্রাণহীন সংবিধান সহিতে পারে না। আনুষ্ঠানিক পরিবর্তনের পদ্ধতি দুরূহ হইলে, সংশোধনের অন্য উপায় সে খুঁজিয়া বাহির করে।"*

আইনের অনুশাসন ও নাগরিক অধিকার

সপ্তমতঃ আইনের অনুশাসন (Rule of law) ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অপরতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই আইনের অনুশাসন বস্তুটি সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

খুব সহজ ভাষায় আইনের অনুশাসন কথাটির তাৎপর্য ইহাই দাঁড়ায় যে, যে-কোন বিবাদেই আদালতে আইন অনুযায়ী বিচার পাওয়া যাইবে। সরকার

* ("The constitution of the United States is just as living and ever changing as that of Great Britain, or more so. One might almost say that it undergoes some change every Monday morning when the Supreme Court hands down its decisions. No vigorous nation ever tolerated a lifeless constitution. If the methods of formal amendment prove too cumbersome, it finds some other agency of change." —Munro and Ayearst—The Governments of Europe, p. 28

এমন কোন কাজ করিবে না যাহার পশ্চাতে আইনের সমর্থন নাই। সাধারণ-ভাবে বলিতে গেলে ইহার মধ্যে ন্যায়-বিচারের ধারণা নিহিত রহিয়াছে।

বস্তুতঃ ইংল্যাণ্ডের অতীত ইতিহাসের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার অর্থ আরও স্পষ্ট হইবে। সামন্ততান্ত্রিক যুগে সামন্ত-প্রভুদের ভিন্ন ভিন্ন শাসন, ভিন্ন ভিন্ন হুকুমনামা, ক্ষান্তিহীন ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব ও 'জোর-যার-মুলুক-তার' এই নীতি, মানুষকে, বিশেষতঃ নতুন জাগ্রত ব্যবসায়ী সমাজকে, দৃঢ়ভিত্তিক শাসন ও নিশ্চিত আইনের জন্য ব্যগ্র করিয়া তুলিয়াছিল। আসিল নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতার (absolute authority of the monarch) যুগ। কিন্তু ক্রমেই রাজার স্বেচ্ছাচারিতার সহিত প্রজার নিশ্চিন্ত জীবনের প্রয়োজনীয়তার বিরোধ বাধিল। কারণ রাজার হুকুমই যদি আইন হয় তাহা হইলে সে আইন সব সময়েই প্রজার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ ষ্টুয়ার্ট বংশের রাজত্বের সময় দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ, বিক্ষোভ ও বিপ্লবই তাহার প্রমাণ। বিশেষ করিয়া এই সময়ে বিচারকেরা 'প্রচলিত আইনের' ব্যাখ্যা লইয়া হাজির হন এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বহু গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার স্থিরীকৃত হয়। ফলে 'আইনের অনুশাসনের' এক বিশেষ তাৎপর্য গড়িয়া উঠিতে থাকে,—তাহা একদিকে শাসকবর্গের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে, অপরদিকে বহু নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে।

পটভূমিকা

খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক সংজ্ঞা উপস্থিত করিতে না পারিলেও, বলা যায় যে 'আইনের অনুশাসন' কথাটি এক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বহন করিতেছে। ইহা বলিতে মোটামুটি বুঝি যে শাসক-মণ্ডলীর ক্ষমতা পার্লামেণ্ট-প্রণীত অথবা আদালতের ব্যাখ্যা হইতে উদ্ভূত আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। আরও বুঝি, কিছুটা ক্ষমতা-বিভাজনের ভিতর দিয়া ক্ষমতার সীমিতকরণ; খুব অস্পষ্ট হইলেও স্বাধীনতা ও সাম্যের (liberty and equality), অন্ততঃ 'আইনের সম্মুখে সমানাধিকার'এর (equality before the law) ধারণা ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। অপরাধ সংক্রান্ত আইনের (criminal law) ব্যাপারে মূলতঃ চারিটি ধারণাকে ইহা প্রশ্রয় দিয়াছে: (১) বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধ স্থায়ী সাধারণ নিয়মের দ্বারা স্থির নির্ধারিত হইবে; (২) এই সকল সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন অপরাধের জন্য কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যাইবে না; (৩) এই সকল শাস্তিমূলক আইনের যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে হইবে যাহাতে

বর্তমান অর্থ

আইনের ধারায় নিশ্চিতরূপে না পড়িলে কোন কার্যকে অপরাধমূলক বলিয়া ধরা চলিবে না; এবং (৪) অতীতে অনুষ্ঠিত কোন কার্যের জন্য পরবর্তী যুগে প্রণীত আইনের প্রয়োগ করা চলিবে না।*

ডাইসির ব্যাখ্যা

ডাইসি বলিয়াছেন: "দেশের সাধারণ আদালতের সম্মুখে সাধারণ আইনানুগ পদ্ধতিতে নিশ্চিতরূপে আইনভঙ্গ হইয়াছে ইহা প্রমাণ না করা গেলে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া বা আইনতঃ কাহারও দৈহিক, বা আর্থিক ক্ষতিসাধন করা চলিবে না। শাসন কর্তৃপক্ষের হস্তে ব্যাপক, অবাধ ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক শাস্তিদানের ক্ষমতা ন্যস্ত এরূপ যে কোন শাসনব্যবস্থার সহিত তুলনায় আইনের অনুশাসনের পার্থক্য এই অর্থেই প্রকট।"†

ডাইসির এ উক্তি একপেশে। কারণ, বর্তমানেও আদালত অবমাননার দায়ে যে কোন আদালত অনিশ্চিত কালের জন্য কারাবাসের আদেশ দিতে পারে। নরহত্যার (manslaughter) অপরাধে কখনও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, কখনও বা বেকসুর খালাস হইতে পারে। বিদেশী নাগরিকত্ব চাহিলে স্বরাষ্ট্রসচিবের মর্জির উপর নির্ভর করিতে হইবে। যুদ্ধের সময় যে কোন নাগরিকের বিদেশের সহিত সম্পর্ক কঠিন নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়িবে। জলাধার নির্মাণের জন্য বা অনুরূপ সাধারণ প্রয়োজনের খাতিরে যে কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তির মালিকানা ছাড়িতে বাধ্য করা যাইতে পারে। যে কোন ব্যক্তিকে নিজস্ব রুজি-রোজকার ছাড়িয়া মাসাধিককালের জন্য জুরি-হিসাবে আদালতে হাজির থাকিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়াও, মূল প্রশ্ন তো রহিয়া গেলই। অর্থাৎ, শাসন চলিবে আইন

---

* First, it means that the category of crimes should be determined by general rules of a more or less fixed character. Secondly it implies that a person should not be punished except for a crime which falls within these general rules!........Thirdly, it may mean that penal statutes should be strictly construed, so that no act may be made criminal which is not clearly covered by the statutes. Fourthly, it may mean that penal laws should never have retrospective effect. Sir Ivor Jennings—The Law and the Constitution. p. 51

† "No man is punishable or be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. In this sense the rule of law is contrasted with every system of government based on the exercise by persons in authority of wide, arbitrary, or discretionary powers of contraint."—Dicey

অনুযায়ী ঠিকই, কিন্তু আইনের ন্যায্যতার মাপকাঠি কে ঠিক করিয়া দিবে? জেম্‌স্‌ হার্ভে ও ক্যাথারিন হুড লিখিত "ব্রিটিশ রাষ্ট্র" নামক পুস্তকে ("The British State by James Harvey and Katherine Hood) এরকম বহু আইনের উল্লেখ করিয়াছেন যেগুলি বিভিন্ন সময়ে গুরুতররূপে নাগরিক অধিকার খর্ব করিয়াছে।*

এমন কি "সাধারণ আদালতে"র বিচারের উপরও যে সকল সময়ে নির্ভর করা যায় না, বিশেষ করিয়া মালিক ও শ্রমিকের বিরোধে শ্রমিকগণের অধিকারের ব্যাপারে তাহারও বহু প্রমাণ ও প্রচুর নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য উপরোক্ত লেখকদ্বয় উপস্থিত করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রিষ্টলি বনাম ফাউলারের (Priestley *v* Fowler, 1837) মামলার উল্লেখ করা যায়। কর্মরত শ্রমিকের দৈহিক আঘাত বা হানির জন্য মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, ইহা 'প্রচলিত আইনে' স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আদালত রায় দিলেন যে কার্যরত অপর কোন শ্রমিক বা কর্মচারীর গাফিলতির জন্য যদি ক্ষতি হয়, তাহা হইলে মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নহে। সুদীর্ঘ ১১২ বৎসর কাল এ নজিরে শ্রমিকশ্রেণীকে দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে; এ আইন বাতিল হইয়াছে ১৯৪৮ সালে পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্তের ফলে। †

ডাইসির সমালোচনায় স্যার আইভর জেনিংস "আইনের অনুশাসনের" ধারণাকে 'উদ্দাম অশ্বে'র সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ব্যাখ্যাকারের নির্দেশে যে কোন অর্থই ইহাকে দিয়া বহন করানো চলিবে না। মোটামুটিভাবে "স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের" সহিত "শাসনতান্ত্রিক সরকারের" পার্থক্য নিরূপণের প্রয়োজনে এ ভাষা ব্যবহার যুক্তিযুক্ত বলিয়া তিনি মনে করেন। ‡

* তাঁহারা বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত উদাহরণগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: Defence of the Realm Act, 1914, Emergency Powers Act, 1920, Incitement to Disaffection Act, 1934, Public Order Act, 1936. প্রভৃতি।)

† সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে কৌতুহলোদ্দীপক আলোচনা পাওয়া যাইবে James Harvey and Katherine Hood প্রণীত The British State, Chapter XI—English Law and the Legal Systems এ।

‡ "The truth is that the rule of law is apt to be rather an unruly horse. If it is only a synonym for law and order, it is characteristic for all civilised states; and such order may be based on principles which no democrat would welcome and may be used, as recent examples have shown, to justify the conquest of one state by another.

ত্রুটী ও সমালোচনা সত্ত্বেও ব্রিটেন তাহার নাগরিকদের যে পরিমাণ অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়াছে, তাহা ব্রিটেনের পক্ষে গর্বের ও অন্যান্য বহু দেশের পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু। অবশ্য ইহার পটভূমিকা হিসাবে সুদীর্ঘ গণআন্দোলনের ইতিহাস, বিশেষ করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর তীব্র সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা ভুলিলে চলিবে না। এই প্রসঙ্গে পূর্বে যাহা লিখিয়াছি তাহা আর একবার স্মরণ করাইয়া দিতে চাই : "...অধিকার উপরতলার দান হিসাবে আসে না; রাষ্ট্রকর্তৃক অধিকার স্বীকৃতির পশ্চাতে থাকে এই অধিকারের অনুপস্থিতির ফলস্বরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অসুবিধা, জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ও গভীর অভাববোধ এবং ইহার স্বীকৃতির জন্য দীর্ঘকালীন সংগ্রামের ইতিহাস।"*

নাগরিক অধিকার

অন্যান্য বহু দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যেই মূল নাগরিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ব্রিটেনে সে সুযোগ নাই। এখানে তাহা আসিয়াছে একদিকে আদালতের রায় ও বিশেষ আইনের মারফৎ; অন্যদিকে তাহা নিশ্চিত ও নিরাপদ হইয়াছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক চেতনার মাধ্যমে।

ব্রিটিশ আদালতগুলি প্রথমে 'হেবিয়াস কর্পাস' (habeas corpus) প্রবর্তিত করিয়াছিল যাহাতে কর্তৃপক্ষের উপর আদালত নির্দেশ দিতে পারিত বন্দীকে আদালতের সম্মুখে হাজির করিতে এবং তাহাকে বন্দী করিবার যথোপযুক্ত আইনসঙ্গত কারণ দর্শাইতে। আদালত সন্তুষ্ট না হইলে বন্দীকে মুক্ত দিবার আদেশ জারি করিত। ইহার দ্বারা বেআইনীভাবে বিনাবিচারে বন্দী করার পথ বন্ধ থাকে। ১৬৭৯ সালে ইহা পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া অধিকারের বিলের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মূলতঃ বাক্‌স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা প্রভৃতি 'প্রচলিত বিধির' উপর ভর করিয়া আছে। অর্থাৎ, নীতি হইল এই

If it is not, it is apt to express the political views of the theorist and not to be an analysis of the practice of government. If analysis is attempted, it is found that the idea includes notions which are essentially imprecise. If it is merely a phrase for distinguishing democratic or constitutional government from dictatorship, it is wise to say so." Sir Ivor Jennings. The Law and the Constitution. p. 60.

* নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্যামলকুমার চক্রবর্তী—আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পৃঃ ২১৯

যে, কোন আইন বা অপরের কোন অধিকার ভঙ্গ না করা পর্যন্ত তুমি যাহা খুশি করিতে বা বলিতে পার। অর্থাৎ, নাগরিকদিগের কোন কোন স্বাধীনতা রহিয়াছে তাহা আইন বলিবে না; কোথায়, কতটুকু, স্বাধীনতা লঙ্ঘিত, খর্বিত বা সীমিত হইল তাহাই ঘোষণা করিবে। অর্থাৎ, তোমার বাক্‌স্বাধীনতা আছে ইহা ঘোষণা করা হয় নাই, আইন মারফৎ নির্দিষ্ট সীমা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে তুমি রাজদ্রোহ (sedition) বা কুৎসা (libel) প্রচার করিতে পারিবে না, ঈশ্বর বা ধর্ম সম্বন্ধে অমর্যাদা (blasphemy) প্রকাশ করিবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য (perjury) দিবে না, অথবা অপরের কোন অধিকার লঙ্ঘন করিবে না।

আরও কতকগুলি আইনগত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, 'নিবারণমূলক পরোয়ানার' (Writ of Prohibition) দ্বারা উর্ধ্বতন আদালত নিম্নতর আদালতের উপর এক্তিয়ার ছাড়াইয়া না যাইবার নির্দেশ জারি করিতে পারে; এক্তিয়ারবহির্ভূত রায়কে রদ করা যায় 'সার্টিওরারি হুকুমনামা' (Writ of Certiorari) জারি করিয়া; 'ম্যাণ্ডামাস নির্দেশনামার' (Writ of Mandamus) মারফৎ আদালত কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে দায়িত্বপালন করিবার নির্দেশ দিতে পারে; এবং 'রিট অভ কুও ওয়ারাণ্টো' (Writ of Quo Warranto) ব্যবহার করিয়া যে কোন কর্মচারীকে তাহার পদাধিকার প্রমাণ করিতে বাধ্য করা যায়। আদালতের এই সকল বিভিন্ন ক্ষমতা নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

এত কথার ভিড়ে আসল কথাটি ভুলিলে চলিবে না। আইনের ধারা আর আদালতের বিচারে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হয় না। ব্রিটেনে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় আছে তাহার কারণ ইহা নয় যে এখানে আইন ভাল এবং বিচারকগণ সৎ। বিচারকগণ শুধু আইন দেখিবেন এবং আইন নির্ভর করে আইনপ্রণেতৃবর্গের উপর। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নিষ্পেষণমূলক আইন জারি করিয়াছে এবং ব্রিটিশ বিচারকগণও ব্যক্তিস্বাধীনতা-বিরোধী রায় দিয়াছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তা রহিয়াছে মূল দুইটি ব্যবস্থায়: প্রথমতঃ, ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা; অর্থাৎ, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বা তাহার গুরুত্বপূর্ণ অংশ কমন্সসভা, কিছুকাল পর পর জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়, পার্লামেণ্টের সদস্যগণকে স্বীয় কার্যের কৈফিয়ৎ দিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ জনসাধারণ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় উদ্‌গ্রীব, ব্যক্তিস্বাধীনতা লঙ্ঘনের তিক্ত

সমালোচনায় তাহারা মুখর, লঙ্ঘিত বা খর্বিত ব্যক্তিস্বাধীনতার পুনঃ পূর্ণপ্রতিষ্ঠায় তাহারা তৎপর। স্যার আইভর জেনিংসের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির মধ্যেই প্রকৃত পথনির্দেশ রহিয়াছেঃ "আমাদের স্বাধীনতার মূল আইন বা প্রতিষ্ঠানে নাই, স্বাধীন জনতার জীবনীশক্তির মধ্যে ইহা নিহিত রহিয়াছে।"*

গণতান্ত্রিক চারিটি নীতি

স্যার আইভর জেনিংস তাহার 'Cabinet Government' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মূল চারিটি নীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি হইলঃ (১) ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র গণতান্ত্রিক; (২) ইহা পরিষদীয় শাসনব্যবস্থা; (৩) এখানে রাজতন্ত্র বর্তমান এবং (৪) ইহা মন্ত্রিসভা চালিত সরকার। †

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ, পার্লামেণ্ট, মন্ত্রিপরিষদ ও রাজার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা লইয়া কিছুটা আলোচনা ইতিপূর্বে হইয়াছে। পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিষয়গুলির বিশদ আলোচনা করা হইবে।

---

* "... the source of our liberty is not in laws or institutions, but in the spirit of a free people." W. Ivor Jennings. The British Constitution. p. 226

† "Practice turn into conventions and precedents create rule because they are consistent with and are implied in......the principles. of the constitution. Of these there are four of major importance. The British constitution is demccratic; it is parliamentary, it is monarchical; and it is a cabinet system." Sir Ivor Jennings. Cabinet Government. p 13

তৃতীয় অধ্যায়

রাজতন্ত্র (The Monarchy)

আইনের তত্ত্ব ও বাস্তব ঘটনার পার্থক্য যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহা পূর্বে একাধিকার উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মার্কিন লেখকেরা ঠাট্টা করিয়া বলেন যে ইংরেজ লেখকগণ তাঁহাদের শাসনতন্ত্র বলিতে আইনতঃ কি বুঝিতে হইবে তাহারই ব্যাখ্যা করিতে অর্ধেক সময় ব্যয় করেন, আর বাকি সময়টা ধরিয়া বুঝান যে উহার আসল চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।*

তত্ত্ব ও বাস্তবের এই বিরাট পার্থক্য বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকট হইয়াছে রাজকীয় ক্ষমতার ক্ষেত্রে। স্যার ওয়াল্টার বেজহট (Sir Walter Bagehot) তাঁহার "The English Coustitution" নামক গ্রন্থে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ক্ষমতার যে ভয়াবহ তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আতঙ্কিত মহারাণী নাকি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "কি দুষ্টু লোক,—এই সব গল্প ছড়াচ্ছে। আমার প্রজারা নিশ্চয়ই ওর কথা বিশ্বাস করে না।" †

অথচ মহারাণী বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, তাঁহারই অন্যতম প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোনও (Gladstone) কয়েকবৎসরের মধ্যেই আবার বলিলেন যে মহারাণী সমস্ত রাজস্ব আদায় করেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, মন্ত্রিদের নিয়োগ বা বরখাস্ত করেন, পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং ভাঙ্গিয়া দেন, বিদেশের সহিত চুক্তি করেন, যুদ্ধ ঘোষণা করেন বা শান্তি স্থাপনা করেন, অপরাধীদের সাজা মকুব করেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—আর প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আইনের

* "....English writers, in describing their Government, devote half their chapters to picturing what it is supposed to be, and other half to explaining that it is in reality something quite different."—Munro and Ayearst. The Governments of Europe. p. 26

† "Oh, the wicked man to write such a story," the Queen is said to have exclaimed when the passage was brought to her attention : "surely my people do not believe him."—Ogg and Zink. Modern Foreign Governments. p. 47; footnote.

কোনরূপ প্রতিবন্ধক তাঁহার উপর নাই, এবং ফলাফলের জন্য কোনরূপ দায়দায়িত্ব তাঁহার উপর বর্তায় না।

আসলে বেজ্‌হট, গ্ল্যাডষ্টোন, বা মহারাণী ভিক্টোরিয়া, কেহই ভুল বলিতেছেন না। এসব কাজ আইনতঃ রাজাই করেন, কিন্তু কোন কাজই রাজা ব্যক্তিগতভাবে করেন না। বোঝার পক্ষে সুবিধা হয় যদি আমরা বলি যে যিনিই রাজসিংহাসনে বসিবেন, রাজমুকুট যিনিই ধারণ করিবেন, ব্যক্তি হিসাবে তিনি যে কেহই হউন না কেন, এ সকল দায়িত্ব তাঁহাকেই পালন করিতে হইবে। আসলে, এগুলি হইল মুকুটধারীর দায়, তা সে মুকুট সাময়িকভাবে এডওয়ার্ড, হেন্‌রি, জর্জ, ভিক্টোরিয়া বা এলিজাবেথ, যাঁহারই মাথায় শোভা পাক না কেন।

মুকুটধারীর দায়
(Powers of the Crown)

অতীতে, এমন কিছু সুদূর অতীতও নয়, কয়েকশত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত উপরোক্ত কার্যগুলি যে রাজার দায়িত্ব ইহা লইয়া আলোচনার অবকাশ ছিল না। এ সকল কাজ তিনি করিতেন শুধু নয়, করিতেন নিজের ইচ্ছামত, মর্জিমত। অর্থাৎ, অবাধ রাজতন্ত্রের যুগ ছিল তখন। তাহার পর কালের বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজা রহিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেণ্টের হাতে। পার্লামেণ্ট নিজে শাসন চালাইল না, চাহিল, রাজার শাসন এমনভাবে চলিবে যাহাতে সব বিষয়েই পার্লামেণ্টের সমর্থন থাকে। সুতরাং রাজা ডাকিলেন মন্ত্রিদের, যে সব মন্ত্রিরা পার্লামেণ্টের, ওরফে কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন। ফলে, মন্ত্রিরা বাহ্যতঃ রাজার মন্ত্রণাদাতা কর্মচারী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রীর কথা ঠেলিবার ক্ষমতা রাজার নাই। কারণ তাহা হইলে কমন্সসভার বিরুদ্ধে যাওয়া হয়। সুতরাং, রাজার হুকুম আসলে মন্ত্রিদের হুকুম, আর মন্ত্রিদের হুকুমের পিছনে রহিয়াছে কমন্সসভার সমর্থন। অর্থাৎ রাজা নির্দেশ দিতেছেন তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত অনুযায়ী নয়, কমন্সসভার সমর্থনপুষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে নির্দেশ আইনতঃ ও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার নির্দেশ হইলেও, তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীতও হইতে পারে। অর্থাৎ, আনুষ্ঠানিক মুকুটধারী রাজার সহিত রাজা ব্যক্তিটিকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে (difference between the Crown and the King)। বাহ্যতঃ আনুষ্ঠানিক মুকুটধারী রাজা হইলেন রাষ্ট্রের প্রধান (Head of the State), শাসনব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত (chief executive)। তাঁহাকে সম্মুখে

রাখিয়া পশ্চাতে রাজা, মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্টের এক অতি সূক্ষ্ম শক্তিসমন্বয় কাজ করিয়া চলিয়াছে।*

সিডনি লো (Sidney Low) তাঁহার The Governance of England-এ এই কারণেই রাজাকে বলিয়াছেন "a convenient working hypothesis" বা "কাজের পক্ষে সুবিধাজনক অনুমান"। "অনুমান" এ-জন্যই বলা হইতেছে যে রাজ্যশাসন তাঁহার নামে চলিলেও, ক্ষমতা তাঁহার হস্তে নাই।

রাজার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে সূত্রাকারে একটি নীতি উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে: রাজা অন্যায় করিতে পারেন না (The king can do no wrong.)। যে লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করে ও কাজ করে, সে কখনও কোন অন্যায় করিবে না, তাহা হইতেই পারে না। এ উক্তির অর্থই হইল যে রাজকার্যের কোনও ত্রুটীর জন্য রাজা দায়ী হইবেন না, দায়ী হইবেন মন্ত্রী। কিন্তু যে কাজ রাজা করিতেছেন সে কাজের দায় মন্ত্রী বহন করিবেন কেন?

"রাজা অন্যায় করিতে পারেন না"

মন্ত্রী দায়িত্ব তখনই গ্রহণ করিবেন, যখন সে কার্যের সিদ্ধান্তও তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থায় রাজার নামে যাহা ঘটিবে, আসলে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন মন্ত্রিসভা বা কোন মন্ত্রী, রাজার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাতে যুক্ত থাকিবে। সেইজন্যই আইনতঃ ব্যবস্থা হইতেছে এই যে, যে-কোন নির্দেশনামাতেই রাজার স্বাক্ষরের পাশাপাশি কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রিরও স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। নতুবা তাহা আইনগ্রাহ্য হইবে না। ব্যক্তিগত চূড়ান্ত বিচারের অধিকার রাজার নাই (the "Sovereign cannot retain the final right of private judgement,"); পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল কোন মন্ত্রী রাজার কাজের দায়ীত্ব না লওয়া পর্যন্ত রাজা স্বয়ং কোন প্রকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। ("In no case can the Sovereign take political action unless he is screened by a minister responsible to Parliament.")।†

দায় মন্ত্রিদের, সিদ্ধান্তও মন্ত্রিদেরই।

* "The institutional king is only a sort of fiction standing back of the supreme executive authority embodied in a subtle association of sovereign, ministers and Parliament." Ogg and Zink. *Ibid.* p. 48

(† Lord Esher: Quoted in 'Cabinet Government' by Sir Ivor Jennings. p. 337.)

কথিত আছে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের শয়নকক্ষে তাঁহার জনৈক সভাসদ নিম্নোক্ত ছড়াটি লিখিয়া রাখিয়াছিল :

"Here lies our Sovereign lord the king,
Whose word no man relies on ;
Who never says a foolish thing,
Nor ever does a wise one."

অর্থাৎ—'এখানে শায়িত আমাদের দণ্ডমুণ্ডেশ্বর মহারাজাধিরাজ। তাঁর কথার উপর কেউ কোনদিন নির্ভর করে না। কারণ, জ্ঞানহীনের মত কথা তিনি কখনও বলেন নি, আর জ্ঞানবানের মত কাজও তিনি কোনদিন করেন নি।" এ ব্যঙ্গের জবাবে মহারাজ নাকি বলিয়াছিলেন: "ঠিকই! কথা তো বলি আমি, কিন্তু কাজ যে করেন মন্ত্রিরা!"

রাজমুকুটধারীর এই আনুষ্ঠানিক রূপটি প্রকট করিবার উদ্দেশ্যে আরও একটি সূত্র প্রচলিত। তাহা হইল: 'রাজার মৃত্যু নাই' (The king never dies.)।

"রাজা অমর"

মানুষ অমর নয়; সুতরাং মরদেহী রাজার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রাজকার্য একমুহূর্তের জন্যও বন্ধ থাকিতে পারে না, সুতরাং রাজসিংহাসন একমুহূর্তের জন্যও শূন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং আইন বলে যে রাজার মৃত্যুর সাথে সাথেই, কোনরূপ ছেদ না দিয়া, পরবর্তী উত্তরাধিকারী রাজার সকল সম্মান, অধিকার ও দায়িত্বে ভূষিত হইলেন। রাজা মরণশীল; কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্বের প্রতীক রাজমুকুট চিরজীবী। এ তত্ত্ব হইতে আর একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; তাহা হইল,—শাসনতান্ত্রিক বিচারে অভিষেকের (coronation) বিশেষ গুরুত্ব নাই। রাজা শুধু অভিষেকের

অভিষেকের অর্থ

দিন হইতে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ইহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। পূর্ববর্তী রাজার মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে সিংহাসন শূন্য হইবার মুহূর্ত হইতে, তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অভিষেক হইল, ঘটিয়া যাওয়া ঘটনার জাঁকজমকপূর্ণ, চাকচিক্যময়, উৎসবমুখর স্বীকৃতি ও ঘোষণা। আইন ও বাস্তবতার দিক হইতে ইহার মূল্য আনুষ্ঠানিক; ইহার রাজনৈতিক সার্থকতা লোকরঞ্জনে।

রাজার ক্ষমতা।—রাষ্ট্রব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত, রাষ্ট্রপ্রধান, ব্রিটিশ রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করা হইল। সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে

এই ক্ষমতাসমূহের চরিত্র ও ব্যাপকতা সম্পর্কে কিছুটা বর্ণনা আবশ্যক। কিন্তু তাহারও পূর্বে এই ক্ষমতা-সমূহের উৎস কি, কোন কোন সূত্রে রাজকীয় ক্ষমতা তাহার বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে, সে বিষয় কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন।

ক্ষমতার উৎস

রাজকীয় ক্ষমতার উৎস হইল দুইটি : (১) রাজার বিশেষ অধিকার (prerogatives); (২) পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন (statutes)। অতীতে অবাধ রাজতন্ত্রের সকল যুগে রাজক্ষমতাই রাজার বিশেষ অধিকার বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাহার পর পার্লামেণ্ট আইন করিয়া রাজার ক্ষমতা সীমিত ও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যেহেতু শাসনতন্ত্র রাজাকে রাজ্যশাসনের শিখরে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, অর্থাৎ; শাসনব্যবস্থা যখন রাজার নামেই চলে, তখন যে কোন নূতন আইন সরকারের উপর নূতন কর্তব্যভার অর্পণ করে, তাহাই রাজার হস্তে নূতন ক্ষমতা ন্যস্ত করে। অর্থাৎ, আইন করিয়া যখন কয়লাখনি ব্যক্তিগত মালিকানা হইতে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল, তখন সেই আইনই কয়লাখনি পরিচালনার ক্ষমতাও রাজার হস্তে বা সরকারের হস্তে তুলিয়া দিল। এতক্ষণ আমরা বলিয়াছি পার্লামেণ্টের আইনে রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু, বুঝিতে হইবে যে, যেহেতু রাজা হইলেন শাসনব্যবস্থার প্রধান, সেজন্য যে কোন আইনে সরকারের ক্ষমতার প্রসার করার অর্থই হইল রাজার ক্ষমতার সম্প্রসারণ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে রাজা বলিতে মুকুটধারী আনুষ্ঠানিক রাজাকে বুঝাইতেছে।

আইন

ডাইসি বলিয়াছেন "যে কোন সময়ে আইনতঃ রাজার অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাধীন কর্তৃত্বের যতটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে"* তাহাকেই রাজার বিশেষ অধিকার (prerogative) বলা যাইবে। পার্লামেণ্ট তো রাজার ক্ষমতা খর্ব করিয়াছে; রাজার বহু প্রাচীন ক্ষমতা অব্যবহারে ক্রমে বাতিল হইয়া গিয়াছে। তথাপি, যেগুলি টিঁকিয়া গেল এবং নূতন রীতিনীতির প্রয়োগের ভিতর দিয়া ও আদালতের বিচারের মাধ্যমেও নূতন যাহা কিছু রাজকীয় ক্ষমতায় যুক্ত হইল, এই সব মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে রাজার বিশেষ ক্ষমতা অতি ব্যাপক। এ ক্ষমতা

বিশেষ অধিকার

* "The residue of discretionary or arbitrary authority which at any time is legally left in the hands of the Crown."—Dicey. Law of the Constitution.

পার্লামেণ্ট কোনদিন আইন করিয়া রাজহস্তে অর্পণ করে নাই; এ ক্ষমতা আইন করিয়া পরিবর্তিত বা বাতিল করিবার পূর্ণ অধিকার পার্লামেণ্টের রহিয়াছে; তৎসত্ত্বেও পার্লামেণ্ট এগুলি এখন পর্যন্ত মানিয়াই চলিয়াছে। অবশ্য পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন আর রাজার বিশেষ অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করিবার গুরুত্ব নাই। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই পার্লামেণ্ট প্রয়োজনবোধে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। তাহা হইলেও রাজার বহু বিশিষ্ট অধিকার রহিয়াছে; এবং সেগুলির নিজস্ব চরিত্র পরিষ্কার বুঝিবার জন্য তাহার উৎসমুখ জানা প্রয়োজন। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের উল্লেখ করা গেল: পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা, ভাঙ্গিয়া দেওয়া; উপাধি দানের দ্বারা লর্ডসভার সদস্যপদের সৃষ্টি করা; মন্ত্রী ও বিচারক নিয়োগ করা; যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করা; নৌবাহিনী বজায় রাখা; অপরাধীকে ক্ষমা করা; রাজকীয় সনদ দ্বারা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা; ভোটাধিকার দান করা, জাতীয় জরুরী পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার জাহাজ জোরদখল করিয়া লওয়া, প্রভৃতি, আইন দ্বারা নির্দিষ্ট নহে এরূপ অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাধীন কর্তৃত্বের অবশিষ্টকে রাজকীয় বিশেষ অধিকার বলা হইয়া থাকে।

রাজকীয় ক্ষমতার প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি আমরা দুইটি সিদ্ধান্তে আসিতে পারি:

দুইটি সিদ্ধান্ত

১। কালের অগ্রগতির সহিত রাজকীয় ক্ষমতা একদিকে কমিয়াছে, অপরদিকে বাড়িয়াছে। কমিয়াছে মূলতঃ তিনটি পদ্ধতির মারফৎ: (ক) বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সনদের দ্বারা; (খ) নিষেধমূলক আইনের দ্বারা; (গ) অব্যবহারের দ্বারা। বাড়িয়াছে প্রধানতঃ দুই ধারায়: (ক) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এবং (খ) প্রচলিত রীতিনীতির সূত্রে। পুনরুক্তি ঘটিলেও পুনর্বার স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে ব্রিটেনের বিশিষ্ট পটভূমিকায় রাজকীয় ক্ষমতা কমিবার অর্থ রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতার হ্রাস, এবং বাড়িবার অর্থ সরকারের সামগ্রিক কার্যভারের প্রসারণ। এই বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখিলেই,—"গণতন্ত্রের প্রসারের সাথে সাথে রাজকীয় ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে,"—এই আপাতঃ স্ববিরোধী উক্তির তাৎপর্য বুঝা যাইবে।*

* "The powers of the Crown have expanded as democracy has grown."—Ogg and Zink, op. cit. p. 51

২। রাজকীয় কর্তৃত্ব শুধু শাসনবিভাগের উপর বর্তায়না। ইহা শাসন-ব্যবস্থার সর্বত্র, সকল কাজকে ছাইয়া আছে। ক্ষমতাবিভাজন নীতির বিপরীত পথে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিকাশের পটভূমিকায় দেখিলে এ বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হইবে।

শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা :—রাজা শাসনবিভাগের শীর্ষে অবস্থিত। সুতরাং সকল আইনকে কার্যকরী করিবার দায়িত্ব তাঁহার। তিনি শাসনবিভাগের ও সামরিক বিভাগের সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে এবং বিচারকসমূহকে কার্যে নিয়োগ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সিনেটসভা কর্তৃক সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন হয়; ব্রিটেনে পার্লামেণ্টের অনুরূপ সমর্থনের কোন আইন বা রীতি নাই। রাজা শাসনবিভাগের কার্য পরিচালনা করেন; বিচারক ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। বৈদেশিক সম্পর্কের কার্যভার তাঁহারই পরিচালনাধীন। ডোমিনিয়নের সহিত সম্পর্ক ও উপনিবেশের শাসন তাঁহারই নিয়ন্ত্রণে চলে। সকল সামরিক বিভাগের চরম নিয়ামক তিনিই। বিশেষ কয়েকটি অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন বা তাহার দণ্ডহ্রাসের কর্তা তিনিই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুলনায় শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত কয়েকটি পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে! প্রথমত আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা শাসন পরিচালনার বহু ব্যাপারে নিয়মকানুন প্রণয়ন করিয়া বা অনুসন্ধানী কমিশন ইত্যাদি নিয়োগ করিয়া, হস্তক্ষেপ করে। ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট মন্ত্রিদের অনেক বেশী স্বাধীনভাবে কাজ করিতে সুযোগ দেয়। দ্বিতীয়তঃ ব্রিটেনে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা থাকায় আঞ্চলিক শাসনের উপরেও মন্ত্রিদের কর্তৃত্ব অনেক বেশী প্রকট ও প্রত্যক্ষ। তৃতীয়তঃ পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় কার্যেও পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ তুলনায় অনেক কম। ব্রিটেনে একমাত্র রাজাই যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও শান্তি স্থাপন করেন। পার্লামেণ্ট বিমুখ হইলে অবশ্য মন্ত্রিসভার পতন ঘটিবে। কিন্তু পার্লামেণ্টের নিজ হইতে যুদ্ধ বা যুদ্ধসমাপ্তি ঘোষণা করিবার কোন প্রত্যক্ষ সুযোগ নাই।* অনুরূপভাবে রাজা পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে

* "War is declared and peace made as if by the king alone.... Parliament itself has no direct means of bringing about a war or of bringing war to an end.—" Ogg and Zink. op. cit p. 52.

পারেন ; পার্লামেন্টের সম্মতির ব্যাপারে নীতিগত স্বীকৃতি থাকিলেও আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই।* আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতি প্রয়োজন। তিনি চুক্তি সম্পাদনও করিতে পারেন, কিন্তু আইনসভার উচ্চকক্ষ, অর্থাৎ সিনেটের সমর্থন অপরিহার্য।

আইন প্রণয়নে রাজার ভূমিকা:—ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে "সপার্লামেন্ট রাজা"র (The King in Parliament) হস্তে। বস্তুতঃ আজও প্রত্যেকটি আইন সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হইয়া থাকে যে তাহা "এই সভায় সমাবিষ্ট সকল ধর্মীয় ও জাগতিক অভিজাতবর্গ এবং সাধারণের উপদেশ ও সম্মতিক্রমে এবং তাহাদেরই কর্তৃত্বাধীনে মহামহিমার্ণব রাজ্যাধীশ কর্তৃক" প্রণীত হইয়াছে। (Every statute is enacted "by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present parliament assembled, and by the authority of the same.") অবশ্য আইন প্রণয়নে ব্যক্তিগতভাবে রাজার কিছু করণীয় নাই ; এ ক্ষেত্রেও দায় মুকুটধারী রাজার, ব্যক্তি-রাজার নহে।

কিন্তু রাজা ছাড়া কাজ চলিবে না। প্রথমতঃ, রাজাই সভা আহ্বান করেন, স্থগিত রাখেন বা ভঙ্গ করেন। নির্বাচনের মাধ্যমে নূতন কমন্সসভা গঠনের ব্যবস্থা করেন। রাজমন্ত্রিরা সকল দিক হইতেই পার্লামেন্টের কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। রাজার উদ্বোধনী বক্তৃতা তাঁহারাই রচনা করেন ; তাহাতে মন্ত্রিসভার কার্যক্রমের বর্ণনা থাকে ; কোন বিল কখন পার্লামেন্টের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইবে তাহাও তাঁহারাই স্থির করেন। এক কথায় পার্লামেন্ট কি করিবে বা না করিবে তাহার প্রধান নিয়ামক তাঁহারাই। কিন্তু মন্ত্রিসভার দ্বৈতভূমিকা ভুলিলে চলিবে না: কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বই তাঁহাদের ক্ষমতার মূল উৎস ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা রাজকর্মচারী এবং রাজার স্বাক্ষর ব্যতীত কোন বিলই আইন হইয়া উঠিবে না। অবশ্য বিগত প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পার্লামেন্ট অনুমোদিত কোন বিলে রাজা স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন নাই।

পার্লামেন্টের সহিত সম্পর্ক

* "People who assumed... that ....no treaties would be made without parliamentary assent have found that they were mistaken." op. cit. p. 53.)

কিন্তু তথাপি রাজার স্বাক্ষরের প্রশ্ন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে এখনও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে; সে প্রশ্ন পরে পুনর্বার আলোচনা করিতে হইবে।

রাজার আইন প্রণয়ন সম্পর্কে অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বহুবিষয়ে পার্লামেণ্ট নিজস্ব আইনের মাধ্যমে মূল নীতি নির্দেশ করিয়া শাসনবিভাগের হস্তে খুঁটি-নাটি নিয়ম কানুন রচনার ভার ছাড়িয়া দেয়। এই নিয়ম-কানুন প্রিভি কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী রাজার নির্দেশ (Orders-in-Council) বলিয়া পরিচিত। এইগুলি আইনের সমমর্যাদা লইয়াই প্রযুক্ত হয়। ইহাদের রচয়িতা মন্ত্রিসভা।

অর্ডারস-ইন্-কাউন্সিল

ব্রিটেনে এখনও "রাজা সকল বিচারের মূলাধার" (The king is the fountain of all justice)। "রাজার আইন" অনুযায়ী "রাজার আদালতে" বিচার হয়। রাজার বিরুদ্ধে কোন আদালতেই নালিশ চলিবে না, রাজা অন্যায় করিতে পারেন না বলিয়াও বটে, উপরন্তু রাজার আদালতে রাজার বিচারই বা হয় কি করিয়া? আসলে কিন্তু এই সবই তত্ত্বের কথা, রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবে রাজার সম্মানকে উচ্চে তুলিয়া ধরা ইহার উদ্দেশ্য। বাস্তবে পার্লামেণ্টের আইনের ভিত্তিতেই আদালতগুলি গঠিত হইয়াছে। আদালতের সংগঠন, কর্মপদ্ধতি, বিচারকদের বেতন বা চাকরিকাল, প্রভৃতি সবই আইনের দ্বারা নির্ধারিত। রাজা বিচারকগণকে নিযুক্ত করিলেও, বিচারকালে বিচারকদিগকে কোনরূপেই নিয়ন্ত্রণ করা বা তাহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার উপায় নাই; এমন কি রাজা তাহাদিগকে স্ব-ইচ্ছায় চাকরি হইতে অপসারিত করিতে পারেন না; অপসারণের জন্য পূর্বাহ্নে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের আবেদন প্রয়োজন হয়। রাজা নূতন কোন আদালত বসাইতে পারেন না, বিচারকগণের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারেন না, তাঁহাদের চাকরি-সংক্রান্ত নিয়মকানুনের রদবদল করিতে পারেন না। বস্তুতঃ এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা হয়। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজকীয় ক্ষমতা হইল—কোনও ব্যাপারেই রাজা ব্যক্তিগতভাবে আদালতে অভিযুক্ত হইবেন না। সকল বিচারপতিকেই রাজা নিয়োগ করেন; বিচার বিভাগের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের ভার লর্ড-চ্যান্সেলরের উপর; কিন্তু তিনি রাজমন্ত্রী, অর্থাৎ রাজকর্মচারী; আদালতে অপরাধমূলক অভিযোগ আনা হয় রাজার

রাজা ন্যায় বিচারের উৎস

নামে; এবং সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ক্ষমতা হইল, উপনিবেশ ও ডোমিনিয়ন হইতে আগত সকল আপীল মামলার বিচার হয় রাজার নামে, প্রিভি-কাউন্সিলের বিচার সম্পর্কীয় কমিটির দ্বারা (by the Crown, on advice of the judicial committee of the Privy Council)।

ইংল্যাণ্ডে এ্যাংলিকান চার্চ ও স্কট্‌ল্যাণ্ডে প্রেসবিটারিয়ান চার্চ ছাড়া অন্যান্য ধর্মমতের সহিত রাজার কোন সম্পর্ক নাই। এ্যাংলিকান চার্চের ক্ষেত্রে রাজা আর্কবিশপ ও বিশপগণকে নিয়োগ করেন। এমন কি ডীনরা (Deans) নিয়মিতভাবে এবং ক্যাননরা (Canons) মাঝে মাঝে রাজার দ্বারাই নিযুক্ত হন। বিভিন্ন স্তরের ধর্মাধ্যক্ষদের লইয়া দুই কক্ষ সম্বলিত যে ধর্ম-সমাবেশ (Convocation) হয় ক্যাণ্টারবেরি (Canterbury) ও ইয়র্কে (York), সে অধিবেশনও আহূত হয় রাজাজ্ঞায় এবং তাহাদের বিধি-বিধান চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইবার জন্য প্রয়োজন হয় রাজসম্মতির। স্কটল্যাণ্ডের প্রেসবিটারিয়ান চার্চের ক্ষেত্রে রাজার ভূমিকা কিছু কম গুরুত্বসম্পন্ন হইলেও, নিতান্ত নিরর্থক নহে।

ধর্মসম্পর্কীয় ক্ষমতা

অতীতে রাজা নিজ ইচ্ছামত সম্মানসূচক খেতাব বিতরণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিবার কেহ ছিল না। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মত এ ক্ষেত্রেও ক্ষমতা এখন মন্ত্রিসভায় বর্তাইয়াছে। বলা হয়,—"রাজাই সম্মানের উৎস" (The king is the fountain of honour.)। খেতাব বিতরিত হয় রাজার নামে। সাধারণতঃ রাজার জন্মদিনে এবং পয়লা জানুয়ারীতে, অথবা রাজাভিষেক কিংবা রাজ-শাসনের জুবিলী উৎসবের মত বিশেষ উপলক্ষে, সম্মানিত ব্যক্তিগণের তালিকা ঘোষিত হয়। এ তালিকা প্রস্তুত করেন প্রধানমন্ত্রী। এমন হইতে পারে যে রাজা ব্যক্তিগতভাবে অনেককেই জানেন না, হয়ত বা কেহ কেহ তাঁহার নিকট বিরক্তি-ভাজন ও আপত্তিকর। তাহা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর তালিকাতেই তাঁহার স্বাক্ষর পড়িবে; কারণ সম্মান প্রদানের ব্যাপারে পার্লামেণ্টে যদি সমালোচনা উঠে, তবে তাহা রাজার উপর পড়িবে না, সে দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীকেই বহন করিতে হইবে। তবে প্রধানমন্ত্রীও সাধারণতঃ রাজার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন না। স্যার আইভর জেনিংস, বিশেষ করিয়া, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে সম্মান প্রদান একান্তভাবে প্রধানমন্ত্রীর মর্জির উপরই নির্ভর করে না; রাজা ইচ্ছামত কোন ক্ষেত্রে সম্মান-

সম্মান বিতরণের ক্ষমতা

দানে বিরোধিতা করিতে পারেন আবার অপর কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মান প্রদানের জন্য জিদ ধরিতেও পারেন।* রাজা নিরাসক্ত ও শক্তিহীন স্বাক্ষরকারীমাত্র নহেন।

এতক্ষণ ধরিয়া রাজক্ষমতা ও রাজার করণীয় দায়িত্বের সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা গেল। কিন্তু বারবার অত্যন্ত সঠিকভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাজা স্বেচ্ছাচারী শাসক নহেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিভিন্ন ক্ষমতা ব্যবহার করেন জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কমন্সসভার নেতৃত্ব হিসাবে মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট এবং কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল বা বিশেষভাবে গঠিত বোর্ড ইত্যাদি। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে: রাজা যদি ব্যক্তিগতভাবে কিছুই না করেন, তবে এরূপ ক্ষমতাহীন অথচ চাকচিক্যময় ও ব্যয়বহুল পুত্তলিকাকে রাষ্ট্রমঞ্চে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য কি? রাজা কি সত্যই জাঁকজমকপূর্ণ নিগুর্ণ প্রতীক (magnificent cipher)? ইহা কি নিছক ইতিহাসের প্রতি অর্থহীন সম্মান প্রদর্শন মাত্র? ইংরেজ জাতির বহুঘোষিত গণতন্ত্রের আদর্শ কি বর্তমান রাজতন্ত্রের প্রকোপে কিছু পরিমাণেও ক্ষুণ্ণ হয় না? এই সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া বাহির করিতে পাইতে হইলে, রাজা স্ব-ইচ্ছায় ও স্বকীয় বিচারে রাষ্ট্রনৈতিক কোন কার্য করেন কি না, সে বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। আবার এই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে রাজার বিশেষ উপযোগিতার প্রশ্নটিও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে সিংহাসনের অধিকার, রাজার খেতাব, প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন।

সিংহাসনের অধিকার

১৬৮৮-৮৯ সালের গৌরবময় বিপ্লব নির্ধারিত করিয়া দিয়া গেল যে ব্রিটেনের রাজমুকুট ধারণ করিবার শর্তাদি পার্লামেন্টই স্থির করিবে। ১৭০১ সালের নিষ্পত্তি আইন (Act of Settlement, 1701) অনুযায়ী ব্রিটিশ সিংহাসনের অধিকারী নির্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে উইলিয়াম ও এ্যানের উত্তরাধিকারীর অভাবে প্রথম জেম্‌সের দৌহিত্রী প্রটেষ্ট্যাণ্টধর্মাবলম্বী রাজকুমারী সোফিয়া ও তাঁহার বংশধরদের উপর রাজমুকুট ও রাজার বিশেষ অধিকার সকল বর্তাইবে।

* "But the grant is not entirely in the Prime Minister's discretion. The king is able to resist the grant of honours of which he does not approve.........On the other hand, the Sovereign may press for the conferment of some honour." Sir Ivor Jennings: Cabinet Government, p. 463

("The Crown and all prerogatives appertaining thereto should "be, remain, and continue to the Most Excellent Princess Sophia, and the heirs of her body, being Protestants." সোফিয়া তখন ক্ষুদ্র জার্মান রাষ্ট্র ইলেক্‌টোরেট অব হ্যানোভারের (Electorate of Hanover) বিধবা রাজমহিষী। তাঁহার পুত্র ১৭১৪ সালে প্রথম জর্জ নাম গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ বংশেরই একাদশতমা রাজ্ঞী বর্তমান রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জার্মানবিরোধী জনমত রূপ পাইয়াছে রাজ-বংশের নাম পরিবর্তনে: বর্তমানে 'হ্যানোভার বংশ' না বলিয়া 'উইণ্ডসর বংশ' (House of Windsor) এই আখ্যায় রাজপরিবারকে ভূষিত করা হয়। ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজ্ঞী' অভিধা গ্রহণ করেন। ভারত স্বাধীন হইবার পর উহার বিলোপ সাধন করা হইয়াছে। ফলে বর্তমান রাণীর উপাধিসমেত সম্পূর্ণাঙ্গ আখ্যা হইল: "দ্বিতীয় এলিজাবেথ, ঈশ্বর কৃপায় গ্রেটব্রিটেন ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য এবং তাঁহার অন্যান্য রাজ্য ও অঞ্চলের রাণী, কমনওয়েলথের প্রধান, ধর্মবিশ্বাসের পালয়িত্রী" ("Elizabeth the Second, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.")। ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনষ্টার আইন পাস হইবার পর হইতে ব্রিটিশ রাজবংশ সম্পর্কে আইনগত অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কারণ, এ আইনের ফলে ব্রিটিশ রাজা আজ ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত জাতিসমূহের সদস্যবৃন্দের স্বাধীন সংযোগের প্রতীক (The symbol of the free association of members of the British Commonwealth of Nations); দ্বিতীয়তঃ, সিংহাসনে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত যে কোন আইনেই কমন্‌ওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের আইনসভার সমর্থন প্রয়োজন হয়; তৃতীয়তঃ, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকৃত কোন আইন কমন্‌ওয়েলথের কোন দেশেই প্রযুক্ত হইবে না, যদি ঘোষণা না করা হয় যে ঐ আইন সেই বিশেষ দেশের অনুরোধ ও সম্মতিক্রমে প্রণয়ন করা হইয়াছে। ১৯৩৬ সালের (রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের) রাজ্যত্যাগ সম্পর্কিত আইনে কমনওয়েলথভুক্ত প্রতিটি দেশই স্বতন্ত্ররূপে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে।

জ্যেষ্ঠের অধিকার ও স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষের অধিকারের অগ্রগণ্যতার

নীতি (principles of primogeniture and preference for males over females) অনুযায়ী রাজবংশে উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়। রাজার মৃত্যু হইলে, অথবা তিনি রাজ্যত্যাগ করিলে বা রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্র অথবা-তাঁহার অবর্তমানে জীবিত জ্যেষ্ঠকন্যা রাজমুকুট লাভ করিবেন। এই জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্তান না থাকিলে, ইঁহার অবর্তমানে পূর্ববর্তী মৃত রাজার দ্বিতীয় পুত্র, অথবা তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার জীবিত পুত্র বা কন্যায় রাজমুকুট বর্তাইবে। এই হিসাবেই সিংহাসনের অধিকার নির্ধারিত হইবে। বংশ সম্পূর্ণ লোপ পাইলে, পার্লামেণ্ট, স্বভাবতঃই কমনওয়েলথের সম্মতি সহকারে, নূতন বংশের প্রতিষ্ঠা করিবে।

রাজার ব্যক্তিগত সুবিধা, সম্পত্তি, বৃত্তি, প্রভৃতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিগতভাবে রাজার বিরুদ্ধে মামলা চলে না। তাঁহার নিজস্ব ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য প্রকার সম্পত্তি থাকিতে পারে এবং তাহা ভোগদখলের সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার রহিয়াছে। তাঁহার নিজস্ব প্রয়োজনের নিমিত্ত এবং রাজসংসারের ব্যয়ভার বহনের জন্য তিনি সরকারী তহবিল হইতে বৃত্তি পাইবার অধিকারী। প্রত্যেক নূতন রাজার সিংহাসনাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেণ্ট আইন করিয়া জাতীয় কোষাগার হইতে বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেয়। বর্তমানে এই বৃত্তির পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ড। রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঠিক পরিমাণ করা দুষ্কর, কারণ তিনি সে তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য নহেন। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতেও যে তিনি অন্যতম ধনীশ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

রাজার স্বকীয় ভূমিকা :—দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের নীতি গ্রহণ করিলে আর রাজার ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা দায়িত্বের প্রশ্ন উঠে না। রাজনীতির পাশার দান উল্টাইয়া পড়িয়াছে : এককালে রাজা মন্ত্রিদের নিয়োগ করিতেন তাঁহার উপদেষ্টা হিসাবে ; বর্তমানে রাজ্যশাসন করেন মন্ত্রিগণ, রাজাই উপদেশ দিয়া থাকেন।

বেজহটের মন্তব্য

স্যার ওয়াল্টার বেজহট বলিয়াছেন যে বাস্তব রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাকে উপদেশ দেওয়া, উৎসাহ দান করা এবং সাবধান করিয়া দেওয়ার অধিকার রাজার রহিয়াছে (the right to be consulted, the right to encourage, the right to warn")। প্রশ্ন হইল, কার্যকরী উপদেশদানের সুযোগ সম্ভাবনা তাঁহার কতটুকু।

প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে মন্ত্রিসভার কার্যক্রমের সহিত রাজার ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক বজায় থাকে। ক্যাবিনেট অফিস বা বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক যে কোন দলিলই ক্যাবিনেটের মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহা রাজার নিকটও উপস্থিত করা হয়। ক্যাবিনেটের আলোচ্য সূচী তাঁহাকে আগে হইতেই জানাইয়া রাখা হয়। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণের সহিত স্মারকলিপি লইয়া তিনি আলোচনা করিতে পারেন। দলিলাদি পড়িয়া সন্তুষ্ট না হইলে তিনি আরও তথ্য জানিতে চাহিতে পারেন। প্রয়োজনবোধে তাঁহার একান্ত সচিবকে অন্য তথ্য সংগ্রহ করিতে বলিতে পারেন। বৈদেশিক দপ্তরের সকল জরুরী টেলিগ্রাম, পত্রাদির নকল (copy) তিনি পাইয়া থাকেন, এবং কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে অথবা মনঃপূত না হইলে তিনি প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মতই তিনি দেশরক্ষা কমিটির (Defence Committee) সকল 'রিপোর্ট' বা বিবরণী পাইয়া থাকেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ সকল ক্যাবিনেট সাব-কমিটির রিপোর্ট পান, রাজাও অনুরূপ পাইয়া থাকেন। কমনওয়েলথের সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত তথ্য-মন্তব্যের সারাংশ কমনওয়েলথ অফিস হইতে তাঁহার নিকট পাঠানো হইয়া থাকে। বিভিন্ন ডোমিনিয়নের রাষ্ট্রপাল (Governor-Generals), উপনিবেশের রাজ্যপাল (Governors) এবং বিদেশে প্রেরিত রাষ্ট্রদূতগণের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে এবং পত্রের আদান-প্রদান চলে।

তথ্য আহরণ

এককথায় তথ্য ও সংবাদে রাজা যে কোন ক্যাবিনেট সদস্য অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধ। বিশেষ করিয়া কমনওয়েলথ বা পররাষ্ট্র বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষাও অধিক সংবাদ রাখিতে পারেন। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিজ নিজ দপ্তর দেখিতে হয়, দলীয় সমর্থন ও সমস্যার কথা ভাবিতে হয়, জনমতের হামলা সামলাইতে হয়। রাজা ঐসকল দায় হইতে মুক্ত। আবার মন্ত্রিসভা পাল্টায়, সেই তুলনায় রাজার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজত্বেও তো এপর্যন্ত তিনজন প্রধানমন্ত্রী আসিলেন।

একথা ঠিকই যে রাজা মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত থাকেন না। প্রথম জর্জের সময় হইতে এ রীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বোধ হয় রাজাকে প্রায় অন্যতম ক্যাবিনেট-সদস্য এবং একমাত্র

নির্দলীয় সদস্য বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। * অন্যান্য মন্ত্রীকে হয়ত থামাইয়া দেওয়া সম্ভব, হয়ত বা পদত্যাগ করিতেও বাধ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু রাজাকে চুপ করানো যাইবে না। তিনি প্রধান মন্ত্রী সমেত যে কোন মন্ত্রীকে ধরিয়া তাঁহার মতামত শুনিতে ও বিচার করিতে বাধ্য করিতে পারেন। প্রয়োজনবোধে তিনি দাবি করিতে পারেন যে তাঁহার মতামত ক্যাবিনেট সভায় বিচার করা হউক। স্বভাবতঃই তাঁহার ক্ষমতা তিনি কতটা ব্যবহার করিবেন তাহা নির্ভর করিবে তিনি ক্যাবিনেটের বিচার্য বিষয় সমূহ লইয়া কতটা পড়াশুনা করিতে, ভাবিতে, বুঝিতে, এককথায় পরিশ্রম করিতে রাজি আছেন এবং স্বকীয় মতামত সৃষ্টি করার ক্ষমতাই বা তাঁহার কতটা রহিয়াছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে কতখানি "বাগাইতে পারেন" ('managed') তাহার উপরও অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। † মহারাণী ভিক্টোরিয়া অভিযোগ করিতেন যে গ্ল্যাডষ্টোন তাঁহার সহিত কথা বলেন যেন জনসভায় বক্তৃতা করিতেছেন; আর ইহাও সুবিদিত যে ডিজরেলি (Disraeli) সুমিষ্ট চাটুকারিতার সাহায্যে বহু কার্য উদ্ধার করিতেন।

জেনিংস বলিতেছেন: রাজদরবারে দলিলাদি যতই হাজির করা হউক, তাঁহার "মর্জিতেই' কাজ যতই চলুক না কেন, রাজমুকুটের প্রভাব নির্ভর করে মুকুটধারীর উপর। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার দীর্ঘ শাসনকালে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বকীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৪১ সালের পরে প্রতিটি উদারনৈতিক দলীয় সরকারের কার্যক্রমে তিনি ছিলেন প্রতিবন্ধক এবং ১৮৬৮ সালের পরে প্রতিটি রক্ষণশীল দলীয় সরকারের প্রেরণাদাত্রী। ‡ সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রভাব ছিল অপেক্ষাকৃত কম। তবে তাঁহার

* "Thus the Queen may be said to be almost a member of the cabinet, and the only non-party member". Sir Ivor Jennings. Cabinet Government. p. 353

† "Naturally the extent to which she uses these powers depends upon the extent to which she is prepared to study Cabinet questions and the extent to which she forms opinions of her own. It depends, too, on the manner in which she is 'managed' by the Prime Minister." *Ibid.* p. 354.

"The influence that the Sovereign will bring to bear will depend in the first instance, on his capacity for hard work, his powers of perception, and his personality." *Ibid.* p. 376.

‡ "Though papers be submitted and 'pleasure' be taken, the

হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্তও রহিয়াছে।* আইরিশ সমস্যা সম্পর্কে পঞ্চম জর্জ যথেষ্ট জড়িত ছিলেন; প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁহার হস্তক্ষেপের কিছু প্রমাণ রহিয়াছে।† পরবর্তী সিংহাসনাধিপতিগণের সম্পর্কে, গোপনীয়তা বজায় রাখিবার অত্যন্ত সচেতন সরকারী প্রয়াস উত্তীর্ণ হইয়া, বিশেষ কোন তথ্য আজিও জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

অবশ্য রাজকীয় হস্তক্ষেপের সম্বন্ধে শেষ কথা হইল এই যে মন্ত্রিসভা যদি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিবার হুমকিতে রাজা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য।

রাষ্ট্রীয় কার্যে বিরতি নাই, কিন্তু মন্ত্রিসভার জীবনের শেষ আছে। কমন্স-সভার আস্থা হারাইলে অথবা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে কমন্সসভার সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বিনষ্ট হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে, ধরিয়া লওয়া হইবে যে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব সাময়িকভাবে রাজার উপর পড়িয়াছে। কিন্তু রাজা ব্যক্তিগতভাবে শাসনকার্য চালাইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাকে নূতন সরকার গঠন করিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করিতে হইবে; বাছাই করিতে হইবে এমন একজন ব্যক্তিকে যিনি কমন্সসভার সমর্থনের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সক্ষম।

রাজার প্রধান কর্তব্য

সাধারণভাবে নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিবে, রাজা সেই দলের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠনের নিমিত্ত আহ্বান করিবেন। সাধারণ নির্বাচনে যদি কোন দলের সংখ্যাধিক্য সুস্পষ্ট হয়, এবং সে দলের যদি পূর্ব হইতেই নির্বাচনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নেতা থাকেন, তাহা হইলে রাজার

influence of the Crown depends upon the wearer. The impress of Queen Victoria's personality is evident on every page of the political history of England during her long reign. She was a clog on the activity of every liberal Government after 1841 and a stimulus to every conservative Goverment after 1868." *Ibid*, p. 372.

"King Edward's influence was much smaller. He rarely criticised or made suggestions, though a few cases are known." *Ibid*. p. 371.

†"George V's opportunities related mainly to Ireland. From his accession in 1910 he was caught up in the heated...party conflict over Home Rule;...His interest and activity in the conduct of the War of 1914-18 have already been mentioned. *Ibid*. p. 373.

কার্য যন্ত্রবৎ; ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার সুযোগ নাই। শ্রমিক দলের ক্ষেত্রে শ্রমিকদলভুক্ত পার্লামেণ্টের সদস্যগণ (Parliamentary Labour Party) নিজেরাই নেতা নির্বাচন করেন; ফলে রাজার দায়িত্ব থাকেনা। কিন্তু রক্ষণশীল দল সবসময়ে ঐভাবে চলে না। ১৯২৩ সালে মিঃ বল্‌ডুইন, ১৯৩৭ সালে মিঃ নেভিল্ চেম্বারলেইন ও ১৯৫৬ সালে মিঃ ম্যাকমিলানকে রাজার তরফ হইতে প্রধানমন্ত্রিপদে বহাল করার পরেই রক্ষণশীল দল ইঁহাদের দলপতি হিসাবে নির্বাচন করে। আরও কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের প্রশ্ন উঠে যেমন, হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু ঘটিলে, বা ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করিলে, মন্ত্রিসভার সমর্থক দলে ভাঙ্গন ধরার ফলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটিলে (অবশ্য যদি প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্ট বাতিল করিয়া রাজাকে নূতন সাধারণ নির্বাচনের উপদেশ দেন, তবে স্বতন্ত্র অবস্থার উদ্ভব হইবে), বা সাধারণ নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারিলে।

সুতরাং সর্বক্ষেত্রে রাজার কার্য যে যান্ত্রিক নহে, তাহা বুঝা দুরূহ নয়। রাজার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের যে যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে তাহার দুইটি উদাহরণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। ১৯২৩ সালে মিঃ বোনার ল (Mr. Bonar Law) পদত্যাগ করার ফলে, রক্ষণশীল দলের কোন সুনির্দিষ্ট নেতা থাকে না। কমন্সসভায় রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব করিতেন মিঃ বল্‌ডুইন, লর্ডসভায় ছিলেন লর্ড কার্জন। বল্‌ডুইন ছিলেন অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ও অনভিজ্ঞ। কার্জনের দাবি তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল,—বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তিনিই ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করিতেন। ইহা সত্ত্বেও রাজা পঞ্চম জর্জ কার্জনকে না ডাকিয়া বলডুইনকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদের জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে শ্রমিক দলই তখন প্রধান বিরোধী দল, এবং তাদের সদস্যরা প্রায় সকলেই কমন্সসভার সদস্য; সুতরাং বিরোধীদলের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রধানমন্ত্রীরও কমন্সসভার সদস্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় ১৯৫৬ সালে। স্যার অ্যাণ্টনী ইডেন (Sir Anthony Eden) যখন প্রধানমন্ত্রিত্বের পদে ইস্তফা দিলেন, তখন কমন্সসভায় রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব করিতেন মিঃ বাট্‌লার। কিন্তু রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ মিঃ বাট্‌লারকে না ডাকিয়া মিঃ ম্যাক্‌মিলানকেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। মিঃ ম্যাক্‌মিলান অবশ্য পরে রক্ষণশীল দলের নেতার পদে নির্বাচিত হন এবং পরবর্তী অবস্থায় যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহা

লক্ষণীয় যে তখন পর্যন্ত দলীয় নেতা বা জাতীয় নেতা হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন না এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার অভিজ্ঞতাও অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

১৯৩১ সালে মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌কে প্রধানমন্ত্রী করিয়া যে 'জাতীয় সরকার' (National Government) গঠিত হয়, তাহার পিছনে পঞ্চম জর্জের যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সে সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি হওয়া সত্ত্বেও, আসল ঘটনা সম্পর্কেও যেমন সুস্পষ্টতার অভাব রহিয়াছে, তেমনি রাজকার্যের সমর্থন (যথা, স্যার আর্থার বেরিয়াডেল কীথ্‌ কর্তৃক) ও সমালোচনারও (যেমন, অধ্যাপক হ্যারল্ড্‌ ল্যাস্‌কি কর্তৃক) অন্ত নাই।

যাহা হউক, এ বিষয়ে মূল নীতি হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে রাজার কর্তব্য হইল সরকার গঠন করা, নিজের পছন্দ অনুসারে সরকার গঠনের চেষ্টা করা নহে। কারণ, সে প্রচেষ্টার অর্থ হইল দলীয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়া, অর্থাৎ, নিরপেক্ষতার নীতি বিসর্জন দেওয়া।* এবং যে মুহূর্তে তিনি দলীয় পক্ষপাতিত্বে জড়িত বলিয়া লোকসমক্ষে পরিচিত হইবেন তখন হইতেই তাহার রাজত্বও দলীয় সমালোচনা ও আক্রমণের বিষয়ীভূত হইবে। অর্থাৎ, রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা তখন সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর মতামতের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িবে। সেইজন্যই রাজা শুধু নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া চলিবেন তাহাই নয়, তাঁহার নিরপেক্ষতা সন্দেহাতীতরূপে লোকচক্ষে প্রতীয়মান হইতে হইবে।† মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিরপেক্ষতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিলেন; পরবর্তীদের সম্পর্কে সুনিশ্চিত মতামত দিবার মত নির্ভরযোগ্য যথেষ্ট তথ্যের অভাব রহিয়াছে।

আরও কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা

রাজার আরও কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করা গেল: (ক) লর্ডসভার জিদ ভাঙ্গিবার জন্য তৎকালীন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজনে যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য নিয়োগ করা; (খ) মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা; (গ) বিদায়ী

* "The Queen's task is only to secure a Government, not to try to form a Government which is likely to forward a policy of which she approves. To do so would be to engage in party politics."
Jennings—op. cit. p. 32.

† "It is, moreover, essential to the belief in monarch's impartiality not only that she should in fact act impartially, but that she should appear to act impartially." *Ibid*. p. 32.

প্রধান মন্ত্রীর উপদেশ ব্যতিরেকে পার্লামেণ্ট বাতিল করা; (ঘ) প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ সত্ত্বেও পার্লামেণ্ট বাতিল করিতে অস্বীকার করা।

প্রথম প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব অবলম্বন করিয়াছিল ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন পাস করিবার সময়ে। সে আইনে লর্ডসভার ক্ষমতা গুরুতররূপে সঙ্কুচিত করা হইতেছিল; স্বভাবতঃই লর্ডসভা তাহাতে সম্মতি দেয় না। ফলে, রাজা পঞ্চম জর্জ বলেন যে বর্তমান লর্ডদের মতকে ভোটে বাতিল করিবার মত যথেষ্ট সংখ্যক লর্ড তিনি নিয়োগ করিবেন। অবশ্য এ পর্যায়ে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই; এইরূপ মনোভাব প্রদর্শনের ফলে লর্ডসভা বিলে সম্মতি দেয়।

স্যার আইভর জেনিংস তৎকালীন ব্রিটিশ রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে লর্ডসভা দীর্ঘকালীন প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করার পর দুইটি সাধারণ নির্বাচনের ভিতর দিয়া উদারনৈতিক পার্টি প্রমাণ করে যে জনমত লর্ডসভার ক্ষমতা-সঙ্কোচনের পক্ষে। বস্তুতঃ প্রথম নির্বাচনের পরই যখন উদারনৈতিক মন্ত্রিসভা লর্ডসভার ক্ষমতাহ্রাসের বিল লইয়া আসে, তখন লর্ডসভা তাহাকে বাতিল করাতে মন্ত্রিসভা রাজার নিকট লর্ডসভার সদস্যসংখ্যা বাড়াইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা পরিবর্তনের দাবি জানান। রাজা বলেন যে সেরূপ কিছু করিতে গেলে পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনমতের অভিব্যক্তির প্রয়োজন রহিয়াছে। ফলে, মন্ত্রিসভা পুনরায় পদত্যাগ করে, কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়; নির্বাচনে উদারনৈতিক দল অধিকতর সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হয়। এরূপ ক্ষেত্রে লর্ডসভার বিরোধিতা জাতীয় শাসনে গণতন্ত্রের ভিত্তি সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলিয়াছিল। রাজা সে অবস্থাতেও লর্ডসভার গায়ে আঁচড় কাটিতে রাজি না হইলে, সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়া যাইত যে নির্বাচক-মণ্ডলীর সুস্পষ্ট অভিমতের বিরুদ্ধে লর্ডসভার সমর্থনে রাজাও রহিয়াছেন। ইহারই ফলে আসে রাজার সাবধানবাণী ও লর্ডসভার মতের পরিবর্তন। রাজা ব্যক্তিগতভাবে অধিকসংখ্যক লর্ড নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, শেষ পর্যন্ত তাহার প্রয়োজনও হয় নাই।

শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতে রাজা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে অধিকসংখ্যক লর্ড নিয়োগ করিতে বাধ্য নহেন। অবশ্য ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার পরে এই প্রশ্নের গুরুত্বও বহু পরিমাণে লঘু হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে পরবর্তী প্রশ্নে আসা যাক: রাজার মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার অধিকার আছে কি না। অবশ্য পার্লামেণ্ট প্রণীত 'বিলে' (Bill) সম্মতি জানাইতে অস্বীকার করার ফলও একই হইবে; কারণ সে ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবেন। রাণী এ্যান্-এর (Queen Anne) রাজত্বকালের পর হইতে আজ পর্যন্ত এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার পর অবশ্য গোঁড়া দক্ষিণপন্থীরা ও অনুরূপ মতাবলম্বী শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞগণ দাবি করিয়া আসিতেছিলেন যে কমন্সভার চরমপন্থী (গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক?) সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি যেহেতু লর্ডসভার আর নাই, তখন সে দায়িত্ব রাজাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু রাজা 'বিল' ফেরত দিলেই স্বভাবতঃই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবেন ও নূতন নির্বাচন হইবে। প্রত্যাখ্যাত বিলে কি ছিল তাহা এ নির্বাচনে আলোচনার কেন্দ্রবস্তু হইবে না, আলোচ্য বিষয় হইবে, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যে রাজা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না; দেশ শাসন কে করিবে,—রাজা, না, জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত কমন্সসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী? কিন্তু সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের নিরাপত্তার দিক হইতেই রাজার ভূমিকাকে গণভোটের বিষয়বস্তু হইতে দেওয়া উচিত নহে।

মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার অধিকার (?)

প্রাচীন দুই বিশেষজ্ঞ এ্যানসন ও ডাইসি মত দিয়াছিলেন যে রাজার এ বিশেষ অধিকার আছে। জেনিংস বলেন যে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন দলীয় মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া রাজার এই ক্ষমতা ব্যবহারের পক্ষে ওকালতি করিয়াছিলেন।

১৭৮৩ সালের পর, ১৮৩৪ সালের একটিমাত্র ব্যতিক্রম ব্যতীত, মন্ত্রিসভাকে বাতিল করার আর নজির নাই। তাও রাজা চতুর্থ উইলিয়াম তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের ইঙ্গিতকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া যায় ও নূতন নির্বাচনের ফলে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণ (Lord Melbourne) ক্ষমতায় ফিরিয়া আসেন। যাহাই হউক, ইহাকে ঠিক বরখাস্তের উদাহরণ বলিয়া ধরা যায় না।

আইরিশ হোমরুল বিলের সময়েই প্রশ্নটি আলোচিত হইয়া থাকে। জেনিংস বলিতেছেন যে রাজা 'বিল' প্রত্যাখ্যান করিয়াই হউক আর সোজাসুজি বরখাস্ত করিয়াই হউক, মন্ত্রিসভাকে বিদায় দিতে পারেন, কিন্তু এ কাজ করার

অর্থ হইল সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের প্রশ্নের পুনর্বিচার। রাজা রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নে আর নিরপেক্ষ থাকিতেছেন না, তিনি কোন একটি দলের সমর্থনে মঞ্চে অবতীর্ণ হইতেছেন। কারণ রাজা মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগে বাধ্য করিলে ধরিয়া লইতে হইবে যে তিনি জানেন যে মন্ত্রিসভা ও কমন্সসভা জনসমর্থন হারাইয়াছে। কিন্তু রাজা যে পরিবেশে থাকেন তাহা তো 'Ivory Tower' বা গজদন্তের মিনারবাসীর জীবন ছাড়া কিছুই নহে। তাঁহার নিজস্ব সংবাদের সূত্র হইতে যে মতামত আসিয়া পৌঁছাইবে তাহাকে জনসাধারণের অভিমত বলিয়া ধরার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।* উপরন্তু নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত ডাকিয়া আনিবার অধিকার রাজার কতখানি আছে? কারণ, প্রত্যেকটি সরকারই নিজস্ব কার্যকালের মধ্যে কিছু কিছু কাজ করিয়া থাকেন যাহা জনসাধারণের নিকট অপ্রিয়। পূর্ণ কার্যকাল উত্তীর্ণ হইলে পর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দিবার সময় মন্ত্রিমণ্ডলীর সামগ্রিক কার্যক্রমের বিচার করিয়া ভোট দেয়। কিন্তু রাজা যদি আপন ইচ্ছামত মন্ত্রিসভাকে নির্বাচকমণ্ডলীর বিচারের সম্মুখে দাঁড়াইতে বাধ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক মতামতই সেখানে গুরুত্ব পাইবে, নিরপেক্ষতার ভূমিকা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আবার যদি বিরোধীদলের চীৎকারের তীব্রতা দেখিয়া তিনি প্রভাবিত হন, তাহা হইলে বিরোধীদলকে উৎকট বিরোধিতায় প্ররোচিত করা হইবে মাত্র।†

রাজার অপর দুইটি ক্ষমতা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন পূর্বেই তুলিয়া রাখা হইয়াছিল, অর্থাৎ,—কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যাপারে রাজা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ শুনিতে বাধ্য কিনা এবং প্রধানমন্ত্রীর কোনরূপ পরামর্শ ব্যতিরেকে নিতান্ত স্বকীয় সিদ্ধান্তে কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন কিনা,—তাহার জবাবেও

* "He can judge only from newspapers, from by-elections and from his own entourage. Of the first it is enough to say that even the unanimous opposition of London newspapers would be no criterion. Of the second it can be said that by—elections........are apt to prove deceptive especially to one far removed from them. Of the third it must be asserted that it is always more biased and less well-informed than the king himself." Jennings, Cabinet Government. p. 410.

† If the king selects decisions which seem to him to be important, his selection must depend upon his subjective notions, which it is his duty, as an impartial Sovereign, to ignore. If he selects because of the vehemence of the opposition, he invites all opposition to be vehement." *Ibid*. pp. 410-411.

দেখানো হইয়াছে যে নিতান্ত তত্ত্বগতভাবে বিচার করিলে রাজার সে ক্ষমতা আছে; কিন্তু তাহা বাস্তবে প্রয়োগ করা সমস্যাসঙ্কুল।

বিভিন্ন লেখক রাজার বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কিত এই সমস্যার সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ব্রিটিশ গণতন্ত্র নিজস্ব গতিধারায় অভিজাততন্ত্রের প্রতীক লর্ডসভার ক্ষমতা যথেষ্ট সঙ্কুচিত করিয়াছে, সাধারণভাবে রাজাকে নিরপেক্ষ ও আনুষ্ঠানিক কর্ণধারে পরিণত করিয়াছে। টানাপোড়েন, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গোপন ঘুর্ণিজালের অদৃশ্য আকর্ষণ সত্ত্বেও, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত সফল কার্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু যদি অর্থনৈতিক সংকট প্রবল আকার ধারণ করে, যদি শ্রমিক-ধনিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র ও তিক্ত রূপে দেখা দেয়, তবে তখনও কি রাজার নিরপেক্ষতা বজায় থাকিবে? না, রাজা বহুদিনের অব্যবহৃত বিশেষ অধিকারগুলি কার্যে ব্যবহার করিবেন? সকলেই স্বীকার করেন যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ হইতে দূরে থাকার উপরেই রাজার জনমনের অধিনায়কতা নির্ভর করিতেছে। রাজা রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন প্রমাণিত হইয়া গেলে, রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সুখের মিলন বিপদাপন্ন হইয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই।*

ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা লইয়া এখন দুর্ভাবনা বাড়াইয়া লাভ নাই।

রাজতন্ত্র কেন টিঁকিয়া আছে?

রাজতন্ত্র ব্রিটেনে বর্তমানে বেশ বহাল তবিয়তে টিঁকিয়া আছে। রাজতন্ত্রের মূল শক্তি সম্বন্ধে বহু যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছে। স্যার আইভর জেনিংস তাঁহার The Queen's Government নামক পুস্তকে চারিটি যুক্তি দেখাইয়াছেন: (১) রাণী শাসনতন্ত্রকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; (২) তাঁহাকে ঘিরিয়া কমনওয়েলথের ঐক্য বজায় রহিয়াছে; (৩) তিনি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন; (৪) সামাজিক জীবনে তাঁহার গুরুত্ব সমধিক।†

* "....the price of the king's popularity and position in Great Britain is his abstention from politics." Carter, Herz, Ranney-Major Foreign Powers.

† "First, appearing in an impersonal fashion as 'the Crown,' the Queen's name is the cement that binds the Constitution. Secondly, the Queen's name similarly binds the units of the Commonwealth. Thirdly, there are political functions of the highest importance which the Queen performs pursonally. Fourthly, the Queen is a social figure exercising important functions outside the political sphere.." Sir Ivor Jennings. The Queen's Government. p. 80

ইতিহাসগতভাবে যুক্তরাজ্যের (United Kingdom) ঐক্য প্রতিষ্ঠায় রাজতন্ত্র বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। জনসাধারণের নিকট দলীয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও মর্যাদার প্রতিভূ রূপে রাজা আবির্ভূত হইয়াছেন; রাজার প্রতি আনুগত্য আজ দেশপ্রেমের সমার্থক। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা অপেক্ষা প্রতিমা পূজায় যেরূপ অনেকের আনন্দ, রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিক বিমূর্ত কল্পনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অপেক্ষা রাজা বা রাণীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন অনেকের নিকট সেইরূপই সহজ।

শুধু তাহাই নহে, বৈচিত্র্যহীন, ক্লান্তিকর, বিবর্ণ দৈনন্দিন জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সাধারণ মানুষ বর্ণাঢ্যতা ও নাটকীয়তার অনুসন্ধান করে। সংবাদপত্রের দৈনন্দিন বিশদ ও নিখুঁত বর্ণনায় রাজপরিবারের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভ্রমণ ও বিলাসিতা, খেয়াল ও পছন্দ, প্রেম ও বিবাহ সব কিছুই সাধারণ মানুষের মনে রূপকথার আস্বাদ বহন করিয়া আনে; হয়ত বা মার্কিনদেশে 'ফিল্ম-ষ্টার' সম্পর্কে দর্শকদের একাংশের যে আকুলতা তাহারও মনস্তাত্ত্বিক মূলসূত্র একই। হয়ত বা বিচার-বিমুখ সকলমানুষের অন্তরের গভীরে লুক্কায়িত শিশু-মনকেই তুষ্ট করা হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার মূল্য অনস্বীকার্য।

মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার মাত্রেই একজন নামসর্বস্ব শাসকের প্রয়োজন হয়, বিশেষ করিয়া, নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে বাছাই করিয়া দায়িত্ব অর্পণের জন্য। ব্রিটেনের ইতিহাস এই দায়িত্বে রাজাকে বসাইয়াছে। যতক্ষণ রাজার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে লোকে নিশ্চিন্ত, ততক্ষণ রাজতন্ত্র বাতিল করিয়া রাষ্ট্রপতি খুঁজিয়া বাহির করিবার কোন কারণই নাই।

রাজতন্ত্র বাতিল করিতে গেলে সর্বাধিক জটিলতা সৃষ্টি হইবে কমনওয়েলথ দেশগুলি সম্পর্কে। আইনের দিক হইতে কমনওয়েলথ দেশগুলির সহিত ব্রিটেনের বন্ধন আজ শুধুই রাজাকে কেন্দ্র করিয়া। সেই দিক হইতে রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা কমনওয়েলথ সম্পর্কে মূল ধরিয়া নাড়া দিবে।

তাহা ছাড়া সহস্র সামাজিক সৎকাজে রাজার নাম জড়াইয়া সেগুলির গুরুত্ব বর্ধন করা হইতেছে। হাসপাতাল বা 'আর্ট গ্যালারির' উদ্বোধনের কথা বাদ দিলেও, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমাবিধ্বস্ত লণ্ডনে রাজা ষষ্ঠ জর্জের উপস্থিতি সাধারণ নাগরিকের মনে যে দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধের আবেগ জাগাইত তাহাও অনস্বীকার্য।

একথা ঠিকই যে পারিষদ পরিবৃত রাজা সমাজে শ্রেণী ও স্তরবিভাগের কথা সর্বদাই মনে করাইয়া দেন। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে এ ব্যবস্থা ঠিক খাপ খায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও. রাজা সকলের সহিত সমপর্যায়ে নামিয়া আসিলে, দূরত্বজনিত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। উপরন্তু গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কর্মপ্রয়াসের প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক তিনি নন। আর নতুন যুগের হাওয়া বোধহয় পালে কিছুটা লাগিয়াছে ; সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব ওয়েলস্ (Prince of Wales) রাজকুমার চার্লসও গৃহশিক্ষকের নিকট পাঠাভ্যাস না করিয়া 'স্কুলে' ভর্তি হইয়াছেন।

সুতরাং, এককথায় বলা যায়, রাজা যতদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে না নামিতেছেন, ততদিন বাস্তব কার্যকারিতার সহিত, ইতিহাস, অভ্যাস ও রোম্যান্স মিলিয়া ব্রিটেনের রাজসিংহাসনকে সুদৃঢ় রাখিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রিভি কাউন্সিল, ক্যাবিনেট ও প্রধানমন্ত্রী

বর্তমানে রাজার ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার ব্যবহার হয় প্রধানতঃ চারিটি সংস্থার মারফৎ। সেগুলি হইল : (১) মন্ত্রিগণ, এবং শাসন-বিভাগে ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁহাদের অধস্তন কর্মচারীবৃন্দ ; (২) প্রিভি কাউন্সিল ; (৩) ক্যাবিনেট ; এবং (৪) স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ।

ইতিহাস

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মূলকেন্দ্র হইল ক্যাবিনেট, এবং এই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হইয়াছে প্রিভি কাউন্সিল হইতে ; সুতরাং প্রিভি-কাউন্সিল হইতে সমগ্র আলোচনার সূত্রপাত করা সঠিক হইবে।

রাজকার্যে সহায়তা করিবার জন্য রাজার পারিষদবর্গকে লইয়া গঠিত রাজার ক্ষুদ্র পরিষদ বা কিউরিয়া রেজিসের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পরিষদ ক্রমে স্থায়ী পরিষদ (Permanent Council) ও পরে প্রিভি কাউন্সিলে (Privy Council) পরিণত হয়। নর্মান রাজাদের সময় হইতে

ইহার শুরু। টিউডর বংশের রাজত্বকালে প্রিভি কাউন্সিল প্রায় সর্বশক্তিমান এক শাসনযন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। সদস্যদের ভূমিকা ছিল উপদেষ্টার, কিন্তু ইহার কার্যপরিধিও ছিল ব্যাপক। বিভিন্ন কমিটি ও বোর্ডের মারফৎ এবং অর্ডার্স-ইন-কাউন্সিল, তথা রাজকীয় নির্দেশ দ্বারা, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, বিচার কার্য সম্পাদন, অর্থব্যবস্থা পরিচালনা, প্রভৃতি সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় কার্যভার প্রিভি কাউন্সিল গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে সদস্য সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে বৃহৎ সংগঠন হিসাবে ইহার কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে স্টুয়ার্ট রাজারা কাউন্সিলের ভিতর হইতে কতিপয় আস্থাভাজন সদস্য বাছিয়া লইয়া রাজকার্য সম্বন্ধে কেবল তাহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ করিতে শুরু করেন। দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে রাজার এই উপদেষ্টা-মণ্ডলী 'ক্যাবাল' (Cabal) নামে অভিহিত হয়। রাজার সহিত ইঁহারা তাঁহার ক্যাবিনেট-কক্ষে গোপন সভায় মিলিত হইতেন। কথিত আছে যে পাঁচজন সদস্যের নামের আদ্যাক্ষর লইয়া Cabal কথাটি রচিত হইয়াছে; ইঁহাদের নাম যথাক্রমে Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington and Lauderdale। বস্তুতঃ 'ক্যাবিনেট' কথাটি আরও পুরাতন। বেকনের (Bacon) 'প্রবন্ধাবলীতে' ('Essays') ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। ১৬৪০ সালের ঘটনাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করিতে গিয়া ক্ল্যারেনডন (Clarendon) 'ক্যাবিনেট কাউন্সিলের' উল্লেখ করিয়াছেন।

পার্লামেণ্ট কিন্তু এই গোপন সংস্থার উদ্ভব সু-নজরে দেখিতে পারে নাই। কারণ, পার্লামেণ্ট রাজার উপদেষ্টাদের নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়; অথচ রাজা যদি তাঁহাদের নাম ঘোষণা না করেন এবং তাঁহাদের সহিত গোপনে পরামর্শ করেন, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা দুষ্কর হইয়া পড়ে। কমন্সসভার মতে এ ব্যবস্থা স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ক্ষুব্ধ পার্লামেণ্ট ইহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিচারের (Impeachment) ব্যবস্থা করে। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন কাউন্সিলার 'ড্যান্‌বির' (Thomas Osborne, Earl of Danby) বিশেষ বিচার হয়। ড্যানবি বলেন যে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা রাজার হুকুমেই করিয়াছেন এবং 'রাজা অন্যায় করিতে পারেন না'। কথা সত্যই; কিন্তু ড্যানবি নিস্তার পান নাই। বিচারে 'টাওয়ার অব লণ্ডনে' কারারুদ্ধ থাকিবার হুকুম হয়। রাজা এ হুকুম রদ করিতে ভরসা পান নাই। অপরদিকে এ বিচারের ফলে একটা মূলনীতি নির্ধারিত হইয়া গেল: "কোন মন্ত্রী আর রাজার আজ্ঞা মানিবার অজুহাতে

নিজেকে বাঁচাইতে পারিবে না……সামগ্রিক রাজকার্যের বিধিসিদ্ধতার জন্য তো বটেই, উপরন্তু সেগুলির ন্যায্যতা, সততা ও উপযোগিতার জন্য মন্ত্রীই দায়ী থাকিবে।"*

কিন্তু এই বিশেষ বিচার পদ্ধতিতে কার্যসিদ্ধ করা দুরূহ। কমন্সসভা চাহিয়াছিল কমন্সসভার আস্থাভাজন ব্যক্তিদেরই রাজা তাহার উপদেষ্টা নিযুক্ত করিবেন (the King "to employ such counsellors…as the parliament may have cause to confide in.)। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট রাজারা কেহই এ মত গ্রহণ করেন নাই। এমন কি 'লর্ড প্রোটেক্টর' (Lord Protector) রূপে অলিভার ক্রমওয়েলও এ নীতি স্বীকার করেন নাই। ইহার স্বীকৃতি আসিল গৌরবময় বিপ্লবের পর।

কিন্তু ইহা তো ইতিহাসের কাহিনী। বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা প্রায় ৩৩০ জন। ক্যান্টারবেরী ও ইয়র্কের আর্কবিশপ, লণ্ডনের বিশপ, ৯ জন 'ল লর্ড' (lords of appeal in ordinary), বহু বিচারপতি, রাষ্ট্রদূত, কমন্সসভার স্পীকার (Speaker), কমনওয়েলথ হইতে কিছু বিশিষ্ট নাগরিক, এবং সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেসকল কৃতী ব্যক্তিদের এ সম্মানে ভূষিত করা রাজা প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রিভিকাউন্সিলের সদস্য। অবশ্য সংখ্যাবৃদ্ধি মূলত ঘটিয়াছে বর্তমান ও অতীত সকল ক্যাবিনেট সদস্যকেই প্রিভিকাউন্সিলের সদস্যপদে গ্রহণ করার ভিতর দিয়া।

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য

ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গড়িয়া উঠার ফলে প্রিভি কাউন্সিলের সভা প্রধানতঃ হইয়া দাঁড়াইয়াছে আনুষ্ঠানিক। রাজ্যাভিষেক বা অনুরূপ কোন আনুষ্ঠানিক উৎসব ছাড়া সকলকে একত্র ডাকা হয় না। তিনজন সদস্য উপস্থিত হইলেই সভার অধিবেশন হইতে পারে, সাধারণতঃ চার-পাঁচজন উপস্থিত থাকেন। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে পারেন, অনেক সময়ে থাকেন না। সভাপতি লর্ড প্রেসিডেণ্ট অভ দি কাউন্সিল উপস্থিত থাকেন, থাকেন কাউন্সিলের সচিব (clerk) এবং আরও তিন-চারজন ক্যাবিনেট সদস্য।

অধিবেশন

* "No minister can shelter himself behind the throne by pleading obedience to the orders of the Sovereign. He is… …answerable for the justice, the honesty, the utility of all measures emanating from the Crown as well as for their legality" J. A. R. Marriott—English Political Institutions. P. 79.

কাউন্সিলের সম্মুখে নবনিযুক্ত বিশপেরা রাজার নিকট অনুগত্য প্রকাশ করেন; মন্ত্রীরা সরকারী শপথ গ্রহণ করেন; শেরিফগণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কার্যাবলী

অবশ্য কাউন্সিল সমেত রাজাজ্ঞা ও শাসনসংক্রান্ত আজ্ঞা (Orders in Council and Executive Orders) ঘোষণা করা ইহার অন্যতম প্রধান কাজ। মেইটল্যাণ্ডের মতে পার্লামেণ্ট প্রিভি কাউন্সিলের উপর ছয় প্রকার দায়িত্বভার অর্পণ করে; যথা, (১) সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করা, (২) বিশেষ নির্দেশ দান করা, (৩) লাইসেন্স দেওয়া, (৪) অপরাধীর দণ্ড মকুব করা; (৫) পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া এবং (৬) অনুসন্ধানের আদেশ দেওয়া।* অবশ্য এ সকল কার্যের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব প্রিভি কাউন্সিলের; বাস্তবে বিভাগীয় দায়িত্বসম্পন্ন কর্মচারীদিগের উপরই প্রকৃত কর্তৃত্ব প্রদত্ত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ধরনের অর্ডার্স ইন কাউন্সিলও প্রিভি কাউন্সিলকে নিয়মিত প্রকাশ করিতে হয়: যথা, যুদ্ধ ঘোষণা, পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান, ও সমাপ্তি ঘোষণা, পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ঘোষণা, স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ সম্পর্কে হুকুমনামা জারি, প্রভৃতি। বৎসরে প্রায় ছয়শতাধিক অর্ডার্স ইন কাউন্সিল ঘোষিত হয়। আলোচনার স্থান কাউন্সিল নহে। নীতি-নির্ধারণ হয় অন্যত্র; কাউন্সিল ঘোষণা করে। অনেকগুলি কমিটিতে বিভক্ত হইয়া প্রিভি কাউন্সিলের কাজ চলে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কমিটি হইল বিচারবিভাগীয় কমিটিগুলি।

ক্যাবিনেট

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উপর প্রায় প্রতিটি লেখকই উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও আলঙ্কারিক ভাষায় ক্যাবিনেটের গুরুত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। বেজহট ইহাকে শাসনবিভাগ ও আইন-বিভাগের ভিতরকার হাইফেনচিহ্ন ও বন্ধনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন

ক্যাবিনেটের গুরুত্ব

("the hyphen that joins, the buckle that binds, the executive and legislative departments together."—Bagehot)। লাওয়েল বলিয়াছেন: "রাষ্ট্রনৈতিক খিলানের

* "Maitland enumerates six different kinds of powers delegated by parliament to the Privy Council: the power to lay down general rules, e g., as to the administration of work houses; to issue particular commands. e. g., to a recalcitrant local authority; to grant licenses; to remit penalties; to order inquisitions e. g. as to a railway accident." Marriott. *Ibid*. P. 125.

মধ্যপ্রস্তর" ("the keystone of the political arch."—Lowell)। ম্যারিয়ট বলেন "এই কীলকটি ঘিরিয়াই সমগ্র রাষ্ট্রনৈতিক যন্ত্র ঘুরিতেছে" ("the pivot round which the whole political machinery revolves." —Marriott) র‍্যামসে ম্যুরের ভাষায়, "রাষ্ট্রনামক অর্ণবপোতের চালনীচক্র" ("the steering wheel of the ship of state"—Ramsay Muir)। অর্থাৎ, বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন উপমার সাহায্যে একটি সত্যই ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন যে, ক্যাবিনেট হইল ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় পরিচালনী যন্ত্র।

কিন্তু এত গুরুত্ব সত্ত্বেও আইনে ইহার দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন উল্লেখই ছিল না। মাত্র সেদিন, ১৯৩৭ সালে রাজমন্ত্রী আইনে (Ministers of Crown Act of 1937) খোলাখুলি ক্যাবিনেটের উল্লেখ করা হইল এবং ক্যাবিনেটে সদস্যদের মাহিনার তালিকা নির্দেশিত হইল। কিন্তু তাহাও ক্যাবিনেটের দায়িত্ব বা কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ প্রথা ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করিয়া এত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। অতীতে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যদের ভিতর হইতে রাজার কতিপয় বিশ্বস্ত সদস্যদের লইয়া গোপনে কিরূপে ক্যাবিনেট গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। ক্যাবিনেটের উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংঘর্ষও বর্ণিত হইয়াছে।

আইনের কুণ্ঠিত স্বীকৃতি

ক্যাবিনেটের বিবর্তন

গৌরবময় বিপ্লবের পরে ১৬৯৭ সালের সাণ্ডারল্যাণ্ডের গোপনচক্র (Sunderland's Junto) বলিয়া পরিচিত ক্যাবিনেটই পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত প্রথম মন্ত্রিসভা। কিন্তু তখনও (১) একজন নেতার প্রাধান্য মন্ত্রিসভা স্বীকার করে নাই এবং (২) রাজা স্বয়ং তখনও মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করিতেন। রানী এ্যান্ ব্যক্তিগত পছন্দের প্রশ্ন সরাইয়া রাখিয়া পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন মন্ত্রিসভা গঠন করিতেন। তাঁহার পর আসিলেন প্রথম জর্জ; তিনি না বুঝিতেন ইংরেজী ভাষা, না ছিল তাঁহার ইংল্যাণ্ডের সমস্যা সম্পর্কে জানার কোনও আগ্রহ। ফলে ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করিবার দায়িত্ব তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের উপর। ওয়ালপোল হইলেন আধুনিক বিচারে প্রথম প্রধানমন্ত্রী। কারণ, পূর্বে রাজার প্রধানমন্ত্রী বলিয়া অন্যান্যরা পরিচিত থাকিলেও, ওয়ালপোলের মধ্যেই রাজার প্রধান উপদেষ্টার ও কমন্সসভার নেতার দ্বিবিধ ভূমিকার সমন্বয় ঘটিয়াছিল।

ওয়ালপোলের হস্তেই আধুনিক ক্যাবিনেট ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। তাঁহার সময়েই এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হইল যে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন হইয়া গেলে অন্যান্য মন্ত্রী বাছাই করিবার ভার তাঁহার হস্তেই ছাড়িয়া দিতে হইবে; ক্যাবিনেট ও রাজার মধ্যে মতামত আদানপ্রদানের একমাত্র সূত্র থাকিবেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং; ক্যাবিনেট যেমন একদিকে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন থাকিবে, তেমনি ক্যাবিনেটের সমর্থক দলকেও পার্লামেণ্টের ভিতর সর্বদাই ক্যাবিনেটকে সমর্থন করিয়া চলিতে হইবে।

ওয়ালপোল বহুদিন বিগত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথেই ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ক্যাবিনেটের সদস্যবর্গ যেমন রাজা ও ও পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বশীল থাকিবেন তেমনি পরস্পরের প্রতিও সমান দায়িত্বশীল হইবেন এই নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে সকলকেই পদত্যাগ করিতে হইবে; দলের প্রতিশ্রুত কার্যক্রমকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য এক যোগে সচেষ্ট হইতে হইবে; রাজা, পার্লামেণ্ট, দল ও জনতার সম্মুখে ক্যাবিনেটের ঐক্যবদ্ধ রূপ প্রদর্শন করিতে হইবে।

ক্যাবিনেটের সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পূর্বে প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council), মিনিস্ট্রি বা মন্ত্রিমণ্ডলী (Ministry), এবং ক্যাবিনেট (Cabinet) বা মন্ত্রিসভার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সঠিকরূপে নির্দেশ করিতে না পারিলে, চিন্তায় ভুল থাকিয়া যাইবার সম্ভবনা রহিয়াছে।

রাষ্ট্রনৈতিক কাজ যাহা সম্পাদিত হয় তাহা হয় শাসনবিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের দ্বারা এবং প্রিভি কাউন্সিলের দ্বারা। আইন ক্যাবিনেটকে চেনে না; রাজার হুকুম জারি হয় প্রিভি কাউন্সিলের দ্বারা, প্রিভি কাউন্সিলের সম্মতিক্রমে (By aud with the consent of the Privy Council)। ক্যাবিনেটের সদস্য কে কে হইলেন তাহার কোন ঘোষণা থাকে না। ক্যাবিনেট সদস্যকে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ করা হয় এবং তাহার পরে তাঁহাকে ক্যাবিনেটের সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা হয়। সেই দিক হইতে ক্যাবিনেটকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যে সাহায্য করিবার জন্য, তাঁহার দ্বারা নির্বাচিত কয়েকজন প্রিভি কাউন্সিলার লইয়া গঠিত সংস্থা বলিয়া ভাবা যাইতে পারে।

প্রিভি কাউন্সিল ও ক্যাবিনেট

সাধারণের নিকট সুপরিচিত না থাকিলেও, মিনিস্ট্রি বা মন্ত্রিমণ্ডলী ও

ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ইহার সংগঠন ও কার্যাবলী উভয় ক্ষেত্রেই পার্থক্য রহিয়াছে।

মিনিস্ট্রি ও ক্যাবিনেট

মন্ত্রীরা হইলেন পার্লামেণ্টের সদস্য সেই সকল রাজকর্মচারী যাঁহারা পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বশীল এবং যাঁহাদের কার্যকাল নির্ভর করিতেছে পার্লামেণ্টের সমর্থনের উপর। স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদিগের সহিত ইহাদের পার্থক্য হইল যে ইহাদের কার্যভারের চরিত্র হইল মূলতঃ রাষ্ট্রনৈতিক। অর্থাৎ, পার্লামেণ্টের সমর্থনের ভিত্তিতে ইঁহারা শাসনবিভাগের নেতা; ইঁহারা বিভাগীয় নীতি স্থির করেন ও কার্যাবলীর জন্য সম্পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব বহন করেন।

চারি পর্যায়ের সদস্য এই মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত: (ক) শাসনবিভাগীয় বিভিন্ন দপ্তরের রাষ্ট্রনৈতিক প্রধান, যেমন পররাষ্ট্রসচিব, দেশরক্ষা মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রভৃতি; (খ) দপ্তরের ভারবিহীন কিছু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, যথা, লর্ড প্রেসিডেণ্ট অভ দি কাউন্সিল (Lord President of the Council), লর্ড প্রিভি সীল (Lord Privy Seal) প্রভৃতি; (গ) পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী (Parliamentary Under-Secretary) বা সংসদীয় সহসচিব এবং অন্যান্য 'ক্ষুদে মন্ত্রী' (Junior Ministers) এবং রাজপরিবারের কিছু কর্মচারী, যথা কোষাধ্যক্ষ, হিসাব-পরীক্ষক, প্রভৃতি। পার্লামেণ্টারী সহসচিবের পদ সাধারণতঃ দলের অল্পবয়স্ক অথচ গুণসম্পন্ন সদস্যদের দেওয়া হয়, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ভবিষ্যতের নেতা হইয়া গড়িয়া উঠিবার ভরসায়। ইঁহারা ছাড়াও অবশ্য বিভাগীয় স্থায়ী সহসচিব (Permanent Under-Secretary) বা প্রধান থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের স্থায়ী চাকরী, এবং যে কোন মন্ত্রিমণ্ডলীর অধীনেই তাঁহারা কাজ করিয়া থাকেন। বর্তমানে মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য-সংখ্যা সাধারণতঃ ৬০ হইতে ৭০ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ক্যাবিনেটের গঠন-প্রকৃতি ভিন্ন। প্রধান মন্ত্রী যে সকল মন্ত্রীকে "দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে রাজাকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত" তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করেন তাঁহারাই ক্যাবিনেট সদস্য। ক্যাবিনেট সদস্য হিসাবে তাঁহার চাকুরী নয়; তিনি মন্ত্রীমাত্র, প্রধান মন্ত্রীর আহ্বানে ক্যাবিনেট সভায় যোগ দিয়া থাকেন। অর্থাৎ, মন্ত্রীমাত্রেই ক্যাবিনেট সদস্য নহেন, কিন্তু প্রতি ক্যাবিনেট সদস্যই মন্ত্রী। এই দিক হইতে দেখিলে ক্যাবিনেট হইল সমগ্র

মন্ত্রীসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ লইয়া গঠিত একটি 'আভ্যন্তরীণ চক্র' (inner circle)।

কর্মভারের দিক হইতে বিচার করিলে পার্থক্য আরও পরিস্ফুট হইবে। ক্যাবিনেট সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করেন; তাঁহারা সভায় একত্র মিলিত হন, আলোচনা করেন, নীতি নির্ধারণ করেন, সামগ্রিক কার্যের সংযোগ সাধন করেন,—এক কথায় সরকার পরিচালনা করেন। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলী একসাথে সভা করেন না, আলোচনা করেন না, নীতি নির্ধারণ করেন না। আসলে ক্যাবিনেট সদস্যগণ একত্রে আলোচনা করেন, সিদ্ধান্ত করেন ও রাজাকে উপদেশ দেন; প্রিভি কাউন্সিলারগণ হুকুম জারি করেন; মন্ত্রিগণ নীতি ও আইনকে কার্যে পরিণত করেন।*

ক্যাবিনেট ও মন্ত্রিমণ্ডলী একই সাথে ক্ষমতার আসন অধিকার করে এবং একই সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করে। প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগের সাথে সাথে ক্যাবিনেট সদস্যসমেত সকল মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হয়। 'ক্ষুদে মন্ত্রীদের' পদত্যাগের সিদ্ধান্তে কোন প্রকার মতামত জানাইবার সুযোগই হয়ত মেলে নাই; কিন্তু মতামত নিরপেক্ষই তাঁহাদের একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়।

ক্যাবিনেট গঠনের পদ্ধতি

নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের প্রথম ধাপ হইল প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ। কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গকে লইয়াই যেহেতু তাঁহার উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করিতে হইবে, সুতরাং নূতন নির্বাচনের পর কমন্সসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজা তাহার নেতাকেই প্রধান মন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। যদি কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিয়া থাকে, অথবা, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত নেতা না থাকে, তাহা হইলে রাজার ব্যক্তিগত বিচারের প্রশ্ন থাকে, অন্যথা নয়। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনে আহুত হইলে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার ইচ্ছামত সহকর্মীদের বাছাই করেন। এই মন্ত্রিগণের ভিতর যাঁহারা ক্যাবিনেট সদস্য হইবেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদেরও নির্বাচিত করেন। শুধু এটুকু বর্ণনা শুনিয়া স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে বাছাই করার কার্যে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছাই একমাত্র নিয়ামক। আইনের দৃষ্টিতে সে কথা নিশ্চয়ই সঠিক, অতীত

* "the cabinet officer deliberates and advises; the privy councillor decrees; and the minister executes."—Ogg and Zink.
Ibid p. 75)

ইতিহাস ও সমকালীন অবস্থার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন-ক্ষমতাকে বেশ কিছুটা সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়।

ক্যাবিনেট গঠনে প্রধানমন্ত্রীকে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে ক্যাবিনেট-সদস্যগণ সকলেই পার্লামেন্টের সদস্য হইবেন, এবং ক্যাবিনেটের ভিতর, কমন্সসভা ও লর্ডসভা, উভয় কক্ষের সদস্যই থাকিবেন। পার্লামেন্টের বাহির হইতে যদি কোন সদস্যকে আনিতে হয়, তাহা হইলে হয় তাঁহাকে লর্ডসভার সদস্য নিয়োগ করিতে হইবে, নতুবা দলীয় কোন কমন্সসভার সদস্যকে বুঝাইয়া পদত্যাগ করাইতে হইবে ; এবং তাহার পর এই শূন্য নিরাপদ আসন হইতে নূতন মন্ত্রীমহাশয়কে কমন্সসভায় নির্বাচিত করিয়া আনিতে হয়। অবশ্য বিদায়ী কমন্সসভার সদস্যকে লর্ড সভার আসনে বা অন্য কোন কাম্য পদে নিযুক্ত না করিলে তিনি যে সহজে কমন্সসভার আসন ত্যাগ করিতে রাজি হইবেন না, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তবে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুচতুর ব্যবহারের উপর নির্ভর করা যায়।

ইহা ছাড়াও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হইল এই যে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহার দলীয় ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ নির্বাচনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে সেই প্রতিশ্রুতির পশ্চাতে যাঁহারা ঐক্যবদ্ধ, অর্থাৎ একই দলের সদস্যগণ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হইবেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে কমন্সসভায় ক্যাবিনেটের সকল প্রস্তাবে ও কার্যে নিজ দলের সমর্থন পাইতে হইলে সেই দলের নেতৃবৃন্দকে লইয়াই ক্যাবিনেট গঠন করিতে হইবে। দলের সাধারণ সদস্য এবং জনসাধারণ দলের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দকে ক্যাবিনেটের সদস্যরূপে দেখিতে পাইবে বলিয়া আশা করে। এই ধরনের নেতৃবৃন্দকে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটে স্থান না দিলে দলের মধ্যে হতাশা, বিক্ষোভ, এমন কি উপদলীয় কলহ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি হইবারও আশঙ্কা থাকিয়া যায়। উপরন্তু 'ছায়া ক্যাবিনেট' (shadow cabinet) গঠনের রীতিও প্রধানমন্ত্রীকে কিছুটা পূর্ব হইতে বাঁধিয়া রাখে। সাধারণতঃ বিরোধী দল যাহাতে পার্লামেন্টে মন্ত্রিসভার সমালোচকের ভূমিকা যথাযথ পালন করিতে পারে সেজন্য বিরোধীপক্ষের নেতা তাঁহার কতিপয় সহকর্মীকে লইয়া এই 'ছায়া ক্যাবিনেট' গঠন করেন। ইঁহারা যৌথভাবে পার্লামেন্টে ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান এবং প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে, যথা পররাষ্ট্রনীতি, অর্থ প্রভৃতি, বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন। সুতরাং বিরোধীপক্ষে

থাকিবার সময়ে যাঁহারা ছায়া-ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর প্রকৃত ক্যাবিনেট গঠনের সময় তাঁহাদের বাদ দেওয়া কোন প্রধান-মন্ত্রীর পক্ষেই সহজ নয়। তাহা ছাড়া অতীতে যাঁহারা এই দলের ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদেরও স্থান করিতে হইবে। উপরন্তু স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্‌, প্রভৃতি ভৌগোলিক বিভাগের কথা ভুলিলে চলিবে না, তেমনি ভুলিলে চলিবে না জাতি ও দলের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিভাগগুলির কথা।

ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যা

ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে ক্যাবিনেটের মোট সদস্যসংখ্যার প্রশ্ন। নিম্নলিখিত পদাধিকারিগণ সাধারণতঃ ক্যাবিনেটে স্থান পান: (১) ফার্স্ট লর্ড অব দি ট্রেজারি (First Lord of the Treasury), প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই পদ অলঙ্কৃত করেন; (২) চ্যান্সেলার অব দি এক্স্‌চেকার (Chancellor of the Exchequer) বা অর্থমন্ত্রী; মিনিষ্টার ফর ডিফেন্স (The Minister for Defence) বা দেশরক্ষা মন্ত্রী; পররাষ্ট্র বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, কমনওয়েলথ ও ঔপনিবেশিক সম্পর্ক বিভাগ, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় সচিবগণ (The "principal secretaries of state", including the heads of the Foreign Office, the Home Office, the Commonwealth Relations and Colonial Office); তাহা ছাড়া বিভাগীয় দায়িত্ববিহীন লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব দি কাউন্সিল (The Lord President of the Council) ও লর্ড প্রিভি সীল (The Lord Privy Seal) প্রভৃতি। তাহা ছাড়া কোন বিশেষ বিভাগের সমকালীন আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী সেই বিভাগীয় প্রধানকে ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্যাবিনেট সদস্যদের মোট সংখ্যার তারতম্য হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ৭ হইতে ৯ এর অধিক ছিল না। যুগপরিবর্তনের সহিত সরকারের কাজ বাড়িয়াছে; ক্যাবিনেটের দায়িত্ব বাড়িয়াছে এবং সাথে সাথে ক্যাবিনেটের সদস্য-সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ১৯৩৯ সালে চেম্বারলেইন ক্যাবিনেটের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩। কিন্তু এত অধিকসংখ্যক সদস্য লইয়া খোলা মনে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার সুযোগ থাকে না। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লয়েডজর্জ ও চার্চিল যথাক্রমে ৫ ও ৮ জনের "যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেট" (War Cabinet) গঠন করেন। ইহারা সাধারণতঃ বিভাগীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন না—সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনাই ইঁহাদের একমাত্র কাজ ছিল। সাম্প্রতিক যুগে ক্যাবিনেট সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬ হইতে ১৭।

প্রধানমন্ত্রী সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুত করিলে রাজা তাঁহাদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত করেন এবং লণ্ডন গেজেটে (London Gazette) এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। ক্যাবিনেট-সদস্যদের নাম ঘোষিত হয় না; শুধু যে সকল দপ্তরবিহীন মন্ত্রী ক্যাবিনেটে নির্বাচিত হন তাঁহাদের নাম গেজেটে প্রকাশিত হয়। তবে আধুনিকযুগে সংবাদপত্রের কল্যাণে বেসরকারী প্রচারে বিলম্ব হয় না। ১৯১৮ সালের রাষ্ট্রযন্ত্রকমিটির রিপোর্ট (Report of the Machinery of Government Committe, 1918) অনুযায়ী ক্যাবিনেটের কাজ হইল মূলতঃ তিনপ্রকার: (১) পার্লামেণ্টে উপস্থিত করিবার নীতির চূড়ান্ত নির্ধারণ (Final determination of the policy to be submitted to Parliament); (২) পার্লামেণ্ট নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী জাতীয় শাসন পরিচালনার চরম কর্তৃত্ব-গ্রহণ (Supreme control of the national executive in accordance with the policy prescribed by Parliament) এবং (৩) বিভিন্ন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অবিরত সীমানিরূপণ ও সংযোগ সাধন (continuous coordination and delimitation of the authorities of the several departments of state)। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নী কার্য সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেটই গ্রহণ করিবে। দেশের শাসন পরিচালনার চরম দায়িত্ব ক্যাবিনেটই গ্রহণ করিবে এবং ক্যাবিনেটই দেখিবে যে শাসনবিভাগের প্রত্যেকটি দপ্তর ঠিকমত নিজনিজ কার্য করিয়া চলিতেছে, একে অপরের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে না, বা বাধা সৃষ্টি করিতেছে না, পারস্পরিক কার্যে সঙ্গতি বজায় রাখিয়া শাসনবিভাগীয় একটি নীতিকে কার্যে পরিণত করিতেছে। ক্যাবিনেটের মধ্যে শাসনপরিচালনার সকল বিভাগীয় কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়াছে, ঠিক যেমন হইয়াছে আইন-প্রণয়ন ও শাসনপরিচালনার দায়িত্বের মিলন। কোন আইন পাস করা হইবে, কোন আইন কতটুকু সংশোধন করা হইবে, এবং আইন সম্পর্কে কোন প্রস্তাব বর্জন করা হইবে, তাহা ক্যাবিনেটই সিদ্ধান্ত করে। উপরন্তু কোন ধরনে, কোন ভাষায়, কোন সময়ে, প্রস্তাব আনা হইবে বা পাস করা হইবে সে বিচারও ক্যাবিনেটের। এমনকি, কোন বিষয়ে পার্লামেণ্টের কতটুকু সময় ব্যয়িত হইবে তাহাও ক্যাবিনেটই নির্ধারণ করে। ক্যাবিনেট সদস্যগণ পার্লামেণ্টে উপস্থিত থাকিয়া প্রস্তাব আনেন, ব্যাখ্যা করেন, প্রশ্নের

ক্যাবিনেটের কার্যাবলী

ক্যাবিনেট ও আইনপ্রণয়ন

জবাব দেন, কিন্তু তাহা মন্ত্রী হিসাবে। এবং নিজ সিদ্ধান্ত বলবৎ করেন কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিতে। বলা হইল,—শাসন পরিচালনার চরম দায়িত্ব ক্যাবিনেটের। অথচ, আইনতঃ ক্যাবিনেট নিজ দায়িত্বে কাহাকেও নির্দেশ দিতে বা হুকুম করিতে পারে না। সুতরাং শাসনকার্য প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা—ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় এবং সে সিদ্ধান্ত তাঁহারা যথাযথ কার্যে পরিণত করেন। তাহা ছাড়া, ক্যাবিনেট যদি যুদ্ধ ঘোষণা বা সাধারণ কোন নীতি ঘোষণা করিতে চায়, তাহা হইলে কাউন্সিল সমেত রাজার (The King in Council) নির্দেশনামা জারি করিতে হইবে।

ক্যাবিনেট ও শাসন পরিচালনা

আইন কানুনের বাঁধাবাঁধির ভিতর দিয়া ক্যাবিনেটের কাজ চলে না। সাধারণতঃ সপ্তাহে দুইবার এবং জরুরী অবস্থার তাগিদে বহুবার, ক্যাবিনেট সভা বসে। সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসস্থানে (১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীট) সভা হয় ; প্রয়োজনে অন্যত্রও হইতে পারে। সভা করিবার জন্য সর্বনিম্নসংখ্যকের উপস্থিতির (quorum) কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। ভোট দিয়া নীতি নিধারণও সাধারণ পদ্ধতি নহে ; মতের আদান প্রদান ও আপোষ মীমাংসার ভিতর দিয়া মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণই সাধারণ নিয়ম। ক্যাবিনেটের সভা বক্তৃতা করিবার স্থান নহে ; আনুষ্ঠানিক রীতি পদ্ধতি সাধারণতঃ বর্জিত হইয়া থাকে।

ক্যাবিনেটের কার্যপদ্ধতি

পূর্বে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের কোন লিখিত দলিলপত্র থাকিত না। নিজ প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী হয়ত কোন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত টুকিয়া রাখিতেন। অন্য কাহারও পক্ষে কিছু লিখিয়া লওয়া অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। ফলে যথেষ্ট ভুল বুঝাবুঝি থাকিয়া যাইত। ১৯১৭ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লয়েডজর্জ এ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া প্রথম ক্যাবিনেট সেক্রেটারী নিয়োগ করেন এবং সাথে সাথে ক্যাবিনেট সচিবের দপ্তর গড়িয়া উঠে। তৎকালীন প্রবল সমালোচনা সত্ত্বেও ক্যাবিনেট সচিবের পদ ও বিভাগ টিকিয়া গিয়াছে। বর্তমানে ক্যাবিনেট অফিসের কাজ হইল নিম্নরূপ : (১) ক্যাবিনেট ও ক্যাবিনেট কমিটির কার্যে সহায়তার জন্য দলিলপত্র যথাযথ প্রচার করা ; (২) প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ক্যাবিনেটের আলোচ্য-সূচী এবং ক্যাবিনেট কমিটির সভাপতির

ক্যাবিনেট সচিব ও ক্যাবিনেট অফিস

নির্দেশে সেই কমিটির আলোচ্যসূচী প্রণয়ন করা ; (৩) ক্যাবিনেট ও ক্যাবিনেট কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিবার নির্দেশনামা প্রচার করা ; (৪) ক্যাবিনেট ও ক্যাবিনেট কমিটির সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা ও প্রচার করা এবং ক্যাবিনেট কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত করা ; এবং (৫) ক্যাবিনেটের নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাবিনেটের নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ও দলিলপত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা।*

ক্যাবিনেটের বিশাল কার্যপরিচলনায় সুশৃঙ্খলা আনার জন্য একদিকে যেমন ক্যাবিনেট অফিস গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে ইহার ভার লাঘব করিয়াছে ক্যাবিনেট কমিটি। ক্যাবিনেট কমিটি দুই ধরনের হইয়া থাকে,—স্থায়ী ও অস্থায়ী (standing committees and ad hoc committees)।

ক্যাবিনেট কমিটি

স্থায়ী কমিটিগুলির উপর সারা বৎসরব্যাপী সমজাতীয় সমস্যার বিচার করিবার ভার দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী বা ক্যাবিনেট সাময়িক কোন সমস্যা বিচার করিবার জন্য অস্থায়ী কমিটি গঠন করেন। কমিটির সুবিধা হইল সাধারণতঃ ক্যাবিনেট সদস্য ছাড়াও 'ক্ষুদেমন্ত্রী', পার্লামেণ্টারী সচিব, এমন কি স্থায়ী চাকুরিয়াও ইহার সদস্য হিসাবে সভায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন। ১৯৪৫ সালে শ্রমিকদল ক্যাবিনেট গঠন করিলে বহুতর ক্যাবিনেট কমিটির সৃষ্টি হয় ; যথা, স্বরাষ্ট্রবিষয়ক বিষয়গুলির সংযোগের জন্য লর্ড প্রেসিডেণ্ট্‌স্‌ কমিটি, অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি, উৎপাদন কমিটি, দেশরক্ষা কমিটি, রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কীয় কমিটি, প্রচারবিষয়ক কমিটি, বেসরকারী বিমানবিভাগীয় কমিটি, শিল্প সমাজতন্ত্রীকরণ সম্পর্কীয় কমিটি, তাহা ছাড়া জাতীয় স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বা গৃহ-সংস্থান সম্বন্ধীয় অস্থায়ী কমিটি। সর্বক্ষেত্রেই ক্যাবিনেট-কমিটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য দুইটি : (ক) ক্যাবিনেটে শেষ পর্যন্ত যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে সে সম্পর্কে আলোচনা, বিচার ও বিতর্ক করিয়া, যথাসম্ভব আপোষ মীমাংসার দ্বারা, ক্যাবিনেটের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আনিয়া ক্যাবিনেটের সময় সংক্ষেপ করা ; এবং (খ) অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্যাবিনেটের সময় অযথা ব্যয় না করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তবে মনে রাখিতে হইবে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা এই ব্যবস্থায় কোন ক্রমেই লঙ্ঘিত হইতেছে না।

ক্যাবিনেট সভায় সাধারণ নীতি সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচিত হইয়া থাকে।

* See Jennings—Cabinet Government—p. 245

গতানুগতিক ও খুঁটিনাটি বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া যেগুলির রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব নাই, বিভাগীয় মন্ত্রীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন ; প্রয়োজন হইলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া লইতে পারেন। যে মন্ত্রী সকল বিষয়ই ক্যাবিনেট সভায় উত্থাপন করিতে চান, তিনি দুর্বলচিত্ত বলিয়া বিবেচিত হন ; যিনি কোন কথাই ক্যাবিনেটকে বলিতে চান না তাঁহাকে বিপজ্জনক বলিয়া সন্দেহ করা হয়।* কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শ করা মন্ত্রির অধিকারমাত্র নয়, তাঁহার দায়িত্বও বটে।

ক্যাবিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত দিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বাঁধা যায় না ; ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও তিনি স্বীয় মত অনুযায়ী রাজাকে উপদেশ দিতে পারেন। তবে এ পথ বিপদ্‌সঙ্কুল ; ইহার ফলে ক্যাবিনেটে বিদ্রোহ, দলে ভাঙ্গন ও শেষ পর্যন্ত ক্যাবিনেটের পতন ঘটাও আশ্চর্য নয়।

ক্যাবিনেটের এক্তিয়ার-বহির্ভূত বিষয়

জেনিংস বলিয়াছেন যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ক্যাবিনেটে আলোচিত হয় না : করুণাপ্রদর্শনে রাজার বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ, ক্যাবিনেটের সদস্যপদে নিয়োগ এবং বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ক্যাবিনেটের আলোচনার বহির্ভূত ;** তবে রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব থাকিলে করুণাপ্রদর্শন বা চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ক্যাবিনেটের মতামত নিশ্চয়ই গ্রহণ করা হইবে। সম্মান-সূচক উপাধি বিতরণে ক্যাবিনেট হস্তক্ষেপ করে না।† সেইরূপ পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকারও ক্যাবিনেটের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।‡ সাংবৎসরিক বাজেটের বিষয়টি একটু জটিল। সারা বৎসর ধরিয়া যে আয়-ব্যয় হইবে, তাহা নিশ্চয়ই অনেক বেশী রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ ; সুতরাং ক্যাবিনেটে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে কোন দলিলপত্র প্রচার করা হয় না। কমন্সসভায় উপস্থিত করিবার কয়েকদিন পূর্বে অর্থমন্ত্রী ক্যাবিনেট সভায় মৌখিক বিবৃতি দেন। ক্যাবিনেটের সাধারণ পদ্ধতি, অর্থাৎ,

* The minister who refers too much is weak ; he who refers too little is dangerous."—Jennings. *Ibid* p. 234

** Jennings— *Ibid*—p. 234.
† " — " —p. 235.
‡ " — " —p.

ক্যাবিনেট কর্তৃক নীতি-নির্ধারণ, কমিটীতে বিশদ বিচার, দলিল-পত্রাদির প্রচার, ইত্যাদি, এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়।§

ক্যাবিনেটের মূলনীতি

ক্যাবিনেটের প্রকৃতি, কার্যাবলী, প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রনৈতিক মূল যে নীতিগুলির ভিত্তিতে ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা দাঁড়াইয়া আছে সেগুলি একত্রে পুনরায় উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। নির্যাসে সেগুলিকে নিম্নোক্ত পাঁচ দফায় উপস্থিত করিতে পারা যায়:

পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব

১। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্রনৈতিক রূপ ক্যাবিনেটের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। ইহার অর্থ হইল, পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দ লইয়া ক্যাবিনেট গঠিত হইবে, যাহাতে পার্লামেন্টে ক্যাবিনেটের সমর্থন অটুট থাকে। অবশ্য ইহার রূপান্তর আছে। কোন দলই যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়, তাহা হইলে, একাধিক দল মিলিয়া সম্মিলিত (coalition) ক্যাবিনেট গঠন করিতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও এই মিলিত প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারী সব দলগুলির কিছু কিছু নেতাকে ক্যাবিনেটে স্থান দিতে হইবে। অপর ক্ষেত্রে এমন হইতে পারে যে কোন একটি সংখ্যালঘু দল, অন্য দলের সমর্থনের ভিত্তিতে, কমন্সসভায় কোনরকমে সংখ্যাগুরুত্ব খাড়া করিয়া, ক্যাবিনেট গঠন করিল। কিন্তু সমর্থকদল ক্যাবিনেটে আসন গ্রহণ করিল না। কিন্তু এরূপ ক্যাবিনেট অস্বাভাবিক অবস্থার সূচক। সমর্থনকারী দল বা দলগুলি যে ক্যাবিনেটে স্থান গ্রহণ করিতে চাহিল না, তাহা হইতেই প্রমাণ হয় যে দলগুলির ভিতর মূলনীতিগত পার্থক্য রহিয়াছে, ক্যাবিনেট গঠন নিতান্ত সাময়িক বন্দোবস্ত মাত্র; যে কোন সময়েই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। সম্মিলিত ক্যাবিনেটও সাধারণতঃ বিভিন্ন দলের নীতিগত ও স্বার্থগত টানাপোড়েনের ফলে দুর্বল হয়। যদিও যুদ্ধ বা অনুরূপ জরুরী অবস্থায় এ ব্যবস্থার কার্যকরীতা সপ্রমাণিত হইয়াছে।

পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হইবে

২। ক্যাবিনেট সদস্যগণের প্রত্যেককেই পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যে কোনটির সদস্য হইতে হইবে। ১৯২৩ সাল হইতে প্রধানমন্ত্রীকে কমন্সসভার সদস্য হইতে হইবে এ রীতি প্রচলিত হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যদিও

§ Jennings—, *Ibid*—p. 237.

জেনিংস ও অন্যান্য অনেকেই মনে করেন যে এ রীতিকে এখনও চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা যায় না।

মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব

৩। প্রতিটি মন্ত্রীর স্বকীয় কার্যের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক ও আইনগত ব্যক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ক্যাবিনেটকে সরকারের সকল কার্যের রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব যৌথভাবে বহন করিতে হইবে। এই যৌথদায়িত্ব ক্যাবিনেটকে একই নীতিতে চলিতে, একই কথা বলিতে, বাধ্য করে। সাধারণভাবে যে কোন দপ্তরের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যের জন্যই ক্যাবিনেট দায়ী। টিঁকিলে সমগ্র ক্যাবিনেট একই সঙ্গে টিঁকিয়া থাকিবে এবং পতন ঘটিবার সময়েও একই সাথে সকলের পতন ঘটিবে। এই জন্যই ক্যাবিনেটের নিজস্ব সভায় সদস্যবৃন্দ যতই বিতর্ক-বিতণ্ডা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত বাহিরের জগৎ জানিবে যে একটি সিদ্ধান্তের পিছনে সকলেরই সম্মতি আছে। ক্যাবিনেট মন্ত্রণার গোপনীয়তার গুরুত্ব সেইজন্যই এত অধিক। রাজসকাশে, পার্লামেণ্টের সম্মুখে। দেশবাসীর নিকট, এমনকি দলের সদস্যদের নিকটও,—সর্বত্রই ক্যাবিনেটের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রতিটি মন্ত্রীই সমর্থন করিবেন এবং সমালোচনার বিরোধিতা করিবেন।

যৌথ দায়িত্ব

এই যৌথ দায়িত্বের নীতিই কিন্তু ক্যাবিনেটের শক্তির প্রধান উৎস। পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতৃত্ব মিলিতভাবে দাঁড়ানোর ফলে রাজা তাহাদের বিরোধিতা করিতে পারেন। পূর্বে যাহা ছিল রাজার উপদেষ্টামণ্ডলী, রাজার ক্ষমতা আজ তাহারই নিকট চলিয়া গিয়াছে। পার্লামেণ্টের নির্দেশে ও নিয়ন্ত্রণে যাহার চলিবার কথা, এই যৌথদায়িত্বের নীতিতে তাহারা পার্লামেণ্টের নেতা ও নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ নেতৃত্ব যতক্ষণ ঐক্যবদ্ধ, দলীয় ঐক্য ততক্ষণ সুদৃঢ় থাকিবে। দলীয় সমর্থন যতক্ষণ নিশ্চিত, ক্যাবিনেট ততক্ষণ পার্লামেণ্টকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারিবে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য

৫। এই দলীয় ঐক্য বজায় থাকার অন্যতম বৃহৎ উৎস হইলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সকলের আনুগত্য। ইহা সত্যই যে প্রধানমন্ত্রীকে ‘সমপর্যায়ভুক্তদের মধ্যে প্রধান (‘primus inter pares’) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার প্রাধান্য অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার এই মূলনীতিগুলি স্মরণ রাখিলে ইহার সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটের পার্থক্য বোঝা সহজ হয়:

ব্রিটিশ ও মার্কিন ক্যাবিনেটের পার্থক্য

গ্রেট ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের সকল সদস্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যে কোন একটির সদস্য। ক্যাবিনেট সামগ্রিকভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল। ক্যাবিনেটের উপর কমন্সসভার আস্থার অভাব হইলে ক্যাবিনেটকে বিদায় লইতে হইবে; আবার, ক্যাবিনেট কমন্সসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠতার সমর্থনের শক্তিতে, নিজ ইচ্ছামত আইন পার্লামেণ্টে পাস করাইয়া লইতে পারে। ক্যাবিনেট বা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাজা কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন।

আইনসভার সহিত সম্পর্কে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতি হইল ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটের কোন সদস্যই মার্কিন আইনসভার, বা কংগ্রেসের, কোন কক্ষের সদস্য থাকিতে পারেন না। ক্যাবিনেট সদস্যপদে নিযুক্ত হইবার সময় যদি কেহ আইনসভার সদস্য থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উক্ত পদে ইস্তফা দিতে হইবে। কংগ্রেস কোন ক্যাবিনেট সদস্যের গুরুতর অপরাধের জন্য বিশেষ বিচার ব্যবস্থার (impeachment proceedings) মাধ্যমে তাঁহাকে বিতাড়ণ করিতে পারেন; কিন্তু কংগ্রেসের আস্থার অভাবের জন্য ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করিতে হয় না। সেইরূপ কংগ্রেসও ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব স্বীকার করে না। কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার ক্যাবিনেট বা রাষ্ট্রপতির নাই।

ব্রিটেনে ক্যাবিনেট নামে রাজার উপদেষ্টা, কিন্তু বাস্তবে শাসনবিভাগের প্রকৃত পরিচালক। রাষ্ট্রের প্রধান (Head of the State) রাজা, আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাবিনেট সদস্যদের নিয়োগ করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাছাই করেন প্রধানমন্ত্রী। বাছাই করার ব্যাপারে আইনের দিক হইতে তিনি স্বাধীন; কিন্তু বাস্তবে দলের সহযোগী নেতৃবৃন্দকে নিয়োগ করা প্রায় অবধারিত। ব্রিটেনে রাষ্ট্রনৈতিক উচ্চাভিলাষীর পক্ষে ক্যাবিনেট সদস্যপদ অত্যন্ত বাঞ্ছিত আসন। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারা ক্যাবিনেটে আসিতে চান এবং দল ও জনসাধারণও

নিয়োগ পদ্ধতি ও দায়িত্ব

তাঁহাদের ঐ পদে দেখিতে চায়। কারণ প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের নেতা হইলেও ক্যাবিনেট সামগ্রিকভাবেই শাসন পরিচালনা করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নিজ ইচ্ছামত ক্যাবিনেট-সদস্য বাছাই করিতে পারেন; অবশ্য কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ, সিনেটের (Senate) সম্মতি প্রয়োজন। অধিকপক্ষে দুই একজন কংগ্রেস সদস্য হয়ত ক্যাবিনেটে যোগ দিতে পারেন; দলের প্রথম সারির নেতারা সাধারণতঃ ক্যাবিনেটে আসেন না। তাঁহারা তুলনায় সেনেটের সদস্যপদ অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যপালের পদ (State Governorship) কাম্য বলিয়া মনে করেন। কারণ, ক্যাবিনেটের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির নির্দেশানুযায়ী শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনা করেন। সমগ্র দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির; তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ক্যাবিনেট সদস্যগণ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীমাত্র। ক্যাবিনেটের মত গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণই তাঁহার ইচ্ছাধীন।

যৌথ দায়িত্বের নীতি

যৌথ দায়িত্ব হইল ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মূলনীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন ক্যাবিনেট সদস্যের কার্যের ও মতামতের দায়িত্ব অপরএকজন সদস্য গ্রহণ করিতেছেন,—এরূপ উদাহরণ নিতান্তই বিরল। মিলিত সিদ্ধান্ত এখানে কার্যের ভিত্তি নহে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ক্যাবিনেটের পরামর্শ গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নহেন।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ব্রিটিশ ও মার্কিন শাসনব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তুলনামূলক মূল্যায়নের স্থান ইহা নহে। ভবিষ্যতের আলোচনায় নিজ নিজ ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা আরও প্রকট হইবে।

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার দুইটি মৌলিক সমালোচনা উঠিয়াছে। প্রথম অভিযোগ হইল: ক্যাবিনেটের দায়িত্বের অন্তরালে আমলাতন্ত্র (bureaucracy) সমগ্র শাসনব্যবস্থার উপর এক শক্তিশালী কর্তৃত্বজাল বিস্তার করিয়াছে।

(১) ক্যাবিনেট দায়িত্বের অন্তরালে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার প্রসার

বিগত শতাব্দী হইতে ক্রমেই শাসনব্যবস্থার কর্মভার বাড়িয়াছে। সামান্য আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থা হইতে সুরু করিয়া নানাদিকে কার্যক্রম বিস্তার করিয়া শাসনব্যবস্থা কল্যাণকর রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতেই সাথে সাথে নিযুক্ত হইয়াছে দায়িত্ব পালনের জন্য

কর্মচারীবৃন্দ। কাগজে-পত্রে নীতি হইল আইনের মাধ্যমে ঘোষিত সরকারী নীতি আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে কর্মচারিরা কার্যে পরিণত করিবে। কিন্তু বাস্তবে আইন রচিত হয় ব্যাপক অর্থপূর্ণ ভাষায়; উপরন্তু কার্যকরী করা সম্বন্ধে বহু বিষয় অনুল্লিখিত থাকে; অনেক খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ম-কানুন করিয়া লইবার ভার পার্লামেণ্ট শাসনবিভাগের উপর ছাড়িয়া দেয় (delegated legislation)।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল পার্লামেণ্টের উপর শাসন বিভাগের কর্তা ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব। ক্যাবিনেটের প্রস্তাবই পার্লামেণ্ট হইতে পাস হয়। স্থায়ী সরকারী কর্মচারীরা যে শুধু 'বিলের' (bill) খসড়া প্রস্তুত করেন তাহাই নয়, বিভিন্ন দপ্তর চালনার প্রয়োজনে কোন ধরনের আইন প্রবর্তন, পরিবর্জন বা সংশোধন প্রয়োজন, তাহাও তাঁহারা বিভাগীয় মন্ত্রিগণের নিকট উপস্থিত করেন। সরকারের অর্থও সরকারী কর্মচারীদের দ্বারাই ব্যয়িত হয়; পরিকল্পিত কার্যের জন্য কত অর্থ লাগিবে সে প্রস্তাবও তাঁহারাই ক্যাবিনেটের সম্মুখে উপস্থিত করেন; অর্থাগম সম্পর্কে রাজস্ববিভাগের কর্মচারী-বৃন্দের কর্তৃত্বও অনস্বীকার্য।

রাষ্ট্রনীতিগতভাবে পার্লামেণ্ট বা বৃহত্তর জনসমাজ শাসনবিভাগের সকল কার্যের জন্য বিভাগীয় মন্ত্রিদিগকে এবং সামগ্রিকভাবে ক্যাবিনেটকেই দায়ী করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দপ্তর পরিচালনায় মন্ত্রিগণের যোগ্যতা কতটুকু? মন্ত্রীমহাশয়রা দলীয় নেতা। তাঁহারা মাঠে-ময়দানে বা পার্লামেণ্টে বক্তৃতা করিয়া দলের পক্ষে জনসমর্থন সংগ্রহ করেন, দল সামলান, নির্বাচনে জিতিবার কৌশল স্থির করেন। এই দিক দেখিতেই তাঁহাদের সময়, শক্তি ও চিন্তার অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়া যায়। ইহার উপর দপ্তরের প্রকৃত দায়িত্ব গ্রহণ করিবার অবসর বা অবকাশ কতটুকু? পাশাপাশি বিচার করিলে, বিভাগীয় স্থায়ী প্রধান সচিবের দপ্তরের বাহিরের সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই; দপ্তরের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি অবগত আছেন এবং সে সম্পর্কে দৈনন্দিন নির্দেশ দিতেছেন। উপরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভাগীয় কার্যে তাঁহার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা; তাহা ছাড়া শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতা প্রমাণ করিলেই স্থায়ী সরকারী চাকুরীর প্রথম সারিতে স্থান করিয়া লওয়া সম্ভব। এ অবস্থায় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দই শাসন চালান; তাঁহাদের দ্বারা মন্ত্রিরা পরিচালিত হন; তাঁহাদের কার্য মন্ত্রিরা সমর্থন করিয়া চলেন; তাঁহাদের নীতি নিজস্ব নীতি বলিয়া প্রচার করিয়া মন্ত্রিরা আত্মপ্রসাদ

লাভ করিয়া থাকেন। ফলে, ক্যাবিনেটের দায়িত্বের অন্তরালে জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বহীন, জনস্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন, (irresponsible and indifferent to popular interest) ইতিহাস ও নজিরের প্রাচীন খাতে চলিতে অভ্যস্ত (bound by precedents), দলিল-দস্তাবেজ ও লাল-ফিতার নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ (bound by departmental rules and red-tapism), দীর্ঘসূত্রী, অনড় ও অপব্যয়ী (time-killing, slow-moving and wasteful) আমলাতন্ত্র শাসন পরিচালনা করিতেছে।

আমলাতন্ত্রের শত দোষত্রুটি সত্ত্বেও শাসন-পরিচালনায় স্থায়ী দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং প্রশ্ন হইল,—স্থায়ী কর্মচারীদিগের উপর মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ থাকে কিনা। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে। তিনি যদি দপ্তর সম্পর্কে উদাসীন অথবা স্থায়ী কর্মচারীদের সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হন, তাহা হইলে স্বভাবতঃই পূর্বোল্লিখিত অভিযোগ খাটে। কিন্তু বাস্তবে মন্ত্রিমহাশয়ের নিকট আশা করা হয় যে তিনি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইবেন; মানুষ সম্পর্কে ভালোমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে; বিভাগীয় সমস্যার মূল রূপটি তিনি ধরিতে পারিবেন এবং বিভাগীয় কর্মনীতির রাষ্ট্রনৈতিক ফলাফল বিচার করিতে পারিবেন। দেশবাসী কতটুকু সহ্য করিবে এবং কতটুকু করিবেনা, স্থায়ী কর্মচারীদিগের এটুকু বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে চালাইবার ক্ষমতা থাকাই মন্ত্রীর পক্ষে যথেষ্ট।*

ব্রিটিশ ব্যবস্থার পক্ষে আরও দুইটি যুক্তি রহিয়াছে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রনীতিতে সদ্য আগত কাহাকেও সহসা মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হয় না। দীর্ঘকাল ধরিয়া পার্লামেণ্টে শিক্ষানবিশী করার পরই এ আসন লাভ করা সম্ভব। এই সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক অভিজ্ঞতার উপরেও নিজ ইচ্ছামত বিষয় সম্পর্কে চর্চা করিবার সুযোগ তাঁহারা পান। অপরপক্ষে, স্থায়ী কর্মচারীদের পক্ষে মন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের নির্দেশ মানিয়া চলার ঐতিহ্যও পুরাতন এবং দৃঢ়ভিত্তিতে গঠিত।

ক্যাবিনেট-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* "The value of the political heads of the departments is to tell the permanent officials what the public will not stand." Quoted by Carter, Herz and Ranney—Major Foreign power.

সমালোচকদের মতে, এই ব্যবস্থায় কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতে ক্যাবিনেটের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার (Cabinet Dictatorship) উদ্ভব হইয়াছে। ক্যাবিনেটের সামগ্রিক কার্যের পরিধি, পার্লামেন্টের ক্যাবিনেটের কার্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দলীয় সংগঠন ও দলীয় শৃংখলার ফলে, সর্ববিষয়ে পার্লামেন্টের সমর্থনের নিশ্চয়তা লক্ষ্য করিয়াই সমালোচকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিষয়টির কিছুটা বিশদ আলোচনার প্রয়োজন।

ক্যাবিনেটের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার বিকাশ

প্রথমতঃ, ক্যাবিনেট-গঠনে কমন্সসভার কোন হাত নাই। কারণ, সাধারণ নির্বাচনের ভিতর দিয়া কমন্সসভার দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারিত হইয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজা ক্যাবিনেট গঠনের ভার দিবেন। ক্যাবিনেট গঠন করেন প্রধানমন্ত্রী। ক্যাবিনেট সদস্য নির্বাচনে কমন্সসভার করিবার কিছু নাই। বিশেষ কোন মন্ত্রী বা সামগ্রিকভাবে ক্যাবিনেট সম্পর্কে কমন্সসভা আস্থার অভাব জানাইতে পারে। কিন্তু দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে অনাস্থা-প্রস্তাব গৃহীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ, দলীয় শৃংখলার ফলে ক্যাবিনেট গঠন বা ক্যাবিনেট বিতাড়ন আজ কমন্সসমভার ক্ষমতার বহির্ভূত।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রনৈতিক নীতি-নির্ধারণ ও শাসন-পরিচালনা ক্যাবিনেটের দায়। বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে পার্লামেন্টের সম্মতি না লইয়াও ক্যাবিনেট চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে; আইন করিবার প্রয়োজন থাকিলেও পার্লামেন্টের সম্মুখে উপস্থিত হইবার পূর্বেই গুরুতর দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারে। ১৮৯৮ ও ১৯০০ সালে গোপন চুক্তি সাধিত হইয়াছিল, এবং তাহা ১৯১৮ সালের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৪৩ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজ্‌ভেল্টের সহিত এটম বোমা সম্পর্কে যে চুক্তি (agreement) করিয়াছিলেন তাহা ১৯৫৪ সালের পূর্বে পার্লামেণ্ট জানিতে পারে নাই। ১৯৪৮ সালে পার্লামেন্টে আলোচনার পূর্বেই আণবিকবোমাবাহী বিমান ইংল্যাণ্ডে আসিয়া হাজির হইয়াছিল এবং ঠিক ঐরূপেই ১৯৪৯ সালের উত্তর অতলান্তিক চুক্তিতে ব্রিটেন যোগ দিয়াছিল.

পার্লামেণ্ট ও নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ইতিহাসেরও অভাব নাই। ১৯৩৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দল তাহার মূল পররাষ্ট্র-

J. Harvey & K. Hood: The British State pp. 51-52

নীতি হিসাবে ঘোষণা করিয়াছিল : জাতি সংঘের (League of Nations) সমর্থন ও সম্মিলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Collective Security)। অথচ তাহার একবৎসর পূর্ব হইতেই রক্ষণশীল দলের নেতৃবৃন্দ ক্যাবিনেটের ভিতরে পুনরস্ত্রসজ্জার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নির্বাচনের পরেও তাহা চালু রাখিয়াছিলেন।*

শুধু তাহাই নয়, এই সময়ে রক্ষণশীল দলের কার্যাবলী জাতি-সংঘের মর্যাদা ও কার্য্যকরিতা মূলতঃ খর্ব করিয়াছিল।

আইন প্রণয়নে ক্যাবিনেট প্রস্তাবিত বিলই পার্লামেণ্ট পাস করিয়া থাকে। ক্যাবিনেটের সমর্থন ব্যতীত সাধারণ সদস্যদের প্রস্তাব পাস হইবার উপায় নাই। নিতান্ত মামুলী ধরনের সংশোধনী ক্যাবিনেট কখনও কখনও মানিয়া লইলে তবেই তাহা কমন্সসভার দরজা পার হইতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী ক্যাবিনেট গ্রহণ করে না। কারণ তাহাতে লোকচক্ষুতে মর্যাদাহানির আশঙ্কা থাকে। অর্থ সংক্রান্ত প্রস্তাবে কড়াকড়ি আরও অধিক। বিতর্ক মূলতঃ বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালনার উপরেই কেন্দ্রীভূত থাকে।

উপরন্তু পার্লামেণ্টের কার্যসূচীও ক্যাবিনেট নির্ধারণ করে। কোন বিষয় কতক্ষণের জন্য পার্লামেণ্টের আলোচনায় স্থান পাইবে তাহা স্থির করিবার মালিক ক্যাবিনেট। এমন কি, ক্যাবিনেটের, তথা প্রধান মন্ত্রীর, উপদেশে রাজা কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দেন।

অর্থাৎ, এক কথায়, তত্ত্বের বিচারে পার্লামেণ্ট ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাস্তবে ক্যাবিনেটই পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিয়া থাকে। র‍্যামজে ম্যুরের মতে : এত অধিক ক্ষমতা যাহার হস্তে কেন্দ্রীভূত, সে নিজে যতই অপারগ হউক, তাহাকে সর্বশক্তিমান স্বৈরতন্ত্র বলিয়া গণ্য করিতে হয়; ইহার ক্ষমতা শুধু ব্যাপক প্রচার-ব্যবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ।†

ক্যাবিনেটের ক্ষমতার তুলনায় দেখা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রুজভেল্টের মত

* Jennings : Cabinet Government. pp. 506-509

† A body which wields such powers as these may fairly be described as 'omnipotent' in theory, however incapable it may be of using its omnipotence. Its position, whenever it commands a majority, is a dictatorship only qualified by publicity. Ramsay Muir. How Britain is Governed ! p. 89

জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেসে স্বদলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও, ১৯৩৭ সালে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছিলেন। অনেক লেখক সেইজন্য বলেন ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা মূলতঃ গণভোটমূলক গণতন্ত্র ("plebiscitary democracy") । সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণ একবার কোন একটি দলকে বিজয়ী করিয়া সরকার গঠনের ভার দিলে পর, আবার নূতন সাধারণ নির্বাচনে সেই দলের সম্পর্কে, 'হ্যাঁ' বা 'না' বলা ছাড়া তাহার উপর আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বিশেষ বিশেষ নীতি প্রণয়নেও অপর কাহারও বিশেষ কোন অবদানের সুযোগ থাকে না

ক্যাবিনেটের এই প্রচণ্ড ক্ষমতা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। বস্তুতঃ আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা ও জটিলতা, দ্রুত চলমান জীবনের নানা সমস্যার জরুরী সমাধানের প্রয়োজনীয়তা, প্রায় সর্ব দেশেই রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে আগাইয়া আনিতেছে। খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি যে কংগ্রেসকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহা সকলে স্বীকার করেন এবং অনেকে তাহাকে স্বাগত জানান। ব্রিটেনে পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে বিরোধীপক্ষ সরকার পক্ষের ত্রুটি প্রদর্শন করিতে সদা ব্যাগ্র, বাহিরে সংবাদপত্র সমূহ ক্রেতাসমাজের তুষ্টির খাতিরেই সর্বপ্রকার সংবাদ প্রচারে সদা উন্মুখ এবং পাঁচ-বৎসরের ভিতর জনসাধারণের সম্মুখে ভোট-ভিক্ষায় পুনরায় উপস্থিত হইবার সমস্যায় উদ্বিগ্ন ক্যাবিনেট সদা-সতর্ক থাকে। পার্লামেন্টের ভিতর ক্যাবিনেটের সমালোচকগণ (১) প্রশ্ন করিয়া, (২) নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনিয়া ও (৩) অনাস্থাপ্রস্তাব আনিয়া ক্যাবিনেটকে কৃত কার্যের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য করে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিসন, সমালোচনা ও তাহার জবাবকে জনসাধারণের সম্মুখে বহন করিয়া লইয়া যায়। এই অবস্থায় সজাগ ও সতেজ জনমত ও প্রবল গণআন্দোলনের সম্মুখে ক্যাবিনেটের আকাশ-চুম্বী প্রতিজ্ঞা ও দম্ভ বিন্ধ্যপর্বতের মতই মাথা নোয়াইতে বাধ্য হয়। প্রকৃতই,

* "Thus it is sometimes charged that Great Britain practices a "plebiscitary democracy" in which people vote "yes" or "no" on the record of government in general but are deprived of any share in the formulation of individual policies." Carter, Herz Ranney—Major Foreign Powers.

শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ মিলিবে না, তাহাকে খুঁজিতে হইবে গণচেতনা ও গণআন্দোলনের মধ্যে।

প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister): প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে অন্য আলোচনার প্রসঙ্গে ছাড়া এতক্ষণ বিশেষ কিছু বলা হয় নাই মূলতঃ এই কারণেই যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁহার গুরুত্ব এত অধিক যে তাহার স্বতন্ত্র বিচার প্রয়োজন। বস্তুতঃ পূর্বে ব্যবহৃত তোরণের উপমা যদি পুনরায় উপস্থিত করা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে প্রধানমন্ত্রী হইলেন ক্যাবিনেট তোরণের কেন্দ্রপ্রস্তর (Keystone of the Cabinet-arch)। কেন্দ্রপ্রস্তর যেমন তোরণকে দাঁড় করাইয়া রাখে, ঠিক তেমনই প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরিয়া ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব বজায় থাকে।

ক্ষমতা ও মর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর স্থান অসামান্য হইলেও প্রায় ২০০ বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ আইনে তাঁহার কোন স্বীকৃতিই ছিল না। ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রী আইনে প্রথম প্রধানমন্ত্রী পদের নামোল্লেখ হইল ; কিন্তু সেখানেও তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, সরকারী কোষাগারের প্রথম লর্ড *(First Lord of the Treasury)* হিসাবে।

বস্তুতঃ ক্যাবিনেটের মতই প্রচলিত রীতিনীতির দ্বারা, প্রধানমন্ত্রীরও স্থানে নির্ণীত হইয়াছে। আর ক্যাবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৩২ সালের আইনে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রসারের ফলে ব্রিটেনের রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্র পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে। ১৮৩৪ সালে স্যার রবার্ট পীল তাঁহার বন্ধুদিগকে নির্বাচন করিবার জন্য ভোটার-দিগের নিকট যে আবেদন প্রচার করেন, যাহা ট্যামওয়ার্থ ইশ্‌তেহার (Tamworth Manifesto) নামে প্রচলিত, তখন হইতেই দলীয় নামের গুরুত্ব বাড়িতে থাকে, আর তাহারই সাথে বাড়ে দলের নেতার গুরুত্ব। ১৮৬৫-১৮৮১ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে সাধারণ লোকে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে বিরোধ হিসাবে দেখিত না, প্রধানতঃ দেখিত গ্ল্যাডষ্টোন ও ডিজরেলি, এই দুই নেতার সঙ্ঘর্ষ হিসাবে। বর্তমান যুগেও সাধারণ নির্বাচন প্রধানতঃ দুই ভাবী প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইবার জন্য গণভোট হিসাবেই দেখা দেয়। ("There is a real sense in which a general election is nothing so much as a plebiscite between alternative Prime Ministers."—Laski) ফলে সমগ্র জাতির দৃষ্টিতে যে মর্যাদার আসনে

তিনি অভিষিক্ত হন, তাহাকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা অপর কোন ক্যাবিনেট সদস্যের থাকে না।

প্রধানমন্ত্রীকে primus inter pares বা সমমর্যাদাসম্পন্নদের মধ্যে প্রধান বলিয়া দীর্ঘকাল হইতেই বর্ণনা করিয়া আসা হইতেছে। কিন্তু এ বর্ণনায় বাস্তব চিত্র ফুটিয়া উঠে না। তত্ত্বের দিক হইতে অবশ্য রাজার উপদেষ্টা হিসাবে সকলেরই স্থান সমান; ইহাও ঠিক যে যদি ক্যাবিনেট সভায় তীব্র মতপার্থক্যের জন্য ভোটগ্রহণের ফলে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধ মত জয়লাভ করে, তবে সে মতই ক্যাবিনেটের মত বলিয়া গৃহীত হইবে, প্রধানমন্ত্রীর মত নহে। অর্থাৎ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট যেমন রাষ্ট্রপতির অনুচরমাত্র, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক সেরূপ নহে। তথাপি, ভুলিলে চলিবে না যে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন অনুযায়ী রাজা অপর ক্যাবিনেট সদস্যগণকে নিয়োগ করেন; প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করিলে অন্য যে কোন সদস্যকে ক্যাবিনেট হইতে অপসারিত করিতে পারেন। তিনি পদত্যাগ করিলে সমগ্র ক্যাবিনেট তো ভাঙ্গিয়া যাইবেই, উপরন্তু, রাজাকে কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দেওয়াও তাঁহার একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার। অন্য মন্ত্রিরা অসুবিধায় পড়িলে তাঁহার নিকটেই ছুটিয়া যান; বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিরোধের তিনিই মীমাংসা করেন। ক্যাবিনেটের আলোচ্যসূচী তিনিই রচনা করেন; সামগ্রিক নীতি-নির্ধারণে তাঁহার প্রাধান্য ও সমগ্র শাসন-পরিচালনা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হইতে সুরু করিয়া ক্যাবিনেট সভায় বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার মতামতই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে। কমন্সসভায় তিনি সরকারের মুখপাত্র, তাঁহার উক্তিই প্রামাণ্য। তাঁহার দলের নিকট, সমগ্র জাতির সম্মুখে, তিনি ক্যাবিনেটের ঐক্য ও ক্ষমতার মূর্ত প্রতীক। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলিতে, অন্যান্য দেশে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তিনিই ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার প্রধান। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলিতে গেলে "অন্যান্য মন্ত্রিরা কে কোথায় বাস করে তাহা কেহ জানেও না, তাহা লইয়া কেহ মাথাও ঘামায় না; কিন্তু অজ্ঞতম ব্যক্তির নিকটও ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটের তাৎপর্য সুস্পষ্ট।" ("No one knows, and no one cares, where other ministers dwell, but the innocent of innocents knows the meaning of 10 Downing Street."—Laski).

"সমমর্যাদাসম্পন্নদের মধ্যে প্রধান

সেই জন্যই জেনিংস বলিতেছেন: "শাসনতন্ত্রের সকল পথই প্রধানমন্ত্রীর

নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।...হারকোর্ট বলিয়াছেন যে ক্ষুদ্রতর তারকারাজির মধ্যে তিনি চন্দ্র। কিন্তু ক্ষুদ্রতর তারকার সহিত চন্দ্রের সম্পর্ক খোলা চোখে অন্ততঃ ধরা পড়ে না : প্রধানমন্ত্রী গ্রহমধ্যস্থ সূর্যের সহিতই তুলনীয়।*

প্রধানমন্ত্রীর অভিরুচি ও দক্ষতা অনুযায়ী পদের গুরুত্ব

কিন্তু এ্যাস্‌কুইথের মন্তব্যও এই সূত্রে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন: "পদাধিকারী যেরূপে ব্যবহার করিতে চান, প্রধানমন্ত্রীর পদ সেইরূপেই দেখা দিবে।" ("The office of the Prime Minister is what its holder chooses to make it.") অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব চরিত্র, রুচি, মেজাজ কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার উপর, সহকর্মী, পার্লামেণ্ট ও জনসাধারণের নিকট প্রধানমন্ত্রিত্ব বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়। কোন কোন প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মীদের উপর প্রভাব ও প্রাধান্য এত সুগভীর ছিল যে তাঁহাদের ইচ্ছাই সর্বদা বলবৎ হইয়াছে; আবার অনেক প্রধানমন্ত্রী 'দুর্বল' আখ্যা লাভ করিয়াছেন; স্বীয় মত জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া দূরের কথা, ক্যাবিনেটকে ঐক্যবদ্ধরূপে পরিচালনা করাই তাঁহাদের নিকট চূড়ান্ত সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে। গ্ল্যাডষ্টোনের সহকর্মিরা সাধারণতঃ তাঁহার বিরোধিতা করিতেন না। লর্ড সল্‌সবেরিকে (Lord Salisbery) সহকর্মিদের সামলাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত; আর লর্ড রোজবেরি (Lord Reseberry) এ কাজ একেবারেই পারিতেন না। ডিজ্‌রেলি প্রায় সকলের মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে খাটাইতে পারিতেন। স্যার রবার্ট্‌ পীল সমস্ত দপ্তরের কাজকর্মের উপর নজর রাখিতেন; আর এ্যাসকুইথের মতে তাহা ছিল অসম্ভব প্রয়াস, সুতরাং সে চেষ্টাও তিনি করিতেন না। বস্তুতঃ চারিত্রিক গুণের বিভিন্নতার উপর পদের গুরুত্ব বহু পরিমাণে নির্ভর করে। কর্মদক্ষতা, বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ, সভাপতির কার্যে পারদর্শিতা, দ্রুত কাজ করিবার ক্ষমতা, প্রধান ও অপ্রধান বিষয়ে প্রভেদ করিবার ক্ষমতা, প্রভৃতি বিভিন্ন গুণের সমাবেশ হওয়া বা না-হওয়ার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদের তারতম্য লক্ষ্য করা যাইবে।

* "All roads in the constitution lead to the Prime Minister ....Harcourt said that he was a moon among lesser stars, but the lesser stars—as they seem to the naked eye—have no connexion with the moon: and the Prime Minister is much more like the sun among the planets."

Jennings: The Queen's Government. p. 140.

ইহা ঠিকই যে যুদ্ধের সময় চার্চিল যে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর শান্তির সময়ে এটলীর নিকট তাহা আশা করা যায় না। তবে ইহার জন্য পরিবেশই একান্ত দায়ী নয়, চরিত্রগত পার্থক্যও নিশ্চয়ই অংশতঃ দায়ী। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে প্রধানমন্ত্রীর পদটি এমনই যে এ আসনে বসিলে অত্যন্ত শান্ত মানুষেরও কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যসূচক ব্যবহার অনিবার্য হইয়া পড়ে।* যুদ্ধের পূর্বে, চার্চিলের তুলনায় অনেক কম জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও, চেম্বারলেন তাঁহার স্বকীয় মত জোর করিয়া খাটাইয়া গিয়াছেন। বহু সময়ে ক্যাবিনেটের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইডেন বা ডাফ্-কুপারের মত মন্ত্রিদের অতি সহজে ক্যাবিনেট হইতে বিদায় দিয়াছেন; সে জন্য তাঁহার নেতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এমন কি বল্ডুইনের ন্যায় তথাকথিত 'দুর্বল' প্রধানমন্ত্রীও গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্যের সময়ে স্বকীয় মতকেই কার্যকরী করিয়াছেন। এটলীর প্রয়োজনে নির্মমভাবে স্বমতাকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার

দেশ শাসন করে ক্যাবিনেট এবং ক্যাবিনেটের অবিসংবাদী নেতা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারের প্রধান হিসাবে তাঁহাকে বিশাল দায়িত্ব পালন করিতে হয় বিভিন্ন ভূমিকায়।

দলের সহিত সম্পর্ক

প্রথমতঃ, তিনি তাঁহার দলের নেতা। এই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপরেই তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্ব নির্ভর করে। সুতরাং দলীয় ঐক্য বজায় রাখা তাঁহার অন্যতম প্রধান কাজ। সদস্যদের সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। ক্যাবিনেটের অনুসৃত নীতি দলের মনঃপূত হওয়া চাই। সব দলেই চরমপন্থী ও নরমপন্থী মনোভাবের বিরোধ থাকে। এই দুই মনোভাবের কোন অংশকেই ক্ষুব্ধ না করিয়া সকলের গ্রহণযোগ্য নীতি নির্ণয় করিতে হইবে এবং তাহারই সহিত দেখিতে হইবে যে সে নীতি যেন ব্যাপক জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না যায়। এ দায়িত্ব অবশ্য দলের সামগ্রিক নেতৃত্বের, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করিয়া রক্ষণশীল দলের মধ্যে। কারণ, শ্রমিক দলের নেতৃত্ব অনেক বেশী সংগঠিত ও সুনিশ্চিত; তুলনায় রক্ষণশীল দল নেতার মুখাপেক্ষী আরও অধিক। ইহা ছাড়াও, দলের মধ্যে নানা উপদল রহিয়াছে, রহিয়াছে ছোট-

*.. ...The office itself creates a certain patterns of behaviour for even the most quiet personality. Carter, Herz, Rannney. Major Foreign Powers

বড় নানা নেতা। সমস্ত নেতাদের উপযুক্ত পদ, মর্যাদা ও দায়িত্ব দিয়া দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে হইবে। দলীয় পার্লামেণ্ট সদস্যদেরও ব্যক্তিগত অভিযোগ ও চাহিদা সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হইবে। সর্বোপরি বিদ্রোহের চিহ্ন দেখিলে তাহাকে সামলাইবার মত প্রয়োজনে দৃঢ়তা বা নমনীয়তা দেখাইতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেণ্ট

দ্বিতীয়তঃ, তিনি পার্লামেণ্টেরও নেতা। সুতরাং পার্লামেণ্টের প্রতি তাঁহাকে সদা-সতর্ক মনোযোগ দিতে হইবে। শুধু চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বিরোধী দলের প্রশ্ন, সন্দেহ, ও অভিযোগের যথাযোগ্য জবাব দিতে পারা চাই। মনে রাখিতে হইবে যে সারা দেশের কান পাতা রহিয়াছে পার্লামেণ্টের কার্যবলীর উপর। তীক্ষ্ণ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিরোধী দলকে সাময়িকভাবে জব্দ করিয়া দিতে পারিলেই হইল না; পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি সমগ্র জাতির নিকট সরকারের কার্যের জবাবদিহি করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার ধৈর্য, স্থৈর্য, উদারতার পরিচয়ও লোকে পাইতে চাহিবে। বিশেষ

বিরোধী দলের সহিত সম্পর্ক

করিয়া, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিরোধীদলকে যে গুরুত্ব দেয়, সে বিচারে বিরোধী দলের সহিত তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিরোধী দলের অধিকার যথাযথ বজায় রাখার দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁহারই।

৩। জনসাধারণের সহিত সম্পর্ক

তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের সম্মুখে তিনি দ্বৈত ভূমিকায় উপস্থিত হয়। কারণ, জনতা তাঁহাকে শুধু দলের নেতা নয়, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জাতির নেতা রূপেও দেখিয়া থাকে। সুতরাং শুধু পার্লামেণ্ট নহে; সভা-সমিতির বক্তৃতা, সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতির রেডিও ও টেলিভিসনে ভাষণ,—সর্বত্রই তাঁহাকে এমন রূপে উপস্থিত হইতে হইবে যে তাঁহার উপর জনতার ভরসা ও আস্থা যেন অটুট থাকে। তাঁহার পক্ষ হইতে, ক্যাবিনেটের তরণীর কর্ণধার হিসাবে, জনমতের জোয়ার-ভাঁটা শুধু নয়, প্রতিটি বালুর-চড়া বা ঘূর্ণিপাকের সন্ধান রাখিতে হইবে; নহিলে ভরাডুবি হইবার সম্ভাবনা। উপমা পাল্টাইয়া বলা যায়, ক্যাবিনেটের প্রাসাদকে খাড়া রাখিতে গেলে মাটিতে সর্বদা কান পাতিয়া থাকিতে হইবে, জনমতের মৃদুতম ভূকম্পনও যাহাতে সময়মত জানিতে পারা যায়।

চতুর্থতঃ, তিনি ক্যাবিনেটের প্রধান, সভার সভাপতি। উপযুক্ত লোক বাছাই করিয়া ক্যাবিনেট গঠন করিতে হইবে; ক্যাবিনেট সদস্যগণের বিভিন্ন মতকে একই খাতে বহাইতে হইবে; তাহাদের পারস্পরিক ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব মিটাইতে হইবে; তাহাদের নিজস্ব দপ্তর চালাইতে অসুবিধায় সাহায্য করিতে হইবে; পার্লামেণ্টে বিরোধীপক্ষের আক্রমণে বিপদগ্রস্ত সমকর্মীর সহায়তায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। যে সকল বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানী, গুণী, বয়স্ক, মেজাজী লোকের সমাবেশ হয় ক্যাবিনেট সভায়, তাহাদের দিয়া অল্পসময়ের মধ্যে কার্যকরী সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া আনাও বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক। উপরন্তু মনে রাখিতে হইবে ক্যাবিনেটের সদস্যদের ভিতরেই এমন একাধিক লোক আছেন, যিনি তাঁহার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর স্থান হয়ত গ্রহণ করিতে পারিতেন বা পারেন। সুতরাং প্রত্যেককে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হইবে; আবার প্রয়োজন হইলে দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র দমন করিবার মত দৃঢ়তাও অবলম্বন করিতে হইবে।

৪। ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যদের সহিত সম্পর্ক

পঞ্চমতঃ, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সরকারের কার্যপ্রণালী এবং বিভিন্ন দপ্তরের সহস্র কর্মধারার ভিতর রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সঠিকভাবে পরিচালনার জ্ঞান ও দৃঢ়তা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য। কারণ, তিনি সর্ববিধ সরকারী কার্যের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ।

৫। শাসন বিভাগের সহিত সম্পর্ক

ষষ্ঠতঃ, রাজার সহিত সরকারী কার্য্যের যোগসূত্র হইলেন তিনিই; এবং রাজা যদি স্বীয় দায়িত্ব পালনে আগ্রহশীল ও সক্রিয় হন, তাহা হইলে ইহা যে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একটি গুরুভার তাহা অনস্বীকার্য।

স্বভাবতঃই এত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করিতে একদেহে যত গুণাবলীর সংমিশ্রণ প্রয়োজন তাহা বাস্তবে কদাচিৎ দেখা যায়। তথাপি, প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পার্থক্য করিতে পারা ও মূল নীতিকে উপস্থিত করার ক্ষমতা এবং তাহাকে কার্যকরী করিতে গেলে কোন কোন বস্তুর চাহিদা রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারার মত বাস্তবতাবোধ প্রধানমন্ত্রীর থাকা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। সর্বোপরি প্রয়োজন মানুষ চিনিতে পারা এবং মানুষকে কাজে লাগাইতে পারার ক্ষমতা। কারণ, শেষপর্যন্ত দেখিলে মানিতে হইবে যে মানুষ চালানোই তাঁহার প্রধান কাজ।

বহুদিনের শিক্ষানবিশীর ভিতর দিয়া প্রধানমন্ত্রীর গুণাবলী আয়ত্ত হয়। ১৭২২ হইতে ১৯৫৪ সাল এই ২৩২ বৎসরের মধ্যে ৪২ জনকে ব্রিটেনের প্রধান-মন্ত্রিত্ব করিতে দেখা গিয়াছে। ঘুরিয়া-ফিরিয়া ৬০টি ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব তাঁহারা করিয়াছেন। ১৩ জন দুইবার প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন, ২ জন তিনবার এবং ১ জন (গ্ল্যাডষ্টোন) চার বার। ইঁহাদের মধ্যে ২৫ জন ছিলেন নিজে লর্ড বা লর্ড পরিবারভুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে ৩৪ জন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং তাঁহারাও প্রায় সকলেই অক্সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। ইঁহারা প্রায় সকলেই অল্প বয়স হইতেই রাষ্ট্রনীতির সাধনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১১ জন পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়াছেন ২১ বৎসর বয়সে, যদিও সকলের গড়পড়তা হিসাবে পার্লামেণ্টে প্রবেশের বয়স হয় প্রায় ২৫ বৎসর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের বয়স হইল গড়ে ৫০ বৎসর। সুতরাং এই ২৫ বৎসরের পার্লামেণ্ট ও শাসনসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রীকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। এই ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি বারবার নির্বাচনে লড়িয়াছেন, পার্লামেণ্টের ভিতর বিতর্কে স্বীয় দক্ষতা প্রমাণ করিয়াছেন, প্রথম সারির বিরোধী সদস্য হিসাবে অথবা ক্ষুদে মন্ত্রী হিসাবে শাসন পরিচালনা অনুধাবন করিয়াছেন। জনতার বিচার, সংবাদ-পত্রের সমালোচনা, বিরোধীদলের আক্রমণ, দলীয় সদস্য ও নেতৃবৃন্দের সন্ধানী নির্বাচনের ছাঁকনি পার হইয়া তবেই প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করা সম্ভব হয়।

এই সূত্রে তুলনামূলকভাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কথা মনে পড়ে। লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে সাধারণতঃ সেরা রাষ্ট্রনৈতিক নেতাকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদে দেখা যায় না। ওয়াশিংটন, জেফারসন, ম্যাডিসন, জ্যাকসন, লিংকন ও ক্লিভল্যাণ্ড ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রপতিগণ প্রথম সারির নেতা ছিলেন না। নিতান্ত পদমর্যাদার কারণ ভিন্ন, অনেক রাষ্ট্রপতিকেই মনে রাখার অন্য কোন যুক্তি ছিল না। ল্যাসকি বলিতেছেন যে ১৮৬৮ সাল হইতে ব্রিটেনে যত প্রধানমন্ত্রী আসিয়াছেন তাহার মধ্যে এক স্যার হেন্‌রি ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান (Sir Henry Campbell Bannerman) ছাড়া আর সকলেই অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। তুলনায় আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর হইতে যে ১৪ জন রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করিয়াছেন, ব্রিটিশ পদ্ধতিতে তাঁহাদের ভিতর অধিকপক্ষে চারজন এই উচ্চপদে পৌঁছিতে পারিতেন। ল্যাসকির মতে কমন্সসভার ভিতর দিয়া বাছাই করিবার পদ্ধতিতেই এই শুভফল পাওয়া যায়

(the selecting function of the House of Commons) ।* স্বভাবতঃই অনেক মার্কিন লেখকই এ অভিযোগ স্বীকার করেন না। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে তাঁহারাও অনেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উদাহরণ উপস্থিত করেন যাঁহাদের স্মরণ করিবার মত বিশেষ কোন যোগ্যতা নাই। উপরন্তু ব্রিটিশ পদ্ধতির সমলোচনায় বলা হয় যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী স্বাধীনমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ দলীয় নেতাদের অনুগামী না হওয়ার ফলে নেতৃত্বের বাহিরেই চিরকাল কাটাইতে বাধ্য হন।

এ বিতর্ক বাদ দিলেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার কিছুটা তুলনামূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এই চারবৎসরের মধ্যে আইনসভা তাঁহাকে গদিচ্যুত করিতে পারে না। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে নিজস্ব-নীতি কার্যে প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাঁহার থাকে। তুলনায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল পার্লামেণ্টের মর্জির উপর নির্ভরশীল; সুতরাং অনির্দিষ্টতার দুষ্টগ্রহ তাঁহার কার্যকারিতা কিছুটা পরিমাণে সীমিত করিয়া দেয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগামী। ক্যাবিনেটের সদস্যদের মতামতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি চলিতে পারেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর অধস্তন কর্মচারীমাত্র নহেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের মতামত উপেক্ষা করিতে পারেন না। ক্যাবিনেট সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র শাসন করে, তিনি একক করেন না। সুতরাং ক্যাবিনেটকে সঙ্গে করিয়াই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির ন্যায় ক্যাবিনেট সদস্য মনোনয়নে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন; তিনি যে কোন সহকর্মীকে ইচ্ছামত বিতাড়ণও করিতে পারেন না। কারণ ক্যাবিনেটে ভাঙ্গন যদি দলীয় সংহতিতে ভাঙ্গন ধরায় তাহা হইলে তাঁহার আসনই বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

কিন্তু বিপরীত দিক হইতে বলা যায় যে দলীয় সংগঠন ও শৃঙ্খলার বৃদ্ধির ফলে, কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা যথেষ্ট নিশ্চিত এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালও মোটামুটি নির্দিষ্ট। আবার ক্যাবিনেটকে বাদ দিয়া প্রধানমন্ত্রীর যেমন একলা চলিবার উপায় নাই, তেমনি ক্যাবিনেটের উপর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও

* Laski : Parliamentary Government in England. p. 243

কর্তৃত্ব আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে ছাড়াইয়া উঠেন কমন্সসভার উপর কর্তৃত্বের মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী। রাষ্ট্রপতি নানা কৌশলে আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেও, কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করিতে পারে এবং অনেক সময়েই করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রিটেনে কমন্সসভা ক্যাবিনেট, তথা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব অনুসরণ করিবে। সুতরাং ক্যাবিনেটের সমর্থন পাইলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রপতি অপেক্ষাও শক্তিশালী ("The Prime Minister is mightier than the American President if he can carry the cabinet with him and then convince Parliament"—Finer)।

পঞ্চম অধ্যায়

শাসনবিভাগের পরিচালনা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও দেশ শাসনের মূল কথা ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। কিন্তু একদিকে শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতি ও অপরদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিশেষ করিয়া, শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং পার্লামেন্টের সংশোধনের ভিতর দিয়া গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে, সরকারের কার্যভারের অভাবনীয় বৃদ্ধি ঘটে। বস্তুতঃ, সরকারের সম্ভাব্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক চেতনায় মৌলিক পরিবর্তন সুরু হইয়া যায়। শহরে জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির ফলে সাধারণ নাগরিকগণ দাবি করিতে থাকেন যে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। শিশু-শ্রমিক ও নারী শ্রমিকের অমানুষিক শোষণ সাধারণ মানুষের বিবেককে বিচলিত করিয়া তুলে; শ্রমিকগণ সাধারণভাবেই বিপজ্জনক কর্মে নিরাপত্তা, সংগঠনের অধিকার এবং যৌথচুক্তির (collective bargaining) অধিকার দাবি করিতে থাকেন। শিল্পপতিরা চাহেন, নিবারণমূলক শুল্কব্যবস্থা ও অন্যান্য সরকারী সাহায্য। দেখিতে দেখিতে উনবিংশ শতাব্দীর ভিতরেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য শ্রমসম্পর্ক প্রভৃতি নানা দিকে সরকারী কর্মোদ্যোগ বিস্তৃত হইতে থাকে ও

তাহারই সাথে সাথে বাড়িতে থাকে সরকারী দপ্তর ও সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা। সেই সরকারী কর্মোদ্যমের ধারা এ শতাব্দীতে শুধু অব্যাহত থাকে নাই, ক্রমেই বিস্তারলাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের সর্বগ্রাসী দাবী জাতীয় জীবনের প্রায় সকল কর্মেই সরকারকে জড়িত করিয়াছে। মহাযুদ্ধোত্তর ব্রিটেন একদিকে কল্যাণকর রাষ্ট্রের (welfare state) নীতি গ্রহণ করিয়াছে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সঙ্কটমুক্তির জন্য, কিছু পরিমাণে হইলেও, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। উপরন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে শ্রমিকদলের ক্যাবিনেটের বিশিষ্ট অবদান হইল জাতীয়করণের কর্মসূচী ও তাহারই ফলস্বরূপ কয়েকটি ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানার প্রতিষ্ঠা। মোটামুটি সরকারই আজ ব্রিটেনের বৃহত্তম নিয়োগকর্তা। ১৮৩২ সালে সরকারের দ্বারা নিযুক্ত কেরাণী ও উর্ধ্বতন কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২১,৩০৫ ; ১৯৫২ সালের ১লা এপ্রিল ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৬,৮৩,৯৯৮ ; তাহার সহিত শ্রমশিল্পে নিযুক্ত ৪,১৩,০০০ সরকারী শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা যোগ করিলে পরিবর্তিত অবস্থা অনুধাবন করা সম্ভব হইবে।

সরকারী কার্যভার সংগঠনের পদ্ধতি জটিল ও বিভিন্ন। অর্থকোষ (Treasury), নৌবিভাগ (Admiralty) প্রভৃতি বিভাগ বহু প্রাচীনকালের ঐতিহ্য বহন করিতেছে। পররাষ্ট্র বিভাগ (Foreign Office), স্বরাষ্ট্র বিভাগ (Home Office), প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগ রাজার নিজস্ব সচিবের দপ্তর (Secretariat of State) ভাঙ্গিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। বাণিজ্য বোর্ড (Board of Trade), শিক্ষা দপ্তর (Ministry of Education) প্রভৃতি কিছু কিছু বিভাগ প্রিভি কাউন্সিলের কমিটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আবার স্বাস্থ্য দপ্তর (Ministry of Health), যানবাহন দপ্তর (Ministry of (Transport), প্রতিরক্ষা দপ্তর Ministry of Defence), প্রভৃতি, পার্লামেন্ট প্রণীত আইন হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। এত বিভিন্ন দপ্তরের নামে যেমন সমানুবর্তিতা (Uniformity) নাই, তেমনি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অংশে, যেমন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডে পরিচালনা পদ্ধতিও এক নহে। আসলে, সমগ্র ব্যবস্থাই পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে এবং করিয়া চলিতেছে।

কিন্তু এত বৈচিত্র্যের ভিতরও শাসনপদ্ধতিতে মৌলিক সঙ্গতি রহিয়াছে। প্রতিটি বিভাগেরই শীর্ষে অবস্থিত একজন মন্ত্রী। যাঁহার কর্মভারের ভিত্তি

হইল রাষ্ট্রনৈতিক। কমন্সসভায় দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সূত্রে ইঁহারা কর্তৃত্বভার পাইয়াছেন। ইঁহারা বাস্তব রাষ্ট্রনীতিবিদ্, শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ নহেন। শাসনতান্ত্রিক বিভাগের সামগ্রিক কার্যের তত্ত্বাবধান ও সামঞ্জস্যবিধান ইঁহাদের দায়িত্ব; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে দায়িত্ব ইঁহারা পালন করেন, তাহা হইল, বিভাগীয় কার্যকে সরকারের সামগ্রিক কার্যসূচীর সহিত এবং পার্লামেণ্ট তথা জনসাধারণের চিন্তা-ভাবনার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা।

মন্ত্রীর অব্যবহিত নিম্নে স্থানে হইল স্থায়ী বিভাগীয় সচিবের; ইঁহাকে বিভাগের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইঁহাকে শীর্ষে রাখিয়া নানা নামে পরিচিত নানা স্তরের কর্মচারিবৃন্দ বিভাগীয় কার্যে নিযুক্ত থাকেন। ইঁহারা সরকারের নীতিকে কার্যে পরিণত করেন। মন্ত্রী বা পার্লামেণ্টারী সচিবের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে মন্ত্রীমহাশয়ের কর্মকাল সীমিত · স্থায়ী সচিবের চাকুরী স্থায়ী; বিভাগীয় কার্য সম্পর্কে মন্ত্রীর জ্ঞান যে কোন সাধারণ মানুষের জ্ঞান অপেক্ষা বেশী নহে, স্থায়ী সচিব বিভাগীয় কার্যে বিশেষজ্ঞ: মন্ত্রীর এবিষয়ে অভিজ্ঞতা হয় কিছুই-নাই, থাকিলেও তাহা সামান্য; পক্ষান্তরে স্থায়ী সচিবের অভিজ্ঞতা দীর্ঘকালীন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মন্ত্রীমহাশয়কেই কেন্দ্রীয় দায়িত্বে বসান হয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে দপ্তর চালাইবার জন্য নহে; তাঁহার দায়িত্ব হইল পার্লামেণ্টের ভিতর উচ্চারিত ও ঘোষিত জনসাধারণের ইচ্ছার দ্বারা সরকারী দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া একই অভিপ্রেত লক্ষ্যে বিভাগীয় কর্মকাণ্ডকে লইয়া যাওয়া। তাহার জন্য বিশেষজ্ঞ হইবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদিগের আনুগত্য লাভ করিবার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ব্রিটিশ স্থায়ী চাকুরিয়াদের এ সম্বন্ধে সুনাম আছে।

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বিষয় নিম্নে আলোচিত হইল:

কোষাগার বা অর্থদপ্তর; কার্যাবলী

বিভাগীয় দপ্তরগুলির মধ্যে কোষাগারের বা অর্থদপ্তরের (Treasury) প্রাধান্য সর্বব্যাপক। স্বভাবতঃই অর্থব্যয় না করিলে কাজ চালানো যায় না, এবং অর্থদপ্তরের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট কেহ কিছু খরচ করিতে পারে না। ইহা ছাড়াও অন্যান্য বহুদিক হইতে অর্থদপ্তরের প্রাধান্য নির্ধারিত হইয়াছে। অর্থদপ্তর, অন্যান্য সকল দপ্তরের সহায়তায়, আগামী বৎসরের

জন্য সরকারের সামগ্রিক আয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করে। সমস্ত তথ্য ও সুপারিশ দপ্তরের রাষ্ট্রনৈতিক প্রধান বা অর্থমন্ত্রীর (Chancellor of the Exchequer) মারফৎ পার্লামেন্টের সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সে সম্মতি আসিয়া যায়; কারণ অর্থবিষয়ে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। রাজস্ব-আদায়, মুদ্রা প্রস্তুত করা ও নোট ছাপা, সরকারের ঋণ গ্রহণ ও সমগ্র সরকারী তহবিলের নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এই বিভাগের উপর। পার্লামেণ্ট যত পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন দপ্তরকে ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছে, প্রতিটি দপ্তর তাহার কতখানি, কোন কোন সর্তানুযায়ী ব্যয় করিবে তাহাও অর্থদপ্তর নির্ণয় করিয়া দেয়; কারণ পার্লামেণ্ট কত টাকা ব্যয় করিবার অধিকার দিয়াছে তাহার সবটুকুই ব্যয় করিতে হইবে এ নীতি স্বীকৃত হয় না। (কথিত আছে, অসহায় ব্রিটিশ করদাতার কথা চিন্তা করিয়া অর্থদপ্তরের স্থায়ী সচিব বিনিদ্র রজনী যাপন করেন।) একজন অরাজনৈতিক কণ্ট্রোলার এণ্ড অডিটার জেনারেল (Controller and Auditor-General)-এর অধীনে সংগঠিত অর্থদপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট অথচ স্বতন্ত্র, হিসাব পরীক্ষক বিভাগের (Exchequer and Audit Department) মারফৎ দেখা হয় যে বিভিন্ন দপ্তর হইতে সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় করিবার জন্য অর্থের চাহিদার পিছনে পার্লামেণ্টের সম্মতি রহিয়াছে। এই বিভাগই পুনরায় হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখে যে প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্টের সম্মতির ভিত্তিতেই ব্যয় করা হইয়াছে কিনা। অর্থ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে অর্থদপ্তর অন্যান্য সকল ব্যয়কারী দপ্তরের (spending departments) সংগঠন ও কর্মচারিবৃন্দের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করিয়া থাকে এবং স্থায়ী চাকুরিয়াদের বেতন ও কার্যের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করে।

পরিচালনা

কাগজে পত্রে অর্থদপ্তরের পরিচালনা করে পাঁচজন লইয়া গঠিত ট্রেজারী বোর্ড। আইনতঃ প্রধানমন্ত্রী হইলেন ট্রেজারী বোর্ডের প্রথম লর্ড (First Lord of the Treasury Board) এবং তিনি এই পদাধিকারেই নিজস্ব বেতন পান। কিন্তু বোর্ডের কোন সভা হয় না এবং প্রকৃতপক্ষে অর্থদপ্তরের পরিচালনাভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত থাকে বোর্ডের দ্বিতীয় লর্ড, চ্যান্সেলের অফ দি এক্সচেকার (Chancellor of the Exchequer) বা অর্থমন্ত্রীর উপর। তাঁহারই দায়িত্ব হইল আগামী বৎসরের

আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (Budget) পার্লামেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত করা, পার্লামেণ্টে সকল প্রকার অর্থ-সংক্রান্ত 'বিলের' পরিচালনা করা, টাঁকসালের প্রধান হিসাবে কার্য করা ও রাজস্ব-সংগ্রহের তত্ত্বাবধান করা। তাঁহার সহকারী হিসাবে আরও তিনচারজন পার্লমেণ্টারী সচিব থাকেন।

সরকারের রাজস্ব সংগৃহীত হয় চারটি প্রধান সহকারী বিভাগ হইতে, যথা, (১) আভ্যন্তরীণ রাজস্ব বোর্ড (Board of Inland Revenue), (২) আগম-নিগম শুল্ক ও আবগারী শুল্ক বোর্ড (The Board of Customs and Excise), (৩) পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের দায়িত্ব ইহার, এবং (৪) রাজকীয় ভূমি-কমিশনারগণ (the Commissioners of Crown lands)। সমস্ত রাজস্ব জমা পড়ে প্রধানত: একটি সংবদ্ধ তহবিলে (a single consolidated fund) এবং সেই তহবিল হইতেই ব্যয়ের জন্য অর্থ বণ্টন করা হয়। অধিকাংশ করই স্থায়ী আইনের দ্বারা নির্ধারিত; কতকগুলি কর প্রতিবৎসর নূতন করিয়া বসান হয়। সেই মতই কতকগুলি ব্যয় স্থায়ী আইনের দ্বারা নির্ধারিত রহিয়াছে আবার কতকগুলি ব্যয় প্রতিবৎসর নূতন আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

রাজস্ব ও 'সংবদ্ধ তহবিল'

প্রতিরক্ষা দপ্তর (Defence Department) প্রধানত: নৌবিভাগ (the Admiralty), যুদ্ধ-দপ্তর (War Office) এবং বিমান দপ্তর (Air Ministry) লইয়া গঠিত। প্রতিটি দপ্তর স্বতন্ত্র মন্ত্রিদের পরিচালনাধীন থাকিলেও, এই তিনটি মিলাইয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রীই ক্যাবিনেটের সদস্য।

অন্যান্য দপ্তর; প্রতিরক্ষা

পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যাদির পরিচালনার ভার পররাষ্ট্র দপ্তর (Foreign Office) ও পররাষ্ট্র সচিবের। পূর্বে কমনওয়েলথ সম্পর্কীয় দপ্তর ও ঔপনিবেশিক দপ্তর (Colonial Office) স্বতন্ত্র ছিল। সম্প্রতিকালে দুইটিকে একত্রে মিলাইয়া একজন মন্ত্রীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

বৈদেশিক বিভাগ ও কমন-ওয়েলথ সম্বন্ধীয় বিভাগ

অন্যান্য দপ্তরে বণ্টিত হয় নাই এইরূপ নানাবিধ কার্যভারের দায়িত্ব বহন করে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Office)। রাজদরবারে প্রেরিত আবেদনপত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করা, রাজকীয় মার্জনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, নির্বাচনের তত্ত্বাবধান করা, বিদেশীকে নাগরিকত্ব প্রদান করা, খাস লণ্ডনের পুলিস বিভাগের

আভ্যন্তরীণ, সমাজসেবা ও অর্থনৈতিক দপ্তর

তত্ত্বাবধান করা, সমগ্র পুলিস বিভাগের মাননির্ণয় করা ও পরিদর্শন করা, প্রভৃতি অগণিত দায়িত্ব এই দপ্তরকেই বহন করিতে হয়।

নিম্নে অন্যান্য গুরুত্বশীল দপ্তরগুলির নামোল্লেখ করা গেল: যথা, বাণিজ্য বোর্ড (Board of Trade), প্রকৃতপক্ষে একজন মন্ত্রীর নির্দেশেই পরিচালিত হয়; কৃষি ও মৎস্য বিভাগ (Ministry of Agriculture and Fisheries), শ্রমিক ও জাতীয়সেবা দপ্তর (Ministry of Labour and National Service), যানবাহন ও বেসামরিক বিমান দপ্তর (Ministry of Transport and Civil Aviation), স্বাস্থ্য দপ্তর (Ministry of Health), শিক্ষা দপ্তর (Ministry of Education), জাতীয় বীমা দপ্তর ও জাতীয় সাহায্য বোর্ড (Ministry of National Insurance and National Assistance Board) গৃহসংস্থান ও আঞ্চলিক শাসন বিভাগ (Ministry of Housing and Local Government) খাদ্য দপ্তর (Ministry of Food), পূর্ত দপ্তর প্রভৃতি।

শাসনবিভাগের কার্য সম্পর্কে আলোচনায় সংশ্লিষ্ট দুইটি সমস্যা উল্লেখ অপরিহার্য: (১) শাসনবিভাগীয় আইন-প্রণয়ন (Administrative Legislation) ও (২) শাসনবিভাগীয় বিচার (Administrative Adjudication)।

শাসনবিভাগীয় আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী হইতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের নানাদিকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম যেমন বাড়িয়া গেল, পার্লামেণ্টকেও ক্রমেই আইনের মূল ছকটি তৈয়ারী করিয়া তাহার বিশদ নিয়মকানুন প্রণয়নের ভার শাসনকর্তৃপক্ষের উপর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হইল। ১৯২৭ সালে দেখা যায় যে পার্লামেণ্ট যেখানে মাত্র ৫৩টি আইন প্রণয়ন করিয়াছে, সেখানে বিভিন্ন দপ্তর দ্বারা সৃষ্ট আইনসম্মত নিয়ম-কানুন ও হুকুমনামার সংখ্যা (statutory rules and orders) ১,৩৪৯। এমন কি ১৯৪৫ সালে শ্রমিক ক্যাবিনেটের পরিচালনাতেও পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের সংখ্যা ছিল ৬৬, কিন্তু শাসনবিভাগীয় আইনের সংখ্যা সেখানে ২,২৮৭। এই আইন-প্রণয়ন যে শুধুই 'অর্ডার্স ইন কাউন্সিলের' মারফৎ হয় তাহা নহে, বিভিন্ন দপ্তরের কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ (রেলবোর্ড, প্রভৃতি), বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষও পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্দেশ অনুযায়ী সরাসরি নিয়ম-কানুন প্রস্তুত করিয়া থাকে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, দুঃস্থ-সাহায্য, প্রভৃতি সর্ব ব্যাপারেই এই শাসনবিভাগীয় আইনের প্রাদুর্ভাব লক্ষণীয়।

এ অবস্থার উদ্ভবের কারণ হইল নিম্নরূপ : (১) আইনসভার সময়ের অভাব ; (২) আইনসভার নানা প্রকার জটিল বিষয়ে চূড়ান্ত মত দিবার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতারও অভাব ; (৩) আইনসভার অধিবেশন না-চলা-কালীন জরুরী কাজ চালাইবার প্রয়োজন শাসনবিভাগকেই মিটাইতে হয় ; (৪) শাসনবিভাগীয় নিয়ম-কানুন পরিবর্তন ও সংশোধনও সহজ ও দ্রুত।

এ পদ্ধতি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভাকে এক পাশে ঠেলিয়া শাসনবিভাগ কর্তৃক ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়াস বলিয়া অনেকেই অভিযোগ করিয়াছেন। এ বিতর্কে প্রবেশ না করিয়াও এ ব্যবস্থার পক্ষে কয়েকটি যুক্তি এখানে উপস্থিত করা গেল ; (১) পার্লামেণ্টের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিন্দুমাত্র খর্ব হয় নাই ; (২) বহু বিভাগীয় নিয়ম-কানুন পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের 'টেবিলে হাজির রাখা হয়' ("laid upon the table of the House") ৪০ দিনের জন্য যাহাতে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন ; (৩) পার্লামেণ্টের আইনের উপর বিচার-বিভাগের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও, শাসনবিভাগীয় নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আদালতে মামলা করা চলে এবং আদালত পার্লামেণ্টের আইনের নিরিখে নিয়ম-প্রণেতা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ার ও উপরোক্ত নিয়মের উদ্দেশ্য বিচার করিয়া দেখিতে পারেন এবং অসামঞ্জস্য দেখিলে নিয়ম বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

পার্লামেণ্টের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মারফৎই শাসনবিভাগীয় বিচারের (Administrative justice) উদ্ভব হইয়াছে। যথা, নানা গৃহসংস্থান আইনের মারফৎ বস্তির মালিকের সম্পত্তির অধিকার, শ্রমিকদের বাসস্থান, প্রভৃতি সম্পর্কে শাসন-বিভাগীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে আবেদনের স্থান নির্ধারিত হইয়াছে স্বাস্থ্য-দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তর নিয়মকানুন প্রস্তুত করিবেন এবং তদনুসারে বিভিন্ন আবেদনের চূড়ান্ত বিচার তাঁহারাই করিবেন ; এ সম্পর্কে অপর কোন আদালতে উপস্থিত হওয়া চলিবে না। বর্তমানে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরেরই এইরূপ বিচারের ক্ষমতা রহিয়াছে।

এ বিষয় লইয়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদ্ মহলে প্রচুর মতপার্থক্য রহিয়াছে। লর্ড হিউয়ার্ট (Lord Hewart) তাঁহার "নূতন স্বৈরতন্ত্র" (The New Despotism) নামক পুস্তকে উপরোক্ত উভয়বিধ ব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। আরও বহু সমালোচক নানা দৃষ্টিভঙ্গি হইতে এ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও আমরা বিতর্ক মুলতুবী রাখিয়া শুধুই

বর্তমান অবস্থার পক্ষে কয়েকটি যুক্তি হাজির করিলাম। (১) শাসন ও বিচার বরাবরই কিছুটা পরিমাণ পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ; (২) বিগত ১৩০ বৎসর ধরিয়া সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত আইনের উদ্ভব এ বন্দোবস্ত অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে ; (৩) এ আদালতের সম্মুখে সহজেই উপস্থিত হওয়া যায়, বিচারপদ্ধতি সরল, অর্থব্যয় কম, বিচার দ্রুত ; (৪) এ পর্যন্ত এ বিচারের মারফৎ মূল সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি অব্যাহত আছে বলিয়াই দাবি করা হয়।

সর্বশেষে পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা উল্লেখ প্রয়োজন। মন্ত্রীমহাশয় দপ্তরের কার্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও, দপ্তরের অন্যায়ের জন্য তাঁহাকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯৫৪ সালের ক্রিচেল ডাউনস মামলা স্মরণীয়। কৃষিবিভাগের অন্যায় ব্যবহার প্রমাণিত হইবার পর, শুধু দপ্তরের কর্মচারিদিগের ভিতরই কর্মভারের পরিবর্তন প্রভৃতি ঘটে নাই, বিভাগীয় মন্ত্রী, স্বয়ং এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবহিত না থাকা সত্ত্বেও, নিজ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া পার্লামেন্ট কক্ষেই পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। অবশ্য এ মামলায় জড়িত ব্যক্তিগণ যে ধৈর্য ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বিরল। এতখানি উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের অভাবে অন্যায় নির্দেশ বজায় থাকিবারই সম্ভাবনা।

স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারিবৃন্দ (Permanent Civil Service) সরকারের দৈনন্দিন কার্য এই স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দই চালাইয়া যান। সরকারের কার্য বৃদ্ধির সহিত সরকারী কর্মচারীদিগের যে পরিমাণ সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত স্থায়ী কর্মচারীর নিয়োগে সম্পূর্ণ অরাজকতা চলিত। উর্ধ্বতন, লাভ ও সম্মানজনক, আকাঙ্ক্ষিত পদে নিয়োগ নির্ভর করিত কর্তৃপক্ষের মর্জির উপর। সুতরাং দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ চরমে উঠিয়াছিল। প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণের কোন মূল্য ছিল না। ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া চাকুরী নির্ভর করিত। ফলে অনেক সময়েই অক্ষম ও অপদার্থ, কর্মচারীরা উচ্চপদে অধিষ্টিত থাকিত। অপরদিকে নিম্নতম চাকুরীতে যথোপযুক্ত উন্নতির সুযোগ না থাকাতে হতাশা ও কর্মে অনিচ্ছা প্রসার লাভ করিত। স্বভাবতঃই চিন্তাশীল মহলে এ অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উঠে। অন্যান্যদের ভিতর জন ব্রাইটের (John Bright) তীব্র শ্লেষ স্মরণীয়। বেসামরিক সরকারী চাকুরীকে "ব্রিটিশ অভিজাত সমাজের

সাহায্যের বহির্দপ্তর "(Outdoor Relief Department of the British aristocracy), বলিয়া তিনি অভিহিত করেন। নানাদিক হইতে তিক্ত সমালোচনার সম্মুখে সংশোধনের প্রথম পদক্ষেপ ঘটিল ১৮৫৫ সালে। চাকুরী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (competitive examinations) গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ বৎসর তিনজন সদস্য লইয়া সিভিল সার্ভিস কমিশন (Civil Service Commission) গঠিত হয়। গুণের ভিত্তিতে নিয়োগের ('merit system of appointment) প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এ ব্যবস্থার প্রণয়ন।

সিভিল সার্ভিস কমিশনের করণীয় হইল বিভিন্ন পদাধিকারী যোগ্যতার মান নির্ণয়, নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশদান। কোন কোন সর্ত পূরিত হইলে যোগ্যতার নিদর্শনপত্র প্রদান ও 'লণ্ডন গেজেটে' প্রকাশ করিতে পারিবেন তাহা নির্ধারণ। প্রার্থীগণকে সাধারণতঃ লিখিত ও মৌখিক (viva voce), উভয় পদ্ধতিতেই পরীক্ষা করা যায়।

যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী পাইবার পথে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কর্মচারী পাইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন: যথা, স্থায়িত্ব, (permanence) বেতন, (salary), চাকুরী-কালীন-শিক্ষা ব্যবস্থা (In-service training), পদোন্নতি (promotion.) প্রভৃতি।

ব্রিটেনে সরকারী কর্মচারীর সদ্-ব্যবহার কালীন চাকুরী নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ ("an official holds office during good behaviour") ; ৬০ বৎসর বয়স হইলে তিনি 'পেন্সন' (pension) লইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে পারেন এবং অবস্থা বিশেষে বিদায় গ্রহণের বয়স ৬০ হইতে ৬৫ বৎসর পর্যন্ত বাড়ানোও সম্ভব। বেতনের সমস্যা অবশ্য জটিল। উপযুক্ত কর্মচারী পাইতে হইলে বেসরকারী চাকুরীতে বা স্বাধীন বৃত্তিতে যে উপার্জন হইত তাহার সহিত তুলনীয় বেতনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সরকারী চাকুরীর অবশ্য বৈশিষ্ট্যমূলক সুবিধা ও অসুবিধা আছে: এখানে চাকুরীর স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত ; পদোন্নতির যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা থাকে ; সম্মানজনক সংযোগ স্থাপিত হয় ; বেসরকারী চাকুরীর কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা হইতে মুক্ত থাকা যায়। অপরদিকে এ চাকুরীতে বিশেষ নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হয় ; রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান সম্ভব নয় ; দ্রুত অর্থাগমের সুযোগ নাই। উপরোক্ত বিষয়গুলি স্মরণে রাখিয়া সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে নিম্নতন চাকুরীর বেতন

বেসরকারী চাকুরীর বেতনের তুলনায় ভালই, কিন্তু উচ্চতর পদে অনুরূপ দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ পদে বেসরকারী চাকুরীতে উপার্জন অধিক।

পদোন্নতি নির্ধারিত হয় পূর্ববর্তিতা, কার্যকালীন বৃত্তান্ত ও যোগ্যতার সাধারণ বিচারের দ্বারা ('seniority, service records, and appraisal of general ability')। নিম্নতম চাকুরী হইতে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে ; উচ্চস্তরে পদোন্নতি দপ্তরের প্রধানের বিচার ও সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করে। বৃহৎ দপ্তরগুলিতে পদোন্নতি সম্পর্কীয় 'বোর্ড' রহিয়াছে ; ইঁহারা মান-নির্ধারণ ও তালিকাপ্রণয়ন করেন ('prepare the ratings and lists.')। দপ্তরের প্রধানের নিকট এইগুলি উপস্থিত করিলে পর তিনি পদোন্নতি সম্পর্কে সুপারিশ করেন। কিন্তু তাহা কার্যকরী হইবার পূর্বে সিভিল সার্ভিস কমিশনের এবং অর্থদপ্তরের (Treasury) সম্মতি প্রয়োজন। অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করিবার জন্যই এত ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চাকুরী-কালীন শিক্ষার প্রতিও সাম্প্রতিক কালে দৃষ্টি রাখা হইতেছে। নবনিযুক্ত কর্মচারীর কার্যে পরিচিতির ব্যবস্থা, বিভিন্ন শাখায় বদলী করিয়া প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, দপ্তরের ভিতরে বক্তৃতা, সান্ধ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদিবার সুযোগ দান, প্রভৃতির চেষ্টা হইতেছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও দুর্বলতা নিশ্চয়ই স্বীকার্য।

ব্রিটিশ্ সিভিল সার্ভিসকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করিতে পারি : (১) পরিচালক শ্রেণী (The Administrative Class), (২) কর্মসম্পাদক (The Executive Class), (৩) কেরাণী শ্রেণী (The Clerical Class), ও (৪ কেরাণী-সহকারী শ্রেণী (The Clerical Assistant Class।*

(১ ফাইনার ১৯৪৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে কমন্সসভার বিতর্কের বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যসংগ্রহ করিয়াছেন : Members of the British Civil Service : October 1, 1947 ; Non-Industrial Staffs only

	Wholetime		Part-time		Total
	Men	Women	Men	Women	
Administrative	3,864	517	27	9	4,399
Executive	40,528	9,83[illegible]	237	69	50,520
Clerical and Sub-clerical	130,436	121,023	195	7,087	255,100
Typing	222	28.628	4	1.507	29.605

প্রথম দলে অর্থাৎ, পরিচালনার চাকুরিতে নিয়োগের বয়স হইতেছে ২১ হইতে ২৪ বৎসর। সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স গ্রাজুয়েটরাই এ চাকুরিতে স্থান পায়। কিছুটা পদোন্নতি ও বাকি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইতেই কর্মী বাছাই করা হয়। এই পরিচালকশ্রেণীই হইল ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। পার্লামেণ্ট ও শাসনবিভাগ উভয়ের সহিতই ইহারা যুক্ত। মন্ত্রিগণ ইহাদের মারফতে দপ্তরে সরকারী নীতি চালিত করিয়া দেন; সমগ্র দপ্তরের সংগৃহীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইহারা মন্ত্রিদের উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাঁদের উপদেশ মন্ত্রিদের মাধ্যমে পার্লামেণ্ট ও সেই সূত্রে সমগ্র জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত হয়।* এই পরিচালকশ্রেণীর বৃহত্তম দুর্বলতা যে ইহা জনসমাজের এক অতি সঙ্কীর্ণ অংশ হইতে বাছাই হইয়া আসে ("their comparatively narrow recruiting ground")।

কর্মসম্পাদক শ্রেণীর কর্মে নিয়োগের বয়স হইতেছে ১৮-১৯। পদোন্নতি ও পরীক্ষা উভয়বিধ ব্যবস্থার মারফতেই নিয়োগ করা হয়। ইহাদের শিক্ষার মান হইতেছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তরণের মান। কেরাণী-শ্রেণী

Professional, technical and scientific	28,693	3,425	471	57	42,682
Minor and manipulative	127,664	56,178	25,075	25,541	206,650
Technical ancillary	44,419	7,787	156	143	52,356
Inspectorate	4,505	708	89	5	5,260
Messengerial, etc.	28,378	12,015	818	7,043	44,324
Total	418,709	240,120	27,072	36,461	690,596

Herman Finer—The Theory and Practice of Modern Government (p. 767)

* ("This class is the hub of the administrative wheel........It is obviously the crux of the administrative side of government." Finer—*Ibid*—pp. 768-769

সাধারণতঃ ১৬-১৭ বৎসর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মে নিযুক্ত হয়—মাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইহাদের শিক্ষার মান নির্দিষ্ট হয়। ১৬-১৭ বৎসর বয়স্ক বালিকাদের ভিতর হইতে উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার মানের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা কেরাণী-সহকারী শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়।

কর্মচারী ইউনিয়ন সংগঠন

এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই ব্রিটিশ, সরকারী কর্মচারীরা নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। বর্তমানে সমগ্র সরকারী কর্মচারীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কোন না কোন ইউনিয়নের সদস্য। ১৯২৭ সালে সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ চাপাইয়া দেওয়া হয়; সেগুলি আরও ১৯ বৎসর পর, ১৯৪৬ সালে শ্রমিক দলের সরকারের যুগে, প্রত্যাহৃত হয়।

হুইট্‌লি কাউন্সিল

সরকারী কর্মচারীগণ প্রথম দিক হইতেই একটি অভিযোগ জানাইয়া আসিতেছিলেন যে তাঁহাদের কার্যের বিধি-নিয়ম প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিবার কোন সুযোগ তাঁহাদের দেওয়া হয় না। আবেদন-নিবেদন করিবার সুবিধা থাকিলেও, নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন পরিচালকগণের সহিত সাধারণ কর্মচারীদের কোন মিলিত কমিটিতে আলোচনার সুযোগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। ১৯১৯ সালের পর 'হুইট্‌লি কাউন্সিল' প্রবর্তনের পর এ অভিযোগ দূর হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে এ ব্যবস্থা হয়। মূলতঃ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত এই ব্যবস্থা: (১) সরকারী অফিস, কারখানায় রহিয়াছে ওয়ার্কস কমিটি (Works Committee); (২) সমসংখ্যক পরিচালক ও কর্মচারী লইয়া গঠিত দপ্তরীয় কাউন্সিল (Departmental Council); (৩) অর্থদপ্তর মনোনীত ২৭ জন কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে এবং বিভিন্ন সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশনের তরফ হইতে ২৭ জন লইয়া, মোট ৫৪ জনের একটি জাতীয় কাউন্সিল (National Council)। কাউন্সিলগুলির দায়িত্ব হইল কর্মচারীদিগের অবস্থা সম্পর্কীয় সকল বিষয় লইয়া বিচার করা (to consider "all matters which affect the conditions of service of staff"); কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনেক সময়ে সহজেই কার্যকরী করা যায়; কখনও দপ্তরের প্রধান, অর্থদপ্তর বা পার্লামেন্টের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

মন্ত্রিপরিচালিত সরকারী দপ্তরের মারফৎ শাসনকার্য চালানো হইলেও

পাব্লিক কর্পোরেশন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, বিশেষ করিয়া শ্রমিকদলীয় ক্যাবিনেটের নীতি অনুযায়ী, একাধিক শিল্প জাতীয়করণ করার ফলে, এই সকল নূতন দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে মন্ত্রিদপ্তরের হস্তে না রাখিয়া 'পাব্লিক কর্পোরেশন' (Public Corporation) গঠন করিয়া তাহাদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের নিকট জবাবদিহির দায়িত্ব ব্যতীত অন্যান্য দিক হইতে সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীতির ভিত্তিতেই এগুলি গঠিত হয়। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট দায়িত্ব ভার ন্যস্ত থাকে নির্দিষ্ট কালের জন্য গঠিত 'বোর্ডের' উপর। 'বোর্ড' কর্পোরেশনের কার্যের পরিকল্পনা করে ও কর্মচারী নিয়োগ করে। অবশ্য সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীতির ভিত্তিতে গঠিত হইলেও মুনাফা করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নয়; নিজস্ব ব্যয়ভার চালাইয়া ব্যাপকতম জনসেবাই ইহার লক্ষ্য।

এই ব্যবস্থার উপযোগিতা দেখাইয়া বলা হয় যে সুদীর্ঘকালের জন্য পরিকল্পনা করা, অনুসন্ধান চালানো ও নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য দৈনন্দিন পার্লামেন্টের খবরদারী অপেক্ষা স্বতন্ত্র পরিচালনা অধিক ফলপ্রদ। ব্যবসা চালাইবার পক্ষে ব্যবসায়িক পদ্ধতিই কার্যকরী। ইহা ছাড়া এ ব্যবস্থা একদিকে অতিব্যস্ত মন্ত্রিদপ্তরের কার্যভার লঘু করে; অপরদিকে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে দলীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ চাপ হইতে মুক্ত রাখে।

এ ব্যবস্থার প্রধান সমালোচনাও হইল যে ইহা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণ, তথা পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ হইতে দূরে রাখে। যদিও বলা যায় যে বোর্ডের সদস্যগণকে মন্ত্রিমহাশয়ই নিয়োগ করেন, বোর্ডের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি মোটামুটি পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের দ্বারাই নির্ধারিত থাকে, পার্লামেন্টের নিকট বাৎসারিক কার্যবিবরণী পেশকরা হয় এবং পার্লামেন্ট সে সম্বন্ধে বিতর্ক এবং সাধারণ নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে,—তথাপি অস্বীকার করা যায় না যে ইহার উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত শ্লথ ও দুর্বল। সমালোচনার অপরদিক হইল যে ইহা প্রকৃত পক্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ধনতন্ত্রকেই সাহায্য করিতেছে। শ্রমশিল্পের যে সকল দিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে, যথা, কয়লা উৎপাদন, সরকার সেগুলিই স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া জাতির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে শতকরা ৮৬ ভাগ এখনও ব্যক্তিগত

মালিকানায়, অর্থাৎ ধনতন্ত্রের কবলে রহিয়াছে তাহাকে শস্তায় মাল সরবরাহ করিতেছে। অন্যান্য বোর্ডের মাধ্যমেও সেই একই প্রচেষ্টা রহিয়াছে। উপরন্তু বোর্ডগুলিতে প্রধানতঃ খ্যাতনামা ধনিকদেরই স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সরকারী দপ্তরে যতটুকু গণতান্ত্রিক নিয়ম-কানুন চালু আছে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেই সকল বাধ্যবাধকতা হইতেও মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।*

নিম্নে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হইল: ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড (The Bank of England)। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (The British Broadcasting Corporation)। ব্রিটিশ ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (The British Electricity Authority), প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্বয়ং উৎপাদন বা বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া সেবামূলক কর্ম শিল্পে সাহায্য-দানের দায়িত্ব পালন করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্লামেণ্ট—লর্ডসভা

ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট-সমেত-রাজা হইলেন আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতার অধিকারী, এবং কমন্সসভা (House of Commons) ও লর্ডসভা (House of Lords) এই দুই কক্ষ লইয়া পার্লামেণ্ট গঠিত। উচ্চ-কক্ষ (Upper Chamber) বা দ্বিতীয় কক্ষ (Second Chamber) লর্ডসভা লইয়া আমরা আলোচনা সুরু করিব।

দ্বিতীয়সভা বলিয়া পরিচিত হইলেও ইতিহাসের দিক হইতে লর্ডসভার আবির্ভাবই প্রথম। স্যাক্সন যুগের 'উইটানের' (Witan) উত্তরাধিকারী 'ম্যাগনাম কনসিলিয়াম (Magnum Consilium) বা 'মহাপরিষদ' হইতে লর্ড-সভার উদ্ভব; ক্রমওয়েলের সময় স্বল্পকালের জন্য শুধু লর্ডসভার উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছিল; নতুবা হাজার বৎসরের ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছে এই লর্ড সভা।

উপাধিধারী ব্রিটিশ অভিজাতদের কক্ষ এই লর্ড সভা। কিন্তু যে কোন

*Hawey and Hood : The British State

উপাধিই লর্ড সভায় প্রবেশাধিকার দেয় না। অভিজাত বংশের সকল ব্যক্তিই লর্ডসভায় আসন পাইবেন তাহা নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা রাজকীয় ঘোষণার বলে আজ যে সাধারণ, কাল সে-ই উপযুক্ত উপাধির যোগ্যতায় লর্ড সভায় স্থান লাভ করিল, এ ঘটনা প্রায়শঃই ঘটিতেছে।

অভিজাতদের মধ্যে পাঁচধরনের উপাধিধারী ব্যক্তি লর্ড সভায় আসন পাইবেন: যথা, ডিউক (Duke), মার্কোয়েস্ (Marquess), আর্ল (Earl), ভাইকাউন্ট (Viscount) এবং ব্যারন (Baron)। নাইট্ (Knight) প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর উপাধির বলে লর্ড সভার আসন পাওয়া যায় না। উপাধিধারী ব্যক্তি একাই আসন পাইবেন; এমন কি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রও উপাধিতে ভূষিত হইবার পূর্বে লর্ড সভায় আসন পাইবেন না। উপাধি অর্জন করিবার পন্থা দুইটি;—উত্তরাধিকারসূত্রে এবং রাজানুগ্রহে। উত্তরাধিকারসূত্রে উপাধিতে ভূষিত হইলে পর তাহা ত্যাগ করার উপায় নাই, যদি না পার্লামেণ্ট আইন করিয়া উপাধিভূষিত ব্যক্তিকে উপাধির বাহুপাশ হইতে মুক্তি দেয়। এই ধরনের উপাধি বর্জনের একাধিক প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। তবে রাজা নূতন কাহাকেও উপাধি প্রদান করিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, যেমন গ্ল্যাডষ্টোন বা চার্চিল করিয়াছিলেন। কোন লর্ডসভার সদস্য কমন্সসভার সদস্য হইতে পারিবেন না বা নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না, ইহাই উপাধি বর্জন করিতে চাহিবার সম্ভাব্য কারণ। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা সমরনীতির ক্ষেত্রে অথবা ধনার্জনে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রতি বৎসরই রাজা দুইবার করিয়া উপাধি বিতরণ করেন; তাহার মধ্যে উপরিলিখিত উচ্চ-উপাধিও কিছু থাকে। সুতরাং লর্ডসভার সদস্যসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিছুদিন পূর্বে মহিলাদিগের লর্ডসভায় সদস্যা হইবার অধিকার ছিল না; সম্প্রতি আইনের দ্বারা এ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে লর্ডসভার সদস্য তালিকায় মহিলাদের নামও পাওয়া যাইবে। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে: (১) লর্ডসভার সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট নহে, ইহা ক্রমবর্ধমান; (২) লর্ডসভা ও কমন্সসভার ভিতর কোন চীনের প্রাচীর পার্থক্য রচনা করে নাই,—লর্ডসভার সদস্য তালিকায় যেমন একাধিক প্রাক্তন কমন্সসভার নেতৃস্থানীয় সদস্যকে পাওয়া যাইবে, তেমনি ভাবী লর্ডসভার সদস্য এবং তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বকেও কমন্সসভা আলোকিত করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যাইবে; সুতরাং (৩) লর্ডসভা অভিজাতদের কেন্দ্র হইলেও, ব্যক্তিগত উপাধির বাধা না থাকিলে অভিজাত

বংশীয়ের কমন্সসভায় প্রবেশের অন্য বাধা নাই। লর্ডসভার সদস্যসংখ্যা সাড়ে আটশতের কিছু অধিক।

গঠনপ্রকৃতি

নিম্নলিখিত বিভিন্ন পর্যায়ের উপাধিধারীগণকে লইয়া লর্ডসভা গঠিত।

উপাধি ও বংশগত অধিকার

১। রাজবংশীয় উচ্চমর্যাদায় ভূষিত কিছু রাজকুমারের কথা সাধারণতঃ প্রথমেই উল্লিখিত হয়। কিন্তু লক্ষণীয় হইল যে রাজ-বংশীয় বলিয়া ইঁহাদের আসন নির্দিষ্ট নাই; আসনের ভিত্তি হইল অভিজাত উপাধি। উত্তরাধিকার সূত্রে যে উপাধি লাভ করা যায়, গ্রেটব্রিটেনের সেই উপাধিধারীগণ লইয়াই লর্ডসভা মূলতঃ গঠিত।

স্কট্‌ল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্য

২। ইংল্যাণ্ডের সহিত স্কট্‌ল্যাণ্ডের শাসন একীকরণের নির্দেশক ১৭০৭ সালের একীকরণ আইন (the Act of Union, 1707) অনুযায়ী স্কট্‌ল্যাণ্ডের সমপর্যায়ভুক্ত উপাধিধারী অভিজাতগণ নিজেদের মধ্যে ১৬ জনকে লর্ডসভায় নির্বাচন করিয়া পাঠান। প্রতিবার পার্লামেণ্ট নূতন করিয়া গঠনের সময় এই নির্বাচন হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব-মূলক সদস্য

১৮০১ সালের আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত একীকরণ আইন (The Act of Union, 1801) অনুযায়ী ঠিক হয় যে আয়ার্ল্যাণ্ডের উপাধিধারী অভিজাতগণ নিজেদের মধ্যে ২৮ জনকে লর্ডসভার সদস্যপদে নির্বাচন করিবেন। তাঁহারা জীবিতকাল পর্যন্ত সদস্য থাকিবেন। ১৯২২ সালে আইরিশ ফ্রি ষ্টেট (Irish Free State) গঠনের সময় নির্বাচন সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হয় নাই এবং তাহার পর হইতে আর কোন নির্বাচন হয়ও নাই। সুতরাং এই জাতীয় সদস্যসংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে এবং কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। ১৯৫২ সালে ৫জন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন।

আপীল লর্ড

ইংল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের উচ্চতর আদালত হইতে বিভিন্ন মামলার আপীলের শেষ রায় দিবার চূড়ান্ত আদালত হইল লর্ডসভা (final court of appeal)। সুতরাং লর্ডসভায় কিছুসংখ্যক আইন বিশেষজ্ঞর উপস্থিতি অপরিহার্য। ১৮৭৬ সালে এপেলেট জুরিসডিকশন এক্ট (Appellate Jurisdiction Act) দ্বারা [illegible]

আপীল লর্ড (lords of appeal in ordinary) নিয়োগ করা হয়। এই সংখ্যা ক্রমে বাড়াইয়া ৯ জন করা হয়। ১৮৮৭ সালের আইনে ইঁহাদেরঅধিকার শুধু জীবৎ-কালের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ইঁহারা শুধুমাত্র আইন সম্পর্কেই বক্তৃতা দেন।

আইন দ্বারা নির্দিষ্ট আছে যে ২৬জন ধর্মীয় লর্ড (Lords Spiritual) লর্ডসভার সদস্য হিসাবে সভায় আসন গ্রহণ করিবেন। ইঁহাদের মধ্যে ইয়র্ক ও ক্যাণ্টার-বেরির আর্কবিশপ (Archbishops of York and Canterbury) এবং লণ্ডন, ডারহ্যাম ও উইনচেষ্টারের বিশপগণের (Bishops of London, Durham and Winchester) আসন স্থায়ী। বাকী ২১ জনের মধ্যে কর্মকালের প্রাচীনতা অনুযায়ী আসন নির্ধারিত হয়। কেহ ধর্মীয় আসন হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে পূর্ববর্তিতার নিয়ম অনুযায়ী (rule of seniority) পরবর্তী বিশপ শূন্য আসন গ্রহণ করেন।

ধর্মীয় লর্ড

বিশেষ সুবিধা

লর্ডসভার সদস্যগণ নিম্নলিখিত বিশেষ সুবিধা (Privileges) সুবিধা ভোগ করেন :

(ক) লর্ডসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রীয় সমস্যা আলোচনার জন্য রাজ-সকাশে উপস্থিত হইতে পারেন; অপর পক্ষে কমন্সসভার সদস্যগণের কেবল যৌথভাবে 'স্পীকারের' (Speaker) মারফৎ বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার রহিয়াছে।

(খ) সভার সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিবাদ সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করাইবার অধিকার আছে।

(খ) সভার অবমাননার (Contempt of the House) জন্য দোষীর বিচার করিবার অধিকার শুধু সেই 'সেসনে'র (session) মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে।

(ঘ) লর্ডসভা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিচারের (impeachment) বিচারক; এ ক্ষেত্রে কমন্সসভা অভিযোগ আনয়ন করে।

(ঙ) যুক্তরাজ্যের চূড়ান্ত আপীল আদালত হিসাবে বিচার করিবার অধিকার একান্তই লর্ডসভার।

লর্ডসভার কার্য পদ্ধতি

ওয়েষ্টমিনষ্টারে নিজস্ব কক্ষে সেসন চলা-কালীন প্রতি মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিরার লর্ডসভার অধিবেশন হয়। প্রয়োজনে সোমবার ও কদাচিৎ শুক্র-বারেও অধিবেশন হইতে পারে। কমন্সসভা ও লর্ডসভার অধিবেশন চলে পাশাপাশি, একই সময়ে। লর্ডসভার সভাপতিত্ব করেন লর্ড চ্যান্সেলার। তাঁহার নির্দিষ্ট আসনের নাম হইল 'উলস্যাক্'

(Woolsack); তত্ত্বগতভাবে ধরিয়া লওয়া হয় যে 'উলস্যাক্‌' লর্ডসভার কক্ষের ভিতর অবস্থিত নহে,—কক্ষের বাহিরে অবস্থিত আসনে বসিয়া লর্ড চ্যান্সেলর সভাপতিত্ব করিতেছেন। এরূপ অনুমানের কারণটি ঐতিহাসিক। লর্ড চ্যান্সেলার হইলেন রাজা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী; সুতরাং সর্বদাই যে তিনি লর্ড সভার সদস্য হইবার উপযুক্ত মর্যাদাসম্পন্ন অভিজাত হইবেন তাহা না হইতেও পারে। সভার দৈনিক অধিবেশন সাধারণতঃ ঘণ্টা দুয়েকের বেশী চলে না; সদস্যের উপস্থিতি নিতান্তই সামান্য। প্রায় নয়শত সদস্যের মধ্যে ৩০ বা চল্লিশ জন উপস্থিত থাকেন। তিনজন উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য চলিতে পারে (quorum); যদিও বিল পাস করিবার জন্য অন্ততঃ ৩০ জনের উপস্থিতি অপরিহার্য।

সভার কার্যপরিচালনার নিয়ম-কানুন যথেষ্ট উদার। যে কোন সদস্য প্রায় যে কোন পর্যায়েই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ বিতর্কের সূত্রপাত করিতে পারেন। লর্ড চ্যান্সেলার সভাপতি হিসাবে প্রস্তাবের উপর মতামত গ্রহণ করেন। শৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই। এক সঙ্গে একাধিক বক্তা বলিতে উঠিলে কে বলিবেন তাহা নির্ধারণ করার ক্ষমতাও তাঁহার নাই,—সভায় উপস্থিত সকলে তাহা স্থির করেন। বক্তারা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা সুরু করেন না, তাঁহাদের বক্তব্য উদ্দিষ্ট হয় অন্যান্য লর্ডদের প্রতি "(My Lords")। বিলের উপর আলোচনা পদ্ধতিও অপেক্ষাকৃত সরল। প্রথম দুইবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিলটি পাঠ করা হয়; তাহার পর সমগ্র সভা কমিটিরূপে (Committee of the Whole House) রূপান্তরিত হইয়া উহার বিচার করে। তাহার পর আবার তৃতীয় পাঠ হয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইলে কমন্সসভার সম্মতির জন্য সেখানে ফিরিয়া যায়। কমন্সসভা সে প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারে; নতুবা, কমন্সসভা স্বীয় মতে স্থির থাকিলে, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাহিরে বেসরকারী আলোচনার (informal conferences) মাধ্যমে মতপার্থক্যের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হয়। সে চেষ্টাও বিফল হইলে হয় বিলটি বর্জিত হয়, নতুবা যে বিশেষ পদ্ধতিতে লর্ডসভার বাধা কমন্সসভা অতিক্রম করিতে পারে, তাহারই প্রয়োগ করা হয়।

কার্য ও দায়িত্ব

লর্ডসভা যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। তবে বিচার করেন লর্ড চ্যান্সেলারের সভাপতিত্বে ৯ জন আপীল লর্ড (Lords of Appeal in Ordinary)। অন্যান্য সদস্যগণ, অত্যন্ত খ্যাতনামা আইনজীবী না হইলে, বিচারে অংশগ্রহণ করেন না। পূর্বে বিশেষ

বিচারের (impeachment) অধিকারের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল; কারণ এই পদ্ধতিতে এককালে রাজকর্মচারিগণকে পার্লামেন্টের বশে আনা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ক্যাবিনেট-দায়িত্বের নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহার গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে।

১। বিচার

লর্ডসভা পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ: ১৯১১ সালের পূর্বে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কমন্সসভার সহিত প্রায় সমানাধিকার ভোগ করিত। দুইটি সীমা অবশ্য স্বীকৃত ছিল: (১) লর্ডসভার অনাস্থা প্রকাশে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করিতে হইত না; (২) অর্থ সম্পর্কীয় বিল (money bills) লর্ডসভা সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করিত না। ইহা ব্যতীত লর্ডসভা অন্য যে কোন বিলই উত্থাপন বা বর্জন করিতে পারিত।

২। আইন-প্রণয়ন

সঙ্ঘর্ষ আসিল ১৯০৯ সালে। সে আলোচনার পূর্বে পটভূমিকাটি একবার স্মরণ করা প্রয়োজন।

১৮৩২ সালে কমন্সসভার নির্বাচনের ভিত্তি প্রসারিত করা ও অন্যান্য ত্রুটি দূর করার পূর্বে পার্লামেন্টের দুই কক্ষের মধ্যে কোনরূপ মৌলিক পার্থক্য ছিল না; উভয় কক্ষই ব্রিটিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত ছিল। কিন্তু ১৮৩২, ১৮৬৭ ও ১৮৮৪ সালের সংশোধনীতে ব্রিটেনের শহর ও গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার অর্জন করে। ফলে কমন্সসভার চরিত্রও পরিবর্তিত হইতে থাকে। ইহারই পাশে পাশে ক্যাবিনেট পদ্ধতির শাসন প্রচলনে ব্রিটেনে গণতন্ত্রের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের যুগে লর্ডসভার অচলায়তন পূর্ববৎই রহিয়া গেল। সেই অচলায়তনে—নিতান্তই পিতৃপরিচয়ের স্বত্বে একদল লোকের উপর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়া রহিল—নূতন যুগে পুরাতন ব্যবস্থার ঘাঁটি অপরিবর্তিত রহিয়া গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দলগত সমাবেশেও এই অসমঞ্জস পরিস্থিতি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ১৮৮৬ সালে গ্ল্যাডষ্টোন প্রস্তাবিত আইরিশ হোমরুল বিল সম্বন্ধে মতপার্থক্যের ফলে উদারনৈতিক দলে ভাঙ্গন ধরে। ফলে দেখা যায় যে লর্ডসভার সদস্যগণ, যাঁহাদের মধ্যে পূর্বে উভয় দলেরই যথেষ্ট সংখ্যক সমর্থক দেখা যাইত, প্রায় সকলেই রক্ষণশীল দলের সমর্থকে পরিণত হইয়াছেন। ১৯০৫ সালে প্রায় ৬০০ সদস্যের ভিতর মাত্র ৪৫ জন উদারনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন। (লর্ডসভায় রক্ষণশীল দলের চূড়ান্ত প্রাধান্য আজও অবিকৃত রহিয়াছে।) ফলে উদারনৈতিক ক্যাবিনেটকে লর্ডসভার মারফৎ রক্ষণশীল

দলের দ্বিতীয় বাধা সর্বদাই বিপর্যস্ত করিত। ১৮৯৩ সালে গ্ল্যাডষ্টোন ক্যাবিনেট ও ১৯০৫ সালে ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান ক্যাবিনেটকে লর্ডসভার বিরোধিতায় পর্যুদস্ত হইতে হয়।

১৯০৯ সালে উদারনৈতিক ক্যাবিনেটের অর্থমন্ত্রী লয়েড জর্জ যে বাজেট উত্থাপন করেন তাহাতে জমি ও সম্পত্তির উপর কতকগুলি নূতন কর ধার্য করা হইয়াছিল। লর্ডসভা এ বাজেট প্রত্যাখ্যান করেন। এরূপ ঘটনা দীর্ঘকাল ঘটে নাই। ক্যাবিনেট পদত্যাগ করে ও কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া নূতন নির্বাচন হয়। নূতন নির্বাচনে উদারনৈতিক দল বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করে। এইবার লর্ডসভা বাজেট পাস করেন। কিন্তু উদারনৈতিক ক্যাবিনেট লর্ডসভার ক্ষমতা-সঙ্কোচনের মৌলিক প্রস্তাব আনয়ন করে। লর্ডসভায় স্বভাবতঃই এ প্রস্তাব পরাজিত হয়। ফলে, পুনরায় মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন। আবার কমন্সসভা ভাঙ্গিল; আবার সাধারণ নির্বাচনে উদারনৈতিক দল জয়লাভ করিল এবং পুনরায় লর্ডসভার ক্ষমতা সঙ্কোচনের প্রস্তাব উপস্থিত হইল লর্ডসভার সম্মুখে। এক্ষেত্রেও লর্ডসভার সম্মতি দিতে প্রচুর আপত্তি ছিল। কিন্তু বিল পাস করাইবার প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন লর্ডসভার সদস্য সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিরোধিতা উত্তরণ করা হইবে,—এই হুমকির সম্মুখে লর্ডসভা মানিয়া লয়। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইনের (Parliament Act of 1911) এইরূপে জন্ম হইল।

১৯১১ সালের আইনের বিষয়বস্তু

১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইনের মূল বিষয়বস্তুগুলি হইল নিম্নরূপ:

১। অর্থবিল

১। অর্থবিল সম্পর্কে নির্দিষ্ট হইল যে কমন্সসভা কোন অর্থ বিল পাস করিয়া পার্লামেণ্টের সেসন শেষ হইবার অন্ততঃ একমাস পূর্বে যদি লর্ডসভার নিকট প্রেরণ করে, এবং পাঠাইবার একমাসের মধ্যে কোনরূপ সংশোধন না করিয়া লর্ডসভা যদি সে 'বিল' পাস না করে, তবে সেটি রাজার নিকট উপস্থিত করা হইবে এবং তাঁহার সম্মতি লাভ করিলে আইনে পরিণত হইবে।* 'অর্থ বিলের'

* If a money bill, having been passed by the House of Commons, and sent up to the House of Lords at least one month before the end of the session, is not passed by the House of Lords without amendment within one month after it is sent up to that House, the bill shall unless the House of Commons directs to the contrary, be presented to His Majesty and become an Act of Parliament on the royal assent being signified, notwithstanding that the House of Lords have not assented to the bill."

সংজ্ঞা এরূপে নির্ধারণ করা হইল যাহাতে শুধু করই নয়, ব্যয়, ঋণ এবং হিসাব-পরীক্ষা (appropriations, loans and audit) সংক্রান্ত বিল অর্থবিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। এ বিষয়ে কমন্সসভার 'স্পীকারের' নিদর্শনপত্রই (certificate) যথেষ্ট; তবে অবশ্য যে বিল শুধুই অর্থ-সংক্রান্ত নয়, তাহাকে অর্থবিল বলা যাইবে না।

২। অন্যান্য বিল সম্পর্কে নির্ধারিত হইল যে কমন্সসভা যদি পরপর তিনটি 'সেসনে' একই বিল তিনবার পাস করিয়া প্রতিবারই সেসন-সমাপ্তির একমাস পূর্বে লর্ডসভায় প্রেরণ করে, যদি প্রতিক্ষেত্রেই লর্ডসভা সে বিল প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাহার পরে রাজার সম্মতিদানের পর তাহা আইনে পরিণত হইবে; তবে কমন্সসভার প্রথম সেসনে বিলের দ্বিতীয় পাঠের দিন হইতে তৃতীয় সেসনে তৃতীয় পাঠের মধ্যে অন্তত: দুই বৎসর সময় অতিক্রান্ত হওয়া প্রয়োজন এবং এই সময়ে নিতান্ত কালাতিক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ব্যতীত অপর কোন সংশোধন বিলটিতে থাকিবে না। এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম রহিল দুইটি: (ক) শাসন বিভাগীয় 'অস্থায়ী নির্দেশনামা' (Provisional Orders), সমর্থনের জন্য এবং (খ) পার্লামেণ্টের আইন-নির্দেশের কার্যকাল বর্ধিত করার জন্য বিল সম্পর্কে উপরোক্ত নিয়ম খাটিবে না।

অন্যান্য বিল

৩। এই আইনে পার্লামেণ্টের কার্যকাল ৭ বৎসরের স্থলে কমাইয়া ৫ বৎসর করা হইল।

পার্লামেণ্টের কার্যকাল

১৯১১ সালের আইনে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আনা হইল ঠিকই, কিন্তু তাহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ ফলাফল দেখা গেল না। তাহার কারণ ছিল: ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ দলীয় সংঘর্ষ মুলতুবী রাখিয়াছিল; (খ) যুদ্ধোত্তর দীর্ঘ ২০ বৎসর কমন্সসভার উপর রক্ষণশীল দলের কর্তৃত্বই বজায় ছিল; (৩) ১৯৩৯-৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পুনরায় জাতীয় ঐক্যের উপর জোর পড়ে। ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদল জয়লাভ করে; তাহাদের ছিল একদিকে কমন্সসভায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগুরুত্ব, অপরদিকে শিল্প-জাতীয়করণের কার্যসূচী।

শ্রমিকদলের বিভিন্ন কার্যক্রম পার্লামেণ্টে লর্ডসভার নিকট বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ফলে, ১৯৪৭ সালে শ্রমিক-ক্যাবিনেট লর্ডসভার ক্ষমতা অধিকতর সংকোচনের বিল আনয়ন করে। লর্ডসভার বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৪৯ সালে, দুই বৎসর পরে, ইহা আইনে

পার্লামেণ্ট আইন—১৯৪৯

পরিণত হয়। ১৯১১ সালের আইনের স্থলে পরিবর্তন ইহাই হয় যে বিলটি তিনটি উপর্যুপরি সেসনের পরিবর্তে (১৯১১ সালের আইনের নির্দেশ) দুইটি পর পর সেসনে পাস করিলেই চলিবে এবং প্রথম দ্বিতীয় পাঠ হইতে শেষবার বিলটি পাস করার মধ্যে দুই বৎসরের (১৯১১ সালের আইন অনুযায়ী) পরিবর্তে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলেই যথেষ্ট হইবে।

লর্ডসভার সংশোধনের সমস্যা (Problem of reform of the House of Lords): লর্ডসভার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দফায় অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের ভিতর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের উল্লেখ করা হইল :

১। প্রথমেই বলা চলে যে বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উপাধির বলে রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়নের অধিকার গণতান্ত্রিক নীতির আমূল-বিরোধী। ইহা অসাম্যকে জীয়াইয়া রাখিতেছে। ল্যাস্কি বলেন যে শুধুই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে, কাহারও নিকট দায়িত্বশীল নহে এরূপ একটি সংগঠনের পক্ষে কোন আইনকে দুই বৎসর ঠেকাইতে পারা এক চমকপ্রদ ব্যাপার।*

২। শুধু তাহাই নহে, ইহা মূলতঃ বৃহৎ ভূমিপতি ও বৃহৎ পুঁজিপতিদিগের প্রতিষ্ঠান, সকল ধনিক সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার দুর্গ (common fortress of wealth."—Ramsay Muir)। অতীতে সমাজের অধিপতি ও নেতা ব্রিটিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সংগঠন ছিল যে লর্ডসভা, আজ তাহার সে চরিত্র নাই;—মূলতঃ তাহা ধনিক, বণিক, পুঁজিপতিশ্রেণীর মুখপাত্রে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক যুগের আভিজাত্যের চাবিকাঠি হইল অর্থ, আর লর্ডসভা সেই পুঁজিপতি-অভিজাতদিগেরই প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। এ্যাসকুইথ তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বের ৮বৎসরে ১০৮জন এবং লয়েড জর্জ তাঁহার সময়ে ১১৫জন নূতন লর্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকে জন গল্যান লিখিতেছেন: বর্তমান লর্ডসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অথবা তাহার পূর্বে সৃষ্ট উপাধিধারী লর্ড হইলেন ১৪২ জন, উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট উপাধি অধিকারীর সংখ্যা ২৬১ জন এবং বর্তমান শতাব্দীতে সৃষ্ট উপাধি বহন করিতেছেন

* "That a body of some 750 peers, all of them, save the bishops and the law lords, hereditary, responsible to no one but themselves, should have the power to delay the enactment of any non-financial legislation for as much as two years is a startling thing." Laski—Parliamentary Government in England (1938).

৪০৪ জন।* ল্যাস্কির ভাষায়: "এ কক্ষে প্রবেশাধিকারের নিমিত্ত প্রাচীন রাষ্ট্রনীতিবিশারদ, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও নাবিক, কদাচিৎ কোন খ্যাতনামা চিকিৎসক বা বৈজ্ঞানিক, কতিপয় রাজকর্মচারী বা প্রাক্তন-রাষ্ট্রদূতের সহিত প্রতিযোগিতা চলিতেছে মোটরগাড়ী প্রস্তুতকারক, সংবাদপত্রের মালিক, মদ্য উৎপাদক ও ব্যাঙ্কব্যবসায়ীদিগের। ইহা এমন এক প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেখানে নিয়োগ করা হয় সেই সকল ব্যক্তিকে যাঁহাদের বিত্ত বা মর্যাদা এত অধিক যে নিতান্ত 'নাইটের' উপাধি আর যথেষ্ট প্রীতিপদ বলিয়া বোধ হয় না।"†

৩। বৃহৎ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী হিসাবে ইহা স্বভাবতঃই রক্ষণশীল দলের সপক্ষে কার্য করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগের হিসাব দেখাইয়া জন গল্যান বলিতেছেন যে লর্ডসভার মধ্যে যাঁহারা নিজেদের দলভুক্ত বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৪৯১ জন রক্ষণশীল দলের অনুগামী, এবং ৪১ জন উদারনৈতিক দল ও ৬২ জন শ্রমিকদলের সদস্য।

ইঁহাদের প্রগতিবিরোধী ভূমিকাও সুপরিচিত। আইরিশ হোমরুল বিলের বিরোধিতা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। ছোট চাষী ও প্রজাদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিল ইঁহারা বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। শিক্ষা বিস্তার, ভোটাধিকার বিস্তার, গোপন ভোটদান, প্রভৃতি প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রস্তাবের নিয়মিত বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর শ্রমিক দলীয় সরকারের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইনেও ইঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল সংশোধনী ঢুকাইতে বাধ্য করিয়াছেন।‡

---

* John Gollan—British Political System (1954)

† "Motor car manufacturers, newspaper proprietors, brewers, distillers, and bankers vie with elderly statesmen, retired soldiers and sailors, an occasional physician or scientist of eminence, a handful of civil servants and ex-ambassadors, for access to the Chamber. It has become the body to which men are appointed whose distinction or wealth is too great for the offer of a knighthood to appear sufficiently flattering." Laski : *Ibid.*)

‡ "........In the case of several projects by which, the Attlee Government set particular store, *e g.*, the Transport Nationalisation Bill, and the Town and Country Planning Bill, it forced amendments which the ministers accepted only because the alternative was prolonged delay under the terms of the Parliament Act, or indeed no legislation at all."—Ogg and Zink. *Ibid.* p. 226. জন গল্যানের পুস্তকে আরও বিস্তৃত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।)

৪। চতুর্থ অভিযোগ হইল এই যে লর্ডসভার অধিকাংশ সদস্য নিজস্ব দায়িত্ব পালন করেন না।

র‍্যামজে ম্যুর বলিতেছেন যে লর্ডসভার কার্যভার নিতান্তই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করিয়া দেখা ও কিছুটা বিলম্ব ঘটাইয়া দেওয়ায় সীমাবদ্ধ, তাহাও উক্ত সংগঠন ভাল করিয়া করিতে পারে না (The House of Lords is "Only a revising and delaying body ; and not very effective even for that purpose."—Ramsay Muir)। আইন প্রণয়নে কমন্সসভার প্রাধান্য সত্যই অনস্বীকার্য। তথাপি লর্ডসভার যে চরিত্র, তাহাতে এরূপ প্রতিষ্ঠানের হস্তে বিলম্ব করাইবার অস্ত্র তুলিয়া দিয়া, প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ ধনিক শ্রেণী ও রক্ষণশীল দলের স্বার্থে, কমন্সসভার মাধ্যমে জনসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশকে সংকুচিত, বিপথচালিত বা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিতে দেওয়া উচিত কি ?

লর্ডসভার সংশোধনের প্রশ্ন বহুপূর্ব হইতেই উঠিয়াছে। উদারনৈতিক দলের নেতৃত্বে ১৯১১ সালে যে পার্লামেণ্ট আইন পাস হয়, তাহার মুখবন্ধে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে অচিরেই লর্ডসভার সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইবে। রক্ষণশীল দলও সংশোধন সম্পর্কে আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন এই কারণে যে তাঁহারা নিজেরাই অগ্রণী হইয়া সংশোধন না করিলে অপর পক্ষের হস্তে লর্ডসভার ক্ষমতা অনেক অধিক পরিমাণে খর্বিত হইতে পারে। দুইটি মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন যুগে শ্রমিকদলের কার্যসূচীতে লর্ডসভাকে সম্পূর্ণ বাতিল করার প্রস্তাব ছিল।

লর্ডসভা সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোভাব

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লর্ড ব্রাইসের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় কক্ষের সংশোধন সম্পর্কীয় সম্মেলন (Conference on the Reform of the Secend Chamber) আহ্বান করা হয়। ১৯১৮ সালে ইহার 'রিপোর্ট'-ও (Bryce Report) প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া রিপোর্টের সুপারিশ কাহারও নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ব্রাইস কমিটি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইল নিম্নরূপ : লর্ডসভার মোট সদস্যসংখ্যা কমাইয়া ৩২৭ করা হইবে : ইহার মধ্যে ৮১ জন সকল লর্ডের ভিতর হইতে দুইটি কক্ষের মিলিত স্থায়ী কমিটির দ্বারা নির্বাচিত হইবেন ; এবং বাকি ২৪৬ জন যথোপযুক্ত 'কোটা' (Quota) অনুযায়ী ১৩টি নির্বাচকমণ্ডলীতে বিভক্ত কমন্সসভার সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। ১২ বৎসরের জন্য কার্যকাল

লর্ডসভার সংশোধনের প্রস্তাব

ব্রাইস কমিটির প্রস্তাব

নির্দিষ্ট থাকিবে ; চারবৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় গ্রহণ করিবেন। কমন্সসভার সদস্যপদের যোগ্যতা লর্ডসভার সদস্যপদের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। এ প্রস্তাব স্বভাবতঃই চাপা পড়িয়া যায়।

দীর্ঘকাল পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর শ্রমিক ক্যাবিনেটের সময় লর্ডসভার সংশোধনের প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপিত হয়। ইহার উপর ত্রিদলীয় সম্মেলনে নিম্নলিখিত নীতিগুলি সকল পক্ষেরই স্বীকৃতি লাভ করে :

ত্রিদলীয় সম্মেলনে গৃহীত নীতি

১। দ্বিতীয় কক্ষ নিম্ন কক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে না ;

২। সংশোধন এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে কোন দলেরই চিরস্থায়ী সংখ্যা-গরিষ্ঠতা না থাকে ;

৩। বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সংশোধিত কক্ষের সদস্যপদের ভিত্তি হইবে না ;

৪। দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যপদ স্থিরীকৃত হইবে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বা দেশসেবার ভিত্তিতে ;

৫। মহিলাদের সমানাধিকার থাকিবে ;

৬। রাজবংশীয় কিছু, কিছু যাজক ও আপীল লর্ডদিগের স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে ;

৭। সদস্যদের ভাতা দেওয়া হইবে ;

৮। লর্ডসভার সদস্য নহেন এরূপ লর্ডদের কমন্সসভার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে ;

৯। দায়িত্ব পালনে অক্ষম সদস্যদিগের অপসারণের ব্যবস্থা থাকিবে।

কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইয়াও শ্রমিক দল সংশোধনের প্রস্তাব আনিলেন না ; লর্ডসভার ক্ষমতা সংকোচনেই আইনকে সীমাবদ্ধ রাখিলেন।

ব্রাইস কমিটি লর্ডসভার উপযোগিতা হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :

বর্তমান লর্ডসভার উপযোগিতা

(ক) লর্ডসভা বিল পুনঃপরীক্ষা করিয়া দেখেন ; (খ) যে সকল বিল বিতর্কমূলক নহে সেগুলি লর্ডসভায় প্রথমে উত্থাপন করা ও বিচার করায় কমন্সসভার কার্যে সহায়তা করা হয় ; (গ) কমন্সসভা যখন অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া ব্যস্ত, তখন লর্ডসভায় সরকারের সাধারণ নীতি ও বৈদেশিক নীতি লইয়া স্বাধীন ও অকুণ্ঠ আলোচনা করা সম্ভব ; (ঘ) সর্বাপেক্ষা জরুরী হইল যে শাসনতান্ত্রিক

পরিবর্তন, অভিনব কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন, অথবা যে বিষয়ে মতামত মোটামুটি সমানভাবে বিভক্ত সেরূপ প্রস্তাবগুলি লর্ডসভা যথেষ্ট বিলম্ব করাইয়া দিতে পারে, যাহাতে সে সকল বিষয়ে জাতির অভিমত সঠিকরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও লর্ডসভা আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে: যথা,—

(ঙ) সর্বোচ্চ আপীল-আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার বহন করে,

(চ) ইহার 'বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল (Private Bills) বিষয়ক কমিটির কাজ কমন্সসভার ভার ও লাঘব করে;

(ছ) ''অস্থায়ী নির্দেশ সংক্রান্ত বিল, (Provisional Orders Bills) এবং 'বিশেষ নির্দেশগুলি, (Special Orders) বিচারের যথেষ্ট সহায়তা করে;

(জ) 'আইনানুযায়ী নিয়ম-কানুন ও নির্দেশের' (statutory rules and orders) বিচারেও ইহার সহায়তা অত্যন্ত মূল্যবান।

(ঝ) ইহার সদস্যবর্গের মধ্যে জ্ঞানী, গুণী, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ পার্লামেণ্টের কার্যে আগ্রহশীল এবং তাঁহারাই সাধারণতঃ বিভিন্ন কার্যে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং ইঁহাদের আলোচনা ও বিতর্ক সাধারণতঃ অত্যন্ত মূল্যবান। উপরন্ত, ভোট আদায়ের জন্য কাহাকেও খাতির করিয়া চলিবার দায় ইঁহাদের নাই; সেজন্যও স্বাধীন মত ব্যক্ত করা এবং প্রয়োজনে অপ্রিয়ভাষণ করাও ইঁহাদের পক্ষে অনেক সহজসাধ্য।

কিন্তু লর্ডসভার এত গুণাবলী তালিকাবদ্ধ করার পরও, ল্যাস্‌কির সমালোচনা অটুট থাকিয়া যায়। ল্যাস্‌কি বলিতেছেন! "যদি কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষ থাকিতেই হয়, তবে রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় থাকাকালীন লর্ডসভা অবিসংবাদিতরূপে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় কক্ষ। ...যখন প্রগতিশীল সরকার ক্ষমতায় আসীন থাকে ও প্রচণ্ড মতপার্থক্য চলিতে থাকে তখনই ইহা হইতে প্রকৃত সমস্যার উদ্ভব হয়। · তখনই নির্বাচনে প্রগতিশীল বিজয়ের ফলাফল যথাসাধ্য সংশোধনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া রক্ষণশীল দলের অপ্রকাশিত শক্তি হিসাবে ইহা আত্মপ্রকাশ করে।" *

* ("If there is to be a second chamber at all in a democratic state, the House of lords, when a Conservative Government is in office, is perhaps as good a second chamber as there is in the

শ্রমিকদল দীর্ঘকাল বলিয়া আসিয়াছিল যে ক্ষমতা হাতে পাইলে লর্ডসভাকে তুলিয়া দিবে। কিন্তু ক্ষমতায় আসিয়া তাহারা লর্ডসভাকে বাতিল তো করিলই না, এমন কি সংশোধনও করিল না। ইহার পূর্ববর্তী বিভিন্ন সরকারও কোনরূপ সংশোধন করেন নাই। ইহার কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত বক্তব্য উপস্থিত করা যায়।

সংশোধন কেন হয় না?

লর্ডসভার সংশোধন সম্পর্কে মূল সমস্যা হইল ক্ষমতার সমস্যা। লর্ডসভাকে সংশোধিত করিয়া পুনর্গঠন করিলে স্বভাবতঃই বর্তমান দুর্বল অবস্থায় তাহাকে রাখা চলিবে না; যথোপযুক্ত ক্ষমতা তাহাকে দিতে হইবে। অথচ তাহা হইলে তুলনায় কমন্সসভার ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। যদি রক্ষণশীল মনোভাব হইতে ইহাকে সংশোধিত করা হয়, তাহা হইলে সম্ভাবনা রহিয়াছে যে কমন্সসভা, বর্তমানে যেরূপে ইহার বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহা আর বজায় থাকিবে না। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক মনোভাব হইতে সংশোধন হয়ত সম্পত্তির মালিকশ্রেণীকে এমন কোনঠাসা করিয়া ফেলিবে, যাহাতে তাহারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই অভিযান সুরু করিতে পারে। আসলে এই ক্ষমতার বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে একমত হওয়া দুষ্কর। আর দ্বিতীয় কারণ হইল এই যে বর্তমান লর্ডসভা বিরোধকে চরমে তুলিয়া মৌলিক সংশোধন ডাকিয়া না আনিয়া, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আক্রমণের সম্মুখে, নিজ ক্ষমতা কিছুটা বিসর্জন দিয়া সন্ধি করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছে।*

world......The real problems to which it gives rise occur only in periods of deep controversy, when a progressive Government is in power......It becomes the reserve of the Conservative Party, determined to correct the consequences of a progressive victory at the polls, so far as it lies in its power." Laski—*Ibid.*

* ("It has endured only because in each of the conflicts of the last generation the House of Lords had preferred to abdicate rather than to fight, and because it has thus far proved impossible to discover among parties any common agreement to the principles upon which it should be reformed." Laski—*Ibid.*

সপ্তম অধ্যায়

পার্লামেণ্ট—কমন্সসভা

কমন্সসভার গুরুত্ব

কমন্সসভা পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ বলিয়া পরিচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অধিকতর ক্ষমতাশালী। কমন্সসভা দেশের ২১ বৎসরের উপর সকল বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী লইয়া গঠিত। অর্থাৎ, এই কক্ষই জাতির প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া দাবি করিতে পারে। ক্যাবিনেট বা রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃপক্ষ এই কক্ষের নিকটেই দায়িত্বশীল। কমন্সসভার আস্থা-অনাস্থার উপর ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব বজায় থাকা-না-থাকা নির্ভর করে। আইন প্রণয়নে কমন্সসভার সহযোগী অপর দুই শক্তির, অর্থাৎ, রাজা ও লর্ডসভার, উপর কমন্সসভার কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য। কারণ, লর্ডসভার বিরোধিতা বিশেষ পদ্ধতির মারফৎ অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কমন্সসভার আছে, এবং পার্লামেণ্টে গৃহীত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা অব্যবহারে বাতিল হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সাধারণতঃ ধরা হয়। সুতরাং যদি রাজা রাজতন্ত্র, লর্ডসভা, অভিজাততন্ত্র এবং কমন্সসভা গণতন্ত্রের প্রতীক হয়, তাহা হইলে এ তিনের মধ্যে গণতন্ত্রের সর্বতোভাবে প্রাধান্য অনস্বীকার্য।

সদস্যসংখ্যা

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে কমন্সসভার মোট সদস্যসংখ্যা ১৯৪৮ সালের একেবারে চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই; সংখ্যার কিছু হেরফের হইতে পারে। বলা হইয়াছে, যে গ্রেটব্রিটেনের প্রতিনিধিসংখ্যা ৬১৩ এর "খুব অধিক পরিমাণে কম বেশী" (substautially greater or less') হইবেনা এবং ইহার মধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ড হইতে ৭১ জন, ওয়েল্‌স্ হইতে ৩৫ জন এবং উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে ১২ জনের স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে। বর্তমানে মোট সদস্যসংখ্যা ৬২৮ জন। সদস্যগণ ২১ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক নরনারীর ভোটে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য সংগঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর

নির্বাচকমণ্ডলী

দ্বারা (single member constituency) নির্বাচিত হন। নির্বাচক মণ্ডলী (constituency) বলিতে বুঝায় কোন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় (electraol district) তালিকাভুক্ত ভোটারগণ (enlisted voters)। তাহা হইলে নির্বাচনের ভিত্তি হইল

নিম্নরূপ : (ক) প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার, (খ) ভৌগোলিক এলাকায় সংগঠিত নির্বাচকমণ্ডলী, (গ) প্রতি নির্বাচকমণ্ডলী হইতে শুধুই একজনের নির্বাচনাধিকার, (ঘ) প্রত্যক্ষ নির্বাচন। (ঙ) ব্যালট।

নির্বাচনের ভিত্তি

সদস্যপদের যোগ্যতা হইল নিম্নরূপ : (ক) সদস্যকে প্রাপ্তবয়স্ক হইতে হইবে, জন্মসূত্রে অথবা অনুমোদনসিদ্ধ (by birth or naturalisation) (খ) ব্রিটিশ প্রজা (British subject) হইতে হইবে (সুতরাং যুক্তরাজ্যের অধিবাসী ছাড়াও ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকগণও এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত), ও (গ) যে কোন ধর্মবিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ একটি অতি সাধারণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

সদস্যপদের যোগ্যতা

নিম্নলিখিত পর্যায়ের ব্যক্তিগণ সদস্যপদের অযোগ্য বলিয়া নির্ধারিত আছে : কারাগারে আবদ্ধ হওয়া অপরাধী বা উন্মাদাগারে বন্দী বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার নাই। ব্রিটিশ প্রজা না হইলে ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া যাইবে না। স্বভাবতঃই অপ্রাপ্ত বয়স্কের অবস্থাও অনুরূপ। লর্ডসভার সদস্যও কমন্সসভায় ভোট দিতে পারিবেন না। দরিদ্র ভাতায় (supported by public poor relief funds) যাঁহাদের দিন চলে, ১৯১৮ সালের পূর্বে তাঁহাদের ভোটাধিকার ছিল না, কিন্তু ১৯১৮ সালের আইনে এ নিয়ম বাতিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানে বসবাসকারী ভিক্ষাজীবীরা (paupers maintained in public institutions) ভোটার তালিকাভুক্ত হইতে পারে না, কারণ তালিকাভুক্তির জন্য বসবাসের যোগ্যতা (residence requirement) নাই। অবশ্য এই সূত্রে স্মরণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত নির্বাচনী এলাকায় বাস করিবার নিয়ম ব্রিটেনে নাই।

ভোট দিবার অধিকার যাহার নাই

প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্রিটেনে একদিনে আসে নাই। বস্তুতঃ গণতন্ত্র বলিতে আজ আমরা যাহা বুঝি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও ব্রিটেনে তাহা ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ই লর্ডসভা ও কমন্সসভা উভয় কক্ষেই সমান প্রাধান্য করিতেন। তাঁহাদের এই একচেটিয়া কর্তৃত্বের ভিত্তি ছিল একদিকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার, অপরদিকে সমান ত্রুটীপূর্ণ নির্বাচকমণ্ডলীর সংগঠন। 'কুক্ষিগত নির্বাচনীকেন্দ্র' (pocket boroughs) 'বিকৃত নির্বাচনীকেন্দ্র' (rotten

গণতন্ত্রের অগ্রগতির ইতিহাস

boroughs), প্রভৃতি নামেই প্রকাশ যে বহু নির্বাচনী কেন্দ্রের সংগঠনের বৈশিষ্ট্যের ফলে শুধু একটিমাত্র পরিবারের ইচ্ছানুসারেই নির্বাচন সারা হইত, এবং বহু নির্বাচনীকেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল নিতান্তই নামে, বিশেষ কোন পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের কমন্সসভায় আসন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত।

পরিবর্তন আসিল ১৮৩২ সালের সংশোধনী আইনের মারফৎ। ইহার পূর্বে বহুদিন হইতেই সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল। ১৮৩২ সালের আইন ভোটাধিকার বাড়াইয়াছিল ঠিকই; কিন্তু ইহার অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ অবদান হইল নির্বাচনীকেন্দ্রের, শহর-গ্রাম নিরপেক্ষ, একটিমাত্র নীতির ভিত্তিতে পুনঃসংগঠন।

তাহার পর ১৮৪৮ সালে আসিল চার্টিস্ট আন্দোলন (the Chartist Movement) তাহার 'জনতার দাবিপত্রে' (People's Charter) গণতন্ত্রের ছয় দফা মূল দাবিকে পুরোভাগে রাখিয়া : (১) সার্বজনীন পুরুষের ভোটাধিকার (universal manhood suffrage, (২) সমান নির্বাচনী কেন্দ্র (equal electoral district), (৩) গোপন 'ব্যালট' ভোট (voting by secret ballot), (৪) পার্লামেন্টে বাৎসরিক নির্বাচন (annual parliamentary elections), (৫) কমন্সসভার সদস্যপদের যোগ্যতার সম্পত্তিভিত্তিক মানের অবসান (abolition of property qualification for member of the House of Commons) এবং (৬) জাতীয় অর্থকোষ হইতে কমন্সসভার সদস্যগণের বেতনের ব্যবস্থা (payment of salaries to members out of the public treasury)।

চার্টিস্ট্ আন্দোলন দমিত হয়। কিন্তু সম্পত্তির ভিত্তিতে সদস্যপদের যোগ্যতা নির্ধারণ ১৮৫৮ সালে বর্জিত হয়। ১৮৬৭ সালের আইনের মারফৎ শহরবাসী শ্রমিকশ্রেণী ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়। কৃষিশ্রমিক ও খনিমজুরের ভোটাধিকার নির্দিষ্ট হয় ১৮৮৪ সালের আইনের দ্বারা। ১৯১৮ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত হয় ও নির্বাচনী পদ্ধতির অন্যান্য সংশোধন ঘটে। প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ভোটাধিকার স্থিরীকৃত হয় ১৯২৮ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব (সমান ভোটাধিকার) আইনের দ্বারা (The Representation of the people (Equal Franchise) Act of 1928)। ১৯৪৮ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের দ্বারা একাধিক ভোটের

অধিকার। (Plural voting) বাতিল করা হয়। প্রকৃতই ব্রিটেনে গণতন্ত্রের বয়স খুব বেশী নয়।

১৮৩১ সালে ব্রিটেনে জনসংখ্যার অনুপাতে পার্লামেণ্টের ভোটার সংখ্যা ছিল ২৪ জনে একজন। ১৮৩২ হইতে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত এ অনুপাত ছিল ১৬ জনে একজন। ১৮৬৭ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ইহা দাঁড়ায় ১২ জনে একজন। ১৮৮৫ হইতে ১৯১৮তে ইহা হয় ৭জনে একজন। ১৯১৮ সালের আইনের ফলে ভোটার সংখ্যা জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশে পরিণত হয়। ১৯২৮ সালের আইনের ফলে ইহা হয় অর্ধেকেরও অধিক। ১০০ বৎসরের মধ্যে ভোটার সংখ্যা জনসংখ্যার ৪ শতাংশ হইতে ৬০ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে।

কমন্সসভা কাহার প্রতিনিধি?

তত্ত্বগতভাবে ধরা যাইতে পারে যে কমন্সসভা জাতির প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় জীবনকে সর্বতোভাবে প্রতিফলিত করিবে; এই বিন্দুর মধ্যেই জাতীয় জীবনের সিন্ধুকে ধরা যাইবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এরূপ নহে।

ব্রিটেনের শতকরা দুইভাগ লোক অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ পাব্লিক স্কুলে শিক্ষালাভ করে; দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালের কমন্সসভার সদস্যবৃন্দের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক ছিলেন প্রাক্তন পাব্লিক স্কুলের ছাত্র। 'ইটন' (Eton) ও 'হ্যারো' (Harrow)-র ছাত্রদের প্রাধান্য বিশেষ করিয়া লক্ষণীয়। যদি শ্রমিক দলের সদস্যসংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে হয়ত সর্বসাধারণের 'গ্রামার স্কুলের' ছাত্রের আনুপাতিক হার আরও বাড়িতে পারে; কিন্তু শ্রমিক দলের সদস্যবৃন্দের মধ্যেও ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষাপ্রাপ্তের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী।

অনুরূপভাবে উপার্জন পদ্ধতিতেও জাতীয় জীবনের সঠিক প্রতিফলন কমন্সসভায় দেখা যাইবে না। তথাপি যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের গুণ অর্জন করা সহজে সম্ভব বিশেষ ধরণের শিক্ষা, বা বৃত্তি, বা উপার্জন পদ্ধতির মাধ্যমে,—যদিও এ বক্তব্য গণতন্ত্রের মূলনীতির সহিত কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে,—তথাপি দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন কমন্সসভার সদস্যবৃন্দের আনুপাতিক সংখ্যায় প্রতিফলিত হইবে ইহা নিশ্চয়ই আশা করা যায়। বাস্তবে তাহার বিপরীত চিত্রই লক্ষ্য করা যায়। নিম্নলিখিত তথ্য হইতে ব্যাপারটা বুঝা যাইবে:

		জাতীয় ভোটের শতাংশ	কমন্সসভার আসনসংখ্যার শতাংশ
১৯৩৫ সাল	রক্ষণশীল দল	৫৩·৬	৭০·৩
	শ্রমিক দল	৩৮·০	২৫·০
১৯৪৫ সাল	রক্ষণশীল দল	৪০ ০	৩৩·৩
	শ্রমিক দল	৪৮·০	৬১·৪
১৯৫০ সাল	রক্ষণশীল দল	৪৩·৪	৪৭·৯
	শ্রমিক দল	৪৬·৩	৫০·৪
১৯৫১ সাল	রক্ষণশীল দল	৪৮·১	৫১·৩
	শ্রমিক দল	৪৮·৭	৪৭·২
১৯৩৫ সাল	রক্ষণশীল দল	৪৯ ৭	৫৪·৬
	শ্রমিক দল	৪৬·৪	৪৪·০ *

দৃশ্যতঃই সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের সমর্থনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যার সহিত কমন্সসভার সদস্য সংখ্যার সামঞ্জস্যের অভাব রহিয়াছে। ইহার কারণ প্রধানতঃ তিনটি: (ক) শ্রমিক দলের সমর্থক কায়িক পরিশ্রমী শ্রমিকগণ কতকগুলি অঞ্চলে বেশী ভিড় করিয়া বাস করে। সুতরাং মোটামুটি বলা যায় যে রক্ষণশীল দলের সমসংখ্যক আসন লাভ করিতে হইলে শ্রমিক দলকে তাহাদের অপেক্ষা অন্ততঃ দুই শতাংশ (২%) বেশী ভোট পাইতে হইবে। (খ) উদারনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ কতকগুলি নির্বাচনী কেন্দ্রে বেশ কিছু ভোট পাইয়া ত্রিকোণ দ্বন্দ্বের (triangular contest) সৃষ্টি করেন। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভোটের অর্ধেকের কম ভোট পাইয়াও প্রার্থীগণের বিজয়ী হওয়া সম্ভব। (গ) কেন্দ্রগুলি হইতে একটিমাত্র প্রার্থী নির্বাচনের আইনের জন্যই এ অবস্থার উদ্ভব হয়। সুতরাং এই পরিপেক্ষিতে ব্রিটেনে বিভিন্ন সময়েই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) দাবি উঠিয়াছে। ইহার তুলনামূলক গুণাগুণ বিচার করিবার স্থান ইহা নয়; আমরা এস্থলে বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম মাত্র। †

১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইন ৫ বৎসরে পার্লামেন্টের কার্যাকালের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ঠিক পাঁচ বৎসর অন্তরই যে

* Carter, Herz, Ranney—Major Foreign Powers.

† এ বিষয়ে আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকদ্বয়ের লিখিত 'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান—দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১২০-১২৩' দ্রষ্টব্য

এখানে নির্বাচন হয় তাহা নহে। প্রথমতঃ যদি কমন্সসভায় অনাস্থা প্রকাশের ফলে ক্যাবিনেটের পতন হয়, তখন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী রাজা কমন্সসভার অবসান ঘটাইয়া নূতন নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় পার্লামেণ্ট আইন করিয়া নিজ কার্যকাল বাড়াইতে পারে। তৃতীয়তঃ, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী রাজা যেহেতু কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দেন, সেজন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য কমন্সসভার অবসান ঘটান হইতে পারে; ক্যাবিনেটের সমর্থক সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়ার ফলে এ পথ অবলম্বিত হইতে পারে; নির্বাচনে নিজ দলের বিজয়ের আশায় সুযোগ-সুবিধা দেখিয়া প্রধানমন্ত্রী রাজাকে এ পরামর্শ দিতে পারেন। এই অবস্থাগুলির কথা বাদ দিলে বলা যায় যে ব্রিটেনে পূর্ণ পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে নির্বাচন ঘটে—কমই।

কমন্সসভার কার্যকাল

পার্লামেণ্টের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি কথাকে এই সুযোগে পরিচিত করিয়া লওয়া ভাল। সেগুলি হইল adjournment বা বৈঠক মুলতুবী রাখা; prorogation বা একটি বিশেষ 'সেসন' বা অধিবেশনের সমাপ্তি; এবং dissolution বা কমন্সসভার অবসান। দুইটি কক্ষই নিজ ইচ্ছামত বৈঠক মুলতুবি রাখিতে পারে। অধিবেশনের সমাপ্তি রাজাজ্ঞা মারফৎ ঘটাইতে হয়; উভয় কক্ষের অধিবেশন একই সঙ্গে বন্ধ করিতে হয় এবং পরবর্তী অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করিতে হয়। অধিবেশনের সমাপ্তিতে অসমাপ্ত কার্য্যগুলি নূতন 'সেসনে' পুনরায় সুরু করিতে হয়। অবশ্য নূতন অধিবেশনের তারিখ নূতন ঘোষণার দ্বারা আগাইয়া-পিছাইয়া লওয়া যায়। রাজাজ্ঞায় কমন্সসভার অবসান ঘটিলে নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কার্যপদ্ধতি

কোরাম (Quorum)

কমন্সসভায় কমপক্ষে ৪০ জন সদস্য, অর্থাৎ মোট সংখ্যার ৭ শতাংশ, উপস্থিত থাকিলেই কার্য চলিতে পারে।

কমন্সসভার সদস্যগণ কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করেন। প্রথমতঃ পার্লামেণ্টের বক্তৃতায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ বাক্‌স্বাধীনতা রহিয়াছে। কক্ষের বাহিরে যে কথা বলিলে মামলায় পড়িতে হইত সেরূপ নিন্দাসূচক মন্তব্য বা অভিযোগ কোন সদস্য করিতে পারেন। সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে কি না তাহা 'স্পীকার

কমন্সসভার বিশেষ অধিকার (Privileges)

দেখিবেন। (২) কোন দেওয়ানি মামলার জন্য সদস্যকে গ্রেপ্তার করা চলে না; তবে সে নিয়ম আজকাল উঠিয়া গিয়াছে। ফৌজদারী অপরাধে কক্ষের বাহিরে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে। (৩) নিজস্ব কার্যক্রম কার্যপদ্ধতি এবং শাসনতন্ত্র নির্ধারণ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। এ অধিকার পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের নীতির সহিত জড়িত। সদস্যদিগের আইনগত অযোগ্যতার (disqualifications) মান নির্ণয় করা, কোন সদস্যকে বহিষ্কার করা, প্রভৃতির চূড়ান্ত ক্ষমতা কমন্সসভারই রহিয়াছে। (৪) কমন্সসভার সম্মানহানির অভিযোগে কমন্সসভা কাহারও বিচার ও দণ্ডদান করিতে পারে। (৫) সামগ্রিকভাবে 'স্পীকারের' মারফৎ রাজার নিকট বক্তব্য উপস্থিত করিবার অধিকার আছে; এবং (৬) কমন্সসভার কার্যাবলীর সর্বোত্তম অর্থই রাজা গ্রহণ করিবেন ইহাও কমন্সসভার অন্যতম অধিকার। তবে রাজার ক্ষমতা হ্রাসের সহিত শেষ দুইটি অধিকারের গুরুত্বও হ্রাস পাইয়াছে।

সদস্যপদ ত্যাগ (Resignation)

কমন্সসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিবার কোন অধিকার নাই। এ আইন ১৬২৩ সাল হইতে প্রচলিত আছে। এককালে সদস্যপদের ভার ত্যাগ করিতে পারিলে অনেক সদস্যই বাঁচিয়া যাইতেন; সেজন্যই পলাইবার পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা। তথাপি পদত্যাগ করিবার প্রকৃত প্রয়োজন উপস্থিত হয়। সে সুযোগ ঘটাইয়া দিয়াছে রাজকর্মচারী আইন (Placemen Act of 1705)। এ আইনে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা রাজার অধীনে অর্থকরী কার্যভার গ্রহণ করিবেন (an office of profit) তাঁহারা কমন্সসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। এ আইনও একদা প্রণীত হইয়াছিল যাহাতে সদস্যগণ রাজার নিকট হইতে ঘুষ লইয়া কমন্সসভায় রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট না হন। যাহা হউক বর্তমানে এ আইনের সাহায্যেই সদস্যগণ পদত্যাগ করিয়া থাকেন।

চিল্‌টার্ণ হাণ্ড্রেডস্ (Chiltern Hundreds) নামক রাজার একটি নামমাত্র জমিদারি আছে; বাস্তবে এ জমি বহুদিন সর্বসাধারণের ব্যবহারের পার্কে পরিণত হইয়াছে। যে সদস্য পদত্যাগ করিতে চাহেন তিনি অর্থমন্ত্রীর (Chancellor of the Exchequer) নিকট এই জমিদারির পরিচালকের পদ (Stewardship of the Chiltern Hundreds) প্রার্থনা করিয়া আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। আবেদন তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য হয় এবং সরকারী গেজেটে ইহা ঘোষিত হয়। 'স্পীকার' তখন জানান যে উক্ত সদস্যের অযোগ্যতার জন্য

কমন্সসভার আসন শূন্য হইয়াছে। তখন পরিচালক মহাশয় আবার চাকুরী ত্যাগের পত্র পাঠাইয়া পরবর্তী প্রার্থীর পথ পরিষ্কার করিয়া রাখেন।

স্পীকার (Speaker) : কমন্সসভার সভাপতি 'স্পীকার নামে অভিহিত। তিনি সর্বদাই কথা বলেন বলিয়া এ অভিধা লাভ করেন নাই; বরং তাঁহাকেই বসিয়া সকলের কথা শুনিতে হয়। আসলে তিনি সকলের হইয়া কথা বলেন। একদিন ছিল যখন কমন্সসভা আইন প্রণয়ন করিত না, শুধুই রাজার নিকট আবেদন পেশ করিতে পারিত। তখন কমন্সসভার মুখপাত্র হইয়া রাজার সহিত যিনি কমন্সসভার অভিপ্রায় নিবেদন করিতেন, তিনিই স্পীকার; কারণ তিনি কমন্সের হইয়া কথা বলিতেন।

পূর্বে রাজা স্বীয় পছন্দমত স্পীকার নিয়োগ করিতেন। এখনও আনুষ্ঠানিক-ভাবে রাজাই নিয়োগ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কমন্সসভাই স্পীকারকে নির্বাচন করেন। বস্তুতঃ ১৬৭৯ সালের পর হইতে কমন্সসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়োগে রাজা কখনও অসম্মত হন নাই।

নিয়ম হইল, প্রতি নূতন সাধারণ নির্বাচনের পর কমন্সসভা কার্যারম্ভের সুরুতেই স্পীকার নির্বাচন করে। কার্যতঃ পূর্ববর্তী স্পীকার সুস্থ ও সক্ষম থাকিলে এবং নির্বাচিত হইতে ইচ্ছুক থাকিলে, তাঁহাকেই বারবার নির্বাচন করা হয়। তবে যদি প্রাক্তন স্পীকারের অভাবে নূতন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী এমন প্রার্থী বাছাই করেন যিনি কমন্সসভার সর্ব অংশেরই মনঃপূত হইবেন এবং এ বিষয়ে তিনি বিরোধী দলের সহিত পরামর্শ করেন। যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহাকেও এ কার্যের জন্য বাছাই করা হয় না। স্পীকার কমন্সসভার সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন এবং তিনি যে দলীয় প্রার্থী নহেন তাহারই নিদর্শন স্বরূপ সাধারণ দুইজন সদস্যের দ্বারা তাহার নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়।

স্পীকার নির্বাচন

নির্বাচনের পরমুহূর্ত হইতে স্পীকার সর্ববিধ দলীয় সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তিনি কখনও বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; নিতান্ত উভয়পক্ষে সমসংখ্যক ভোট পড়িবার ফলে অচল পরিস্থিতির (tie) উদ্ভব না হইলে তিনি ভোট দেন না। এরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহার ভোট এমন ভাবেই পড়িবে যাহাতে সেই ভোটেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইয়া আলোচনা আরও চলিতে পারে। তিনি দলীয় সভায় উপস্থিত থাকেন না;

স্পীকারের নিরপেক্ষতা

দলীয় সংবাদপত্রের সহিত সম্পর্ক রাখেন না; কোন বিতর্কমূলক রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে জনসমক্ষে ব্যক্তিগত মত পেশ করেন না। কমন্সসভার কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি দলীয় সহানুভূতি ও ব্যক্তিগত মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিতান্তই কার্যপদ্ধতির নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হন। এ বিষয়ে কমন্সসভার নজির, রীতিনীতি ও নিয়ম কানুন তাঁহার নিয়ামক।*

রাষ্ট্রনৈতিক দলীয় সংঘর্ষে অংশগ্রহণের উত্তেজনা, আনন্দ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলেও, পরিবর্তে স্পীকারের প্রাপ্য অসাধারণ সম্মান ও মর্যাদা। তাঁহার নিরপেক্ষতার স্বীকৃতি থাকে সাধারণ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার নির্বাচনের ভিতর। ফলে, তাঁহার কেন্দ্রে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। কিন্তু স্পীকারের পুনর্নির্বাচন এমনই সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে ১৯৩৫ সালে শ্রমিক দল যখন স্পীকারের কেন্দ্রে অপর প্রার্থীর মারফৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন সে প্রার্থী যে বিপুল ভোটে পরাজিত হইয়াছিল তাহাই নহে, সাধারণের মধ্যেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিক্ষোভ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

স্পীকারের প্রাপ্য

স্পীকার বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড বেতন পান এবং ওয়েষ্টমিনষ্টারে বিনা ভাড়ায় সরকারী বাসস্থান। অবসর গ্রহণের পর যথাযোগ্য পেন্সন এবং লর্ডসভায় আসনও তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট থাকে।

স্পীকারের কার্যভার

কমন্সসভার প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসাবে স্পীকার রাজার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন। কোন আসন শূন্য হইলে তিনি নির্বাচনের নির্দেশ দান করেন। কমন্সসভার মর্যাদা হানির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় হুকুমনামা তাঁহার আজ্ঞায় প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন অনুযায়ী 'অর্থবিলের' নিদর্শ পত্র তাঁহাকে দিতে হইবে এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতই চূড়ান্ত। কমন্সসভার সভাপতি হিসাবে তাঁহাকে সভা পরিচালনা করিতে হয়।

সভাপতির দায়িত্ব নানাবিধ ও বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। সভার নিয়ম-কানুন চালু রাখা, শৃঙ্খলা ও ভব্যতা বজায় রাখা, তাঁহার দায়িত্ব। পর পর বক্তাকে তিনি বলিতে আহ্বান করেন; একাধিক বক্তা বলিতে চাহিলে অগ্রাধিকার তিনিই নির্দেশ করেন। অপ্রাসঙ্গিক ও অনুচিত বক্তব্যের জন্য বক্তাকে তিনি সাবধান

* "He is, as near as a human being can be, the rules and practice of the House come to life without interposition of his personal or party view." Finer : The Theory and Practice of Modern Government.

করিয়া দিতে পারেন। প্রয়োজনবোধে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। বারবার এবং গর্হিত অন্যায়ের জন্য তিনি সভাকক্ষ হইতে সদস্যকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন, প্রয়োজনে সদস্যপদ স্থগিত (Suspend) রাখিতে পারেন। সকল বক্তাই তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা করেন। শৃঙ্খলার প্রশ্নে (points of order) সঠিক কর্তব্য তিনিই নির্ধারণ করেন। অবশ্য অন্যান্য বিষয়ের মত এ ব্যাপারেও তিনি রীতিনীতি ও নজির অনুযায়ী মত দেন এবং তাঁহার রায়ই চূড়ান্ত। প্রয়োজনবোধে তিনি কমন্সসভার 'কেরাণী'র (clerk) পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। মন্ত্রিদের প্রতি উদ্দিষ্ট কোন প্রশ্নে তিনি সম্মতি নাও দিতে পারেন; অনুরূপ 'মুলতুবী প্রস্তাবও রীতিসম্মত না হইলে তাঁহার অনুমতি মিলিবে না। বহুসংখ্যক সংশোধনী প্রস্তাব থাকিলে, তাহাদের ভিতর আলোচনার জন্য বাছাই করিয়া কিছু রাখা ও বাকি বাতিল করিবার অধিকার তাঁহার আছে। সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষণ তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব। সেই জন্যই বিতর্ক বন্ধ করিবার প্রস্তাব (closure motion) তাঁহার অনুমতি ব্যতীত উত্থাপন করা যাইবে না এবং সভার সকল অংশের মতামত উপযুক্তরূপ প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিতর্ক চলিবার সুযোগ দিবেন। কর্ণেল ডগ্‌লাস ক্লিফ্‌টন ব্রাউন স্পীকারের ভূমিকার একটি অতি সুন্দর পরিচিতি দিয়াছেন: "স্পীকার হিসাবে আমি সরকার পক্ষের বা বিরোধীপক্ষের লোক নই; আমি সমগ্র কমন্সসভার পক্ষভুক্ত লোক; এবং, আমার বিশ্বাস, সবার পিছনের সারিতে যাঁহারা বসিয়া আছেন সর্বাগ্রে তাঁহাদেরই লোক ("As speaker, I am not the Government's man, nor the opposition's man. I am the House of Commons' man and I believe, above all, the backbenchers' man.")। বর্তমান যুগে কঠিন দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে পার্লামেণ্টের উপর ক্যাবিনেটের প্রাধান্য যখন সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন কমন্সসভার অধিকার সংরক্ষণে, বিশেষ করিয়া কমন্সসভার আলোচনায়, সর্বপ্রকার মতামত প্রকাশের সুযোগদানে, স্পীকারের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থার সহিত তুলনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিসভার স্পীকারের সহিত কমন্সসভার স্পীকারের তুলনা (A comparison between the Speaker of the House of Representatives and the Speaker of the House of Commons):

১। ব্রিটিশ কমন্সসভার স্পীকারের নিরপেক্ষতা তাঁহার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। তুলনায় মার্কিন প্রতিনিধিসভার স্পীকার হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অন্যতম প্রধান নেতা। নির্বাচনের পর কমন্সসভার স্পীকার নিজদলের সহিত সম্পর্ক ছেদ করেন; প্রতিনিধিসভার স্পীকার তাহা করেন না, বরং দলের সহিত ঘনিষ্ঠতা তাঁহার বাড়িয়া যায়। বস্তুতঃ ১৯০১ সালের পূর্বে তিনিই প্রতিনিধিসভায় দলের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন। ১৯১১ সালের আইনে তাঁহার ক্ষমতাবলী বেশ কিছুটা কর্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও এখনও তিনি দলের পক্ষে বক্তৃতা করেন, ভোট দেন, এমন কি 'বিলও' উত্থাপন করেন। আসলে তিনি স্বীয় দলেরপক্ষে নীতি-নির্ধারক ও আন্দোলনপরিচালক, দলীয়তার গভীরতম অর্থে তিনি সরবে দলীয় এবং পক্ষভুক্ত।* ব্রিটিশ স্পীকারের পক্ষে এভূমিকা অকল্পনীয়।

ব্রিটিশ স্পীকার নিরপেক্ষ: মার্কিন স্পীকার দলের নেতা

দলীয় সুবিধা অসুবিধা নির্বিচারে ব্রিটিশ স্পীকার যেখানে কমন্সসভার নিয়ম ও রীতিনীতি প্রয়োগ করিয়া যান, মার্কিন স্পীকার কিন্তু নিয়মের ব্যাখ্যায়, বিভিন্ন কমিটিতে নিয়োগে এবং প্রতিনিধিসভার কার্যপদ্ধতির নিয়ন্ত্রণে, সাধ্যমত দলীয় স্বার্থ সিদ্ধ করিতে চেষ্টিত হন। সভার কার্য পরিচালনা ও কার্যসূচী প্রণয়নের ব্যাপারে এমন বহু ক্ষমতা মার্কিন স্পীকার ভোগ করেন যেগুলি ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

কার্যপরিকল্পনায় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

উপরোক্ত কারণবশতঃ কমন্সসভার স্পীকারের পুনর্নির্বাচন অবধারিত; আদিতে তিনি যে দলের সদস্য ছিলেন, পরে তাহার বিরুদ্ধপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেও, পূর্বতন স্পীকারই পুনরায় নির্বাচিত হন। আমেরিকার প্রতিনিধিসভায় সেক্ষেত্রে স্পীকারের পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্য এবং দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ী স্পীকার নির্বাচিত হন। ঠিক একই ভাবে সাধারণ নির্বাচনে ব্রিটেনে স্পীকারের কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত তীব্র ও তিক্তরূপ ধারণ করে।

সভার সভাপতিত্বে বৃটেনে স্পীকারের পুনর্নিবাচন নিশ্চিত

আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবধারিত

* ("He is one of the small knot of policy-makers and campaign leaders,—partisan in the profoundest and most vociferous sense.' —Finer : *Ibid.*)

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বিভিন্নতার মূল রাষ্ট্রনৈতিক কারণ হইল,—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবিভাজন নীতি কার্যকরী করা হইয়াছে এবং ব্রিটেনে ক্যাবিনেট শাসনের উদ্ভবের ফলে তাহা হয় নাই। কমন্সসভার স্পীকার মার্কিন প্রতিনিধিসভার স্পীকারের ন্যায় সক্রিয় দলনেতা হইলে তিনি কমন্সসভার নেতৃত্বে ক্যাবিনেটের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিসভায় ক্যাবিনেটের মত সার্বিক নেতৃত্ব উপস্থিত থাকিবার সুযোগ না থাকাতে নেতা অন্বেষণ করিতে হইয়াছে। স্বভাবতঃ যিনি ইতিমধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করিয়া আছেন, ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ক্রমেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং ইহা আমেরিকানদিগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে। ব্রিটেনে স্পীকার যদি নিরপেক্ষ না হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বার বার নির্বাচনের প্রশ্ন উঠিত না। নিরপেক্ষতাই তাঁহার পুনর্নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। কিন্তু সভাপতি নিরপেক্ষ হইলেই তাঁহাকে পুনর্বার নির্বাচন করিতে হইবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি হইতে পারে না। স্পীকারের পুনর্নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি হইল নিম্নরূপ: (১) ইহার মাধ্যমে কার্যপদ্ধতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে; (২) পদের স্থায়িত্ব হইতে সভা পরিচালনায় ব্যক্তির কর্তৃত্বও বৃদ্ধি পায়; এবং (৩) এই নির্বাচন লইয়া মতপার্থক্য ও বিতর্কের অতি সামান্যই সুযোগ থাকে। *

পার্থক্যের কারণ

কমন্সসভায় প্রত্যহ বৈঠকের সুরুতে অনধিক এক ঘণ্টা প্রশ্নোত্তরের জন্য Question Hour) নির্দিষ্ট থাকে। প্রশ্ন মন্ত্রিগণের প্রতি উদ্দিষ্ট হয়। ইহা দৈনন্দিন কার্যসম্পর্কীয় নির্দেশনামায় প্রকাশিত হয়। প্রশ্নের উদ্দেশ্য হইল তথ্য আহরণ করা (to elicit information); ইহাতে "যুক্তিতর্ক, পূর্বসিদ্ধান্ত, আরোপিত অর্থ, স্তুতি, নিন্দা বা ব্যঙ্গ" থাকিবে না (It should not contain "argument, inference, imputations, epithet or ironical expression.")। সুতরাং স্পীকার প্রশ্ন বাতিল করিতে পারেন। অতিরিক্ত প্রশ্ন করা (Supplementary questions) চলিতে পারে, অবশ্য তাহাও স্পীকারের অনুমতি সাপেক্ষ। প্রশ্নের উত্তরে কমন্সসভা সন্তুষ্ট হইল কি না তাহা জানিবার কোন উপায়

প্রশ্নের ঘণ্টা

*("This provides both continuity of practice, the authority of permanence, and the minimum of controversy."—Finer. *Ibid.*)

নাই; কারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেলে পরবর্তী প্রশ্নোত্তর সুরু হয়। উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া যদি ৪০ জন সদস্য সভার কার্যক্রম মুলতুবী রাখিবার প্রস্তাব করেন, তবেই সে বিষয়ে বিতর্ক ও ভোট লইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পদ্ধতির দিক হইতে ফ্রান্স বা ইউরোপের অন্য অনেক দেশে 'প্রশ্নোত্তরের' প্রথা (Interpellation) হইতে ইহা ভিন্ন। সেখানে মন্ত্রির উত্তরের উপর প্রায় সর্বদাই বিতর্ক হয় ও ভোট গৃহীত হয়। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো যায় না, কিন্তু মন্ত্রিসভা ও সরকারী কর্মচারীদের সতর্ক ও সজাগ রাখিতে সাহায্য করে।

আলোচনা সংক্ষেপের বিভিন্ন পদ্ধতি

কমন্সসভার মত বৃহৎ সভায় সকল সদস্য যদি সব বিষয়েই বলিতে চাহেন, তবে স্বভাবতঃই খুব কম বিষয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব। ফলে, অন্যান্য সভার মতই কমন্সসভাকেও আলোচনা সংক্ষেপের নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিতে হইয়াছে।

অবশ্য ক্যাবিনেট প্রণীত কার্যক্রম লইয়া সরকার ও বিরোধীপক্ষের হুইপ্-দিগের (whips) মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বক্তার সংখ্যা, নাম ও সময় মোটামুটি স্থির হইয়া যায়। কিন্তু ইহা মীমাংসার পথ। আলোচনা বন্ধ করিবার পদ্ধতিগুলি হইল নিম্নরূপ :

১। **ক্লোজার (Closure) :** আলোচনা বন্ধের উদ্দেশ্যে যে কোন সদস্য "প্রশ্নটি এইবার রাখা হউক" ("The question be now put") এ প্রস্তাব আনিতে পারেন। যদি স্পীকার আপত্তি না করেন, তবে তৎক্ষণাৎ ভোট গ্রহণ করা হয়। অবশ্য অন্ততঃ ১০০ জনের সমর্থন প্রয়োজন।

২। **সীমাবদ্ধ ক্লোজার (Closure by compartments) ;** অনেক সময় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রস্তাব করেন যে বিলের কয়েকটি ধারা (ধরা যাক, ৮ হইতে ১৩ ধারা) এইবার "বিলের অংশ হিসাবে গৃহীত হউক" ("Stand part of the bill")। স্পীকারের অনুমতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন মিলিলে এই ধারাগুলি সম্বন্ধে বিতর্ক বন্ধ হইবে।

৩। **'ক্যাঙ্গারু ক্লোজার' (Kangaroo Closure) :** এ ব্যবস্থায় স্পীকার, বা সমগ্রকক্ষ কমিটির সভাপতি, বহুসংখ্যক সংশোধনী প্রস্তাবের ভিতর হইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি বাছিয়া তাহার উপর মতামত গ্রহণ করিতে পারেন। অন্যান্য সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিতই হইবে না।

৪। **গিলোটিন (Guillotine) :** অনেক সময়ে কমন্স সভা পূর্ব হইতেই আলোচনার সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখে। সময় উত্তীর্ণ হইলে, আলোচনা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, সংক্ষেপণের অনিবার্য্য খড়্গ নামিয়া আসিয়া বিতর্ক বন্ধ করিয়া দিবে।

কমিটি ব্যবস্থা (The Committee System) : বৃহৎ সভাকে অল্প সময়ে যদি বহু জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তবে কমিটির মারফতে কাজ করা প্রায় অবধারিত। কমন্সসভাও খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ইহার উপকারিতা হইল : (১) কমিটির স্বল্পসংখ্যক সদস্য অনেক সময় ধরিয়া খুঁটিনাটি বিষয় পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া খসড়া প্রস্তাবের উন্নতি সাধন করিতে পারেন ; (২) কমিটিতে সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞ ও আগ্রহশীল ব্যক্তিদের স্থান দেওয়া হয়। ফলে প্রস্তাবের যথাযোগ্য বিচার হওয়ার সুযোগ থাকে : (৩) কমন্সসভার সময় অনেক বাঁচিয়া যায়। কমন্সসভায় যে কোন বিলের দ্বিতীয় পাঠের পর, অর্থাৎ বিলটির মূলনীতি লইয়া কমন্সসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই, সেটিকে কমিটির সভায় বিশদ বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়।

কমন্সসভা সাধারণতঃ নিম্নরূপ বিভিন্ন কমিটির সহায়তায় কার্য নির্বাহ করে : (১) সমগ্র কক্ষ কমিটি (Committee of the Whole House), (২) সিলেক্ট কমিটি (Select Committee), (৩) স্থায়ী কমিটি (Standing Committee), (৪) অধিবেশনকালীন কমিটি (Sessional Committee), (৫) প্রাইভেট বিল কমিটি (Private Bill Committee)।

সমগ্র কক্ষ কমিটি

সমগ্র কক্ষ কমিটির বৈশিষ্ট্য হইল : (ক) স্পীকার ইহার সভাপতিত্ব করেন না, অপর একজন সদস্য সভাপতিত্ব করেন। (খ) সভায় কমন্সসভার অনুষ্ঠান বহুল পরিমাণে বর্জিত হয় ;—স্পীকারের কর্তৃত্বের প্রতীক 'গদা' (Speaker's Mace) সরাইয়া লওয়া হয় ; সভাপতি কেরাণীর (Clerk of the House) আসনে উপবেশন করেন ; দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তাবের সমর্থনে (seconding) প্রয়োজন হয় না ; সদস্যগণ একাধিকবার বক্তৃতা করিতে পারেন ; আলোচনা সংক্ষেপের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। এই ঢিলেঢালা পদ্ধতিতে আলোচনা চালাইয়া ছোটখাট সংশোধন করা অনেক সহজ, আপোষ মীমাংসার সুযোগ এখানে যথেষ্ট। সাধারণতঃ অর্থ বিল, জরুরী কারণে কমন্সসভার দ্বারা নির্দিষ্ট বিল, ও ক্যাবিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব সামান্য (৬০-এর কম) হইলে বিভিন্ন বিল, সমগ্র কক্ষ কমিটির দ্বারা বিচারিত হয়।

আইন প্রণয়নে প্রয়োজন এমন কোন বিশেষ বিষয়ের উপর অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করিবার জন্য মাঝে মাঝে ১৫ জন সদস্যের সিলেক্ট কমিটি (Select Committee) গঠন করা হয়। ইহারা তথ্য সংগ্রহ করেন, সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, এবং সমস্ত দলিলপত্র সমেত নিজ সিদ্ধান্ত কমন্সসভার নিকট পেশ করেন।

সিলেক্ট কমিটি

কমন্সসভার অধিবেশনের সুরুতে ১১ জনের একটি বাছাই করিবার জন্য গঠিত কমিটির (Committee of Selection) দ্বারা সিলেক্ট কমিটির সদস্যগণ নির্ধারিত হন। কমিটির সভাপতি ইহারা নিজেরাই নির্ব্বাচন করেন। রিপোর্ট পেশ করা হইয়া গেলে কমিটির আর অস্তিত্ব থাকে না।

স্থায়ী কমিটি

পার্লামেণ্ট গঠিত হইবার প্রথম সেশনের সুরুতেই কয়েকটি স্থায়ী কমিটি (Standing Committees) গঠন করা হয়। এইরূপ কমিটির সংখ্যা সাধারণতঃ চারটি, তবে ছয় পর্যন্তও উঠিতে পারে। সেশন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত ইহারা কার্যকরী থাকে। প্রায় প্রতিটি কমিটিই আয়তনে বৃহৎ : ইহাদের নিয়মিত সদস্য সংখ্যা ২০ জন ; তবে কোন বিশেষ বিলের বিবেচনার সময় কমিটি অব সিলেকশন বা 'বাছাই কমিটি' আরও ৩০ জন পর্যন্ত অতিরিক্ত সদস্য জুড়িয়া দিতে পারেন। স্থায়ী কমিটিগুলি কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য বা বিলের বিবেচনার জন্য গঠিত হয় না। ইহাদের A, B, C কমিটি ও স্কটিশ্ কমিটি বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং স্পীকার মহোদয় এই কমিটিগুলিতে যদিচ্ছা বিভিন্ন বিল প্রেরণ করিয়া থাকেন। কমিটির সভাপতিত্বের জন্যও স্পীকারই সভাপতির তালিকা (Panel of Chairmen) হইতে নাম বাছাই করিয়া দেন ; এ তালিকাও তিনিই প্রস্তুত করেন। কমন্সসভায় বিলের দ্বিতীয় পাঠের পর কমিটিতে বিলটি আসে এবং কমিটি তাহার খুঁটিনাটি বিষয় বিচার করিয়াই বিলটিকে মার্জিত করিয়া তুলে। প্রত্যেকটি বিল সম্পর্কেই কমিটিকে পার্লামেন্টে রিপোর্ট দাখিল করিতে হয়।

সেশনাল কমিটি

সেশনাল কমিটিগুলি (Sessional Committees) প্রতি অধিবেশনের সুরুতে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য গঠিত হয়, যথা, পার্লামেন্টের নিকট আবেদন পত্র বিচার, ইত্যাদি।

প্রাইভেট বিল কমিটি

পার্লামেন্টের সম্মুখে আনীত প্রাইভেট বিলের বিচারের জন্য প্রাইভেট বিল কমিটি গঠিত হয়। প্রাইভেট বিলের সংখ্যার উপর কমিটির সংখ্যা নির্ভর করে। কমন্স সভায় এইরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা হয় চার এবং লর্ডসভার হয় পাঁচ। এইরূপ কমিটিতে নিযুক্ত সদস্যগণকে ঘোষণা করিয়া জানাইতে হয় যে বিল-বর্ণিত বিষয়ে তিনি মোটেই স্বার্থযুক্ত বা

আগ্রহশীল নহেন এবং সুচিন্তিত নিরপেক্ষতার সহিত কার্যতায় সম্পন্ন করিতে হয়।

১। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নহে, ফ্রান্সেও আইনসভার সদস্যগণের মধ্যে বিশেষজ্ঞ লইয়া কমিটি গঠিত হয়: যথা, পররাষ্ট্র বিষয়ক, অর্থবিষয়ক বা শ্রমিক বিষয়ক কমিটি ঐসকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও আগ্রহশীল ব্যক্তি লইয়া গঠিত হয়। ফলে প্রতিটি কমিটিই বিশেষজ্ঞ কমিটিতে পরিণত হয়। ব্রিটেনে বিষয়-নিরপেক্ষ কমিটি গঠিত হয়; পরে বিশেষ বিল প্রেরিত হইলে ঐ বিষয়ে আগ্রহশীল ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কমিটিতে জুড়িয়া লওয়া হয়। আমেরিকায় বিল যায় বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট। ব্রিটেনে বিশেষজ্ঞগণ বিলকে অনুসরণ করিয়া কমিটিতে হাজির হন।

ব্রিটিশ ও মার্কিন কমিটি ব্যবস্থার পার্থক্য

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি সভায় দ্বিতীয় পাঠের পূর্বেই বিল কমিটির নিকট প্রেরিত হয়, ব্রিটেনে প্রেরিত হয় দ্বিতীয় পাঠের পরে। ফলে, মার্কিন প্রতিনিধি সভার কমিটি বিলের মূলনীতি লইয়া বিচার করিতে পারে ও প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধন করিতে পারে। ব্রিটিশ কমিটির ভূমিকা হইল অধস্তন সংশোধনী সংস্থার (secondary amending bodies) ভূমিকা, কমন্সসভায় গৃহীত মূলনীতি মানিয়া লইয়াই তাহাকে খুঁটিনাটিতে বিলের সংশোধন করিতে হইবে। মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ইহা ব্রিটিশ কমিটি-প্রথার দুর্বলতার পরিচায়ক; কিন্তু ব্রিটিশ মনোভাব হইল,— কমিটির পক্ষে বিলের মূলনীতি বিচার বা সংশোধন কমন্সসভার ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়ার অপচেষ্টা মাত্র।

এ পার্থক্যের মূল অবশ্য অন্যত্র। ব্রিটেনে কমন্সসভার প্রকৃত নেতা হইল ক্যাবিনেট। কমিটিগুলি বিশেষজ্ঞ হিসাবে মূলনীতি নির্ধারণে অগ্রসর হইলে ক্যাবিনেট নেতৃত্বকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষুণ্ণ করা হয়। আমেরিকায় ক্ষমতা বিভাজনের ফলে, প্রতিনিধিসভা বা সিনেটের এরূপ কোন স্থায়ী নেতৃত্ব নাই। সুতরাং কংগ্রেসকেই নিজস্ব নেতৃত্ব খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছে; বিলের খসড়া করা হইতে সুরু করিয়া, কংগ্রেসে তাহাকে উত্তরণ করিয়া আইনে পরিণত করিবার সামগ্রিক দায়িত্ব, এই বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলিকেই লইতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি-গুলির এ ভূমিকা অপরিহার্য, অথচ ব্রিটেনের নিজস্ব ক্যাবিনেট ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর।

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটিগুলি প্রয়োজনমত সাক্ষী ডাকিয়া মতামত সংগ্রহ করিতে পারে; ব্রিটেনের স্থায়ী কমিটি তাহা পারে না।

আইন-প্রণয়ন : আইনের খসড়া প্রস্তাবকে বিল (Bill) বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিলের শ্রেণীবিভাগ আমরা দুই নীতির ভিত্তিতে করিতে পারি,—(ক) উদ্দেশ্য এবং (খ) প্রস্তাবকের পরিচিতি। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিলগুলির শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ : (১) যে সকল বিল সর্বসাধারণের, অন্ততঃ ব্যাপক জনসমাজের, স্বার্থ সম্পর্কিত ("one which affects the general interest and ostensibly concerns the whole people, or, at any rate, a large portion of them") তাহাদিগকে পাব্লিক বিল বলা হয়; যেগুলি কোন একটি অঞ্চল, মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন, অথবা, ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ("the interest of some one locality or corporation, municipality or other particular person or body of persons") তাহারা প্রাইভেট বিল বলিয়া পরিচিত। কর নির্ধারণ, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা, ভোটাধিকার, প্রভৃতি বিষয়ের বিল প্রথমোক্ত বিভাগে পড়িবে; দ্বিতীয় বিভাগের উদাহরণ স্বরূপ কোন মিউনিসিপ্যালিটিকে গ্যাস ক্রয় বিক্রয়ের সংক্রান্ত বিলের উল্লেখ করিতে পারি। ইহা ছাড়া কিছু মিশ্র বিল (hybrid bills) থাকিতে পারে, যেগুলির পূর্বোক্ত উভয় বিভাগের বৈশিষ্ট্যই রহিয়াছে।

বিল (Bill)

প্রস্তাবকের পরিচিতির ভিত্তিতে বিলগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(১) সরকারী (Government Bills) ও (২) বেসরকারী (Private Members' Bills) বিল। বিল যদি কোন মন্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে বিলটিকে সরকারী বিল বলা হইবে; সাধারণ সদস্যের দ্বারা প্রস্তাবিত বিল বেসরকারী বিল বলিয়াই পরিচিত। সরকারী বিলেরও দুইটি বিভাগ রহিয়াছে : (১) অর্থ বিল (Money Bills) ও (২) অন্যান্য (Others); অর্থ বিলের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে অর্থ বিল কখনও বেসরকারী বিল হইতে পারে না। কারণ, রাজার অনুমতি ব্যতীত অর্থ বিল উত্থাপিত হইতে পারে না এবং সে অনুমতির ভিত্তিতে প্রস্তাব উত্থাপন একমাত্র মন্ত্রিসভার তরফ হইতেই করা সম্ভব।
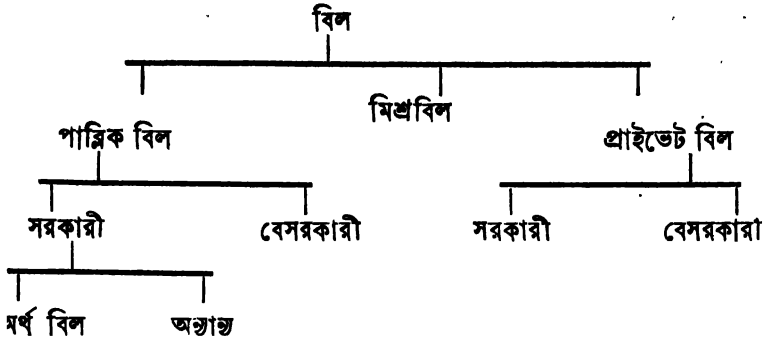
প্রথমতঃ. আমরা অর্থ বিল নহে এরূপ সরকারী পাব্লিক বিল লইয়া আলোচনা করিব এবং তাহার পর অর্থ বিল, বেসরকারী বিল এবং প্রাইভেট বিলের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় তাহা বর্ণনা করিব।

বিল পাস করিবার পদ্ধতি

আলোচ্য বিল অবশ্য দুইটি কক্ষের যে কোনটিতেই উত্থাপিত হইতে পারে, যদিও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিল নিম্নকক্ষেই প্রথম আলোচিত হয়। যে কোন কক্ষেই পাস করিতে গেলে তাহাকে পাঁচটি পর্যায়ের ভিতর দিয়া যাইতে হয়; যথা—(১) বিল উত্থাপন বা প্রথম পাঠ, (২) দ্বিতীয় পাঠ, (৩) কমিটি পর্যায়, (৪) কমিটির রিপোর্ট ও (৫) তৃতীয় পাঠ। নিম্নে উপরোক্ত পর্যায়গুলি বর্ণনা করা হইল।

বিল উত্থাপন করিতে গেলে উত্থাপক সেই মর্মে পূর্বাহ্নে নোটিস দেন। যথা সময়ে, স্পীকারের আহ্বানে বিনা অনুষ্ঠানে বিলটী কেরাণীর টেবিলে উপস্থিত করেন। কেরাণী বিলের শুধু নামটি পাঠ করেন। ইহাতেই বিলের 'প্রথম পাঠ' সাঙ্গ হইল। ইহার পর বিলটি মুদ্রিত হইয়া পরবর্তী আলোচনার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। ক্বচিৎ কোন মন্ত্রী জরুরী বিল উত্থাপনের সময় ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতার দ্বারা বিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন, এবং তাহার পর বিরোধী পক্ষ হইতেও অনুরূপ ক্ষুদ্র বক্তৃতা করা হয়। আরও কদাচিৎ কোনও মন্ত্রী বিল উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিলের উদ্দেশ্য ও কার্যকরী অংশ সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন; বিতর্ক হয় এবং পরে অনুমতি দেওয়া হইবে কিনা তাহার উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। লক্ষ্যণীয় যে প্রথম দুই পদ্ধতিতে এ পর্যায়ে ভোটের প্রশ্ন উঠে না।

১। উত্থাপন—প্রথমপাঠ

বিলের দ্বিতীয় পাঠই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এবং এই সময়েই ইহার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। কারণ এই পর্যায়ে সভা বিলের উদ্দেশ্য, নীতি ও মৌলিক বিষয়বস্তু সমূহ লইয়া বিতর্ক করে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং সভার সম্মতি মিলিলে তবেই ধরা যাইবে যে প্রয়োজন মত পরিবর্তন-পরিবর্জন সাপেক্ষ বিলটি সভা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। সুতরাং এই পর্যায়ে বিলের বিশদ ধারা-উপধারা লইয়া আলোচনা অবান্তর, কারণ মূলনীতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে খুঁটি-নাটি লইয়া বিতর্ক তোলাও অযৌক্তিক।

২। দ্বিতীয় পাঠ

সভার কার্যসূচী অনুযায়ী পূর্ব্ব-নির্ধারিত দিবসে উত্থাপক প্রস্তাব আনয়ন করেন : "বিলটি দ্বিতীয়বার পাঠ করা হউক" ("be now read a second time")। বিরোধী পক্ষ বিলটির সমালোচনা করেন এবং এমন সংশোধনী প্রস্তাব রাখেন যাহা কার্যতঃ বিলটিকে বাতিল করিয়া দেয়। কখনও কি কি কারণে বিলটি বাতিল করা উচিত তাহার উল্লেখ থাকে; কখনও বা সৌজন্যসূচক ভাষায় বলা হয় : "বিলটি আজ হইতে ছয় মাস পরে দ্বিতীয়বার পাঠ করা হইবে" ("that this bill be read a second time this day six months.")। তাৎপর্য একই। বিলটি গৃহীত না হইলে অবশ্য আলোচনার শেষ এখানেই। কিন্তু সরকারী বিল পাস না হইলে তাহার দ্বারা ক্যাবিনেটের প্রতি কমন্সসভার আস্থার অভাবই সূচিত হইবে। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় যে বিলটি সংখ্যাধিক্যের ভোটে পাস হইয়া তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করিবে।

দ্বিতীয় পাঠের পর বিলটি যথাযোগ্য কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। অবশ্য সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইলে, সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পুনরায় স্থায়ী কমিটিতে বিচার করা হয়। কমিটির ভিতর বিশদভাবে একটি একটি করিয়া ধারা-উপধারা লইয়া বিচার চলে; সংশোধনের উদ্দেশ্যে নানারূপ সংশোধন্ বা পরিবর্জনের প্রস্তাব আনা চলে। কমিটির বিচারে বেশ কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস কাটিয়া যাইতে পারে। সকল বিচার-বিবেচনার শেষে কমিটি সভার নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবে।

৩। কমিটি পর্যায়

বিলটি যদি সমগ্র কক্ষ কমিটিতে বিনা সংশোধনে গৃহীত হইয়া থাকে তাহা হইলে এ পর্যায় নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। অন্যথায় রিপোর্টের বিচারের সময় বিলের ধারা-উপধারা সম্পর্কে পুনরায় সংশোধনী প্রস্তাবাদি উত্থাপিত ও আলোচিত হইতে পারে এবং সে সম্বন্ধে ভোট গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। রিপোর্টিং পর্যায়

তৃতীয় পাঠের কার্যাদি প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক; কারণ, বিল সম্বন্ধে যাহা কিছু করণীয় তাহা ইতিপূর্বেই করা হইয়া গিয়াছে। তথাপি আর একবার সাধারণ আলোচনা হয়। সামান্য ভাষাগত সংশোধন করা চলিতে পারে। নিতান্ত পুনর্বার কমিটিতে প্রেরিত না হইলে, ভোট গ্রহণের মারফতে বিলটি পাস করা হয়। এতক্ষণে বিলটি কমন্স-সভার গণ্ডী অতিক্রম করিল, বলা চলে।

৫। তৃতীয় পাঠ

অবশ্য এখনও আইনে পরিণত হইতে বাকি আছে। ইহার পর লর্ডসভায় অনুরূপ পর্যায়ের ভিতর দিয়া বিলটিকে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইবে। (লর্ডসভার আলোচনা পদ্ধতি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।) ইহার পর প্রয়োজন রাজার সম্মতি। দুইটি কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া রাজার স্বাক্ষর পড়িবার পরই বিলটি পরিপূর্ণ আইনে পরিণত হইল।

যে কোন একটি কক্ষ হইতে পাস হইলে পর বিল অপর কক্ষে আলোচনার জন্য প্রেরিত হয়। সে কক্ষের আলোচনার পর যে কক্ষে প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল তথায় ফিরিয়া আসে। যদি নূতন কোন সংশোধন যোগ করা হইয়া থাকে এবং প্রথম কক্ষ যদি সেটিকে গ্রহণ করে, তবে রাজার স্বাক্ষরের ভিত্তিতে বিলটি আইনে পরিণত হয়। যদি প্রথম কক্ষ সে সংশোধন গ্রহণ না করে, তাহা হইলে, দুই কক্ষের মধ্যে লিখিত বাণীর আদান-প্রদান হইতে পারে, অথবা দুই কক্ষের নির্বাচিত 'ম্যানেজার'দের ('managers') সম্মেলনে মীমাংসার চেষ্টা হয়। কমন্সসভার 'ম্যানেজার'দের সংখ্যা অপর দলের দ্বিগুণ হয়। সম্মেলন 'স্বাধীন' ('free') হইলে, উভয় পক্ষই পরস্পরকে বুঝাইতে এবং বুঝাপড়া করিতে চেষ্টা করে। 'স্বাধীন' সম্মেলন না হইলে, শুধুই নিজ নিজ যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা হয়; কোন বিতর্ক হয় না। লর্ডসভার বাধা কমন্সসভা অবশ্য ইচ্ছা করিলে অতিক্রম করিতে পারে; সে পদ্ধতি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। লক্ষ্যণীয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উভয় কক্ষের প্রতিনিধি-সম্মেলন যেমন প্রচলিত পদ্ধতি, ব্রিটেনে এ পদ্ধতি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। আসল মীমাংসা দুই পক্ষের বেসরকারী মত বিনিময়ের মাধ্যমেই সংঘটিত হইয়া থাকে।

দুইকক্ষের মতবিরোধের মীমাংসা

অর্থ ও পার্লামেণ্ট: অর্থ বিল (Money Bill) সরকারী পাব্লিক বিল হিসাবে মোটামুটি পূর্ববর্তী নিয়ম-কানুনের অধীন। কিন্তু ইহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সরকারী বিল হইতে পার্থক্য সূচিত করে। সেগুলি হইল:

অর্থবিল

১। অর্থ বিল একমাত্র কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হইবে।

২। কোন বিল অর্থবিল কিনা এ সম্পর্কে কমন্সসভার স্পীকারের নির্দেশই চূড়ান্ত।

৩। অর্থবিল একমাস ধরিয়া আলোচনা করা, অর্থাৎ, একমাস ঠেকাইয়া রাখা, ব্যতীত লর্ডসভার ইহার উপর অন্য কোন কর্তৃত্ব নাই।

৪। অর্থবিল একমাত্র রাজার সুপারিশক্রমেই উত্থাপন করা যায়। সুতরাং অর্থ সংক্রান্ত প্রস্তাব একমাত্র মন্ত্রিরাই কমন্সসভায় উত্থাপন করিতে পারেন; সাধারণ সদস্যদের এ বিষয়ে কোন এক্তিয়ার নাই।

৫। আইনগত বাধা না থাকিলেও, যেহেতু সাধারণ সদস্যদের কোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহা ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে অনাস্থার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইবে, সেজন্য কার্যতঃ ক্যাবিনেটের তরফ হইতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত ও উত্থাপিত না হইলে তাহা কমন্সসভায় গৃহীত হইবার বাস্তব কোন উপায় নাই।

অর্থ সম্পর্কে পার্লামেন্টের দায়িত্ব

অর্থ সম্পর্কে পার্লামেন্টের দায়িত্ব হইল প্রধানতঃ চারিটি: (১) কোন কোন সূত্র হইতে এবং কি পদ্ধতিতে জাতীয় রাজস্ব সংগৃহীত হইবে তাহা নির্ধারণ করা; (২) অর্থদপ্তর হইতে প্রস্তাবিত সরকারের প্রচলিত ও নূতন কার্যক্রমের জন্য কত অর্থ ব্যয় হইবে তাহা নির্ধারণ ও সে ব্যয় মঞ্জুর করা; (৩) রাজস্ব প্রকৃতপক্ষে কিভাবে ব্যয়িত হইতেছে তাহা অনুসন্ধান ও সমালোচনা করা; এবং (৪) সরকারী ব্যয়ের হিসাবের যথাযথ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। পার্লামেন্টের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত কর আদায় করা চলিবে না; অনুরূপ পার্লামেন্টের আইনের অনুমোদন না থাকিলে সরকারী অর্থব্যয়ও সম্ভব হইবে না।

সরকারী ব্যয় ও আয় নির্ধারণ

সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে আইনের প্রস্তাবের পূর্ববর্তী অধ্যায় হইল ব্যয় ও আয়ের পরিমাণ ও পদ্ধতি নিরূপণ। কতকগুলি ব্যয় অবশ্য স্থায়ী আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট। অন্যগুলির জন্য বার্ষিক অনুমোদন প্রয়োজন হয়। অবশ্য প্রয়োজনবোধে বার্ষিক আইনও পরিবর্তন করা হয় এ বিষয়ে অর্থদপ্তরের কর্তৃত্ব হইল ব্যাপক, প্রায় সর্বগ্রাসী। সরকারী অর্থ বা (financial year) হইল এপ্রিল হইতে মার্চ পর্যন্ত। সুতরাং আগামী বৎসরের আনুমানিক ব্যয়ের প্রস্তাব প্রস্তুত করিবার জন্য এ বৎসরের অক্টোবরের প্রথমেই অর্থদপ্তর হইতে বিভিন্ন দপ্তরে নির্দেশ পত্র (circulars) চলিয়া যায়, অর্থদপ্তরের

নিকট নির্দিষ্ট ছকে আগামী বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়ের খসড়া প্রেরণ করিবার জন্য। বিভিন্ন দপ্তরে এই সকল প্রস্তাব প্রস্তুতির সময় অর্থ দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। অর্থদপ্তর যে কোন বিভাগীয় ব্যয়ে আপত্তি তুলিলে এবং সে বিশেষ দপ্তর আপত্তি না মানিলে, ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে সামগ্রিক আয়-ব্যয় সম্পর্কে ক্যাবিনেটও অর্থ-দপ্তরের ন্যায় ওয়াকিবহাল নহেন। সুতরাং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিবিষয়ক সমস্যা না হইলে ক্যাবিনেটও পারতপক্ষে অর্থদপ্তরের মতামত লঙ্ঘন করেন না। ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে ব্যয় সম্পর্কে সকল তথ্যাদি অর্থ দপ্তরে পৌঁছিয়া যায়।

রাজার বক্তৃতার আলোচনা দিয়া কমন্সসভার অধিবেশন সুরু হয়। তাহার পর দীর্ঘকালের ঐতিহ্য অনুযায়ী "অভিযোগ" (grievances) সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। ইহার পরই ব্যয় সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় 'ব্যয়াধিকার প্রদান কমিটি' (Committee of Supply) নামক সমগ্রকক্ষ কমিটির সম্মুখে। প্রস্তাবগুলি বিভিন্ন গুচ্ছে একত্র করিয়া "ভোট" (votes) হিসাবে উপস্থিত করা হয়। এই "ভোট" হিসাবে আলোচনা হয় এবং এই অনুযায়ী "ব্যয়াধিকার প্রদান সম্পর্কিত প্রস্তাব" ("resolution of supply") গ্রহণ করা হয়। যেহেতু ১লা এপ্রিলের পূর্বে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সেইজন্য সুরুতেই কমিটি শাসনবিভাগকে নির্দিষ্ট ভোটের কিয়দংশ ব্যয় করিবার সাময়িক কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া "ভোট্‌স্ অন একাউন্ট" (votes on account) হিসাবে প্রস্তাব পাস করা হয়। অবশ্য এই প্রস্তাবেই কর্তৃত্ব আসে না। "উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ কমিটি" (Committee of ways and means) নামক আর একটি সমগ্র কক্ষ কমিটি, আয় সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা যাহার উদ্দেশ্য, কমন্সসভার সম্মুখে উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ সংক্রান্ত প্রস্তাব রাখে। এই প্রস্তাবগুলিকে একটি বিলে গঠন করিয়া 'সংবদ্ধ তহবিল (১নং) আইন (Consolidated fund (No 1) Act) হিসাবে আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের ভিত্তিতেই সরকার ব্যয় করিতে পারে। প্রয়োজনে এইরূপ আরও দুই একটি আইন করা সম্ভব। যাহা হউক "ব্যয়াধিকার প্রদান কমিটিতে" মোট ২৬ দিন ধরিয়া আলোচনা চলে। নিতান্ত প্রয়োজনে সময় আরও ৩ দিন পর্য্যন্ত বাড়ানো চলিতে পারে। কিন্তু তাহার পর আলোচনা ও বিতর্ক সাঙ্গ করিয়া কমন্সসভার সমগ্র প্রস্তাব দাখিল করিতে হয়।

কমন্স সভায় প্রস্তাব উত্থাপন

সরকারী আয়ের হিসাবাদি ইতিপূর্বেই অর্থদপ্তর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

অবশেষে বহু আশা আশঙ্কার দিন, ৩১শে মার্চ আসিয়া পড়ে। কমন্সসভা "উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ কমিটি' নামক সমগ্র কক্ষ কমিটিতে পরিণত হয় এবং অর্থমন্ত্রী তাঁহার থলি হইতে* বাহির করিয়া আয়ের প্রস্তাবাদি উপস্থিত করেন। ব্যয় কি করা হইবে তাহা মোটামুটি পূর্বেই জানা ছিল, কিন্তু কোন নূতন কর বসিবে বা কোন পুরাতন করের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে তাহা এইবারই প্রথম জানা গেল। কমন্সসভায় উপস্থিত করিবার পূর্বে বাজেট প্রস্তাব যাহাতে কোন রূপেই কেহ জানিতে না পারে সে সম্বন্ধে চরম গোপনীয়তা অবলম্বিত হয়। এমন কি ক্যাবিনেটের সভাতেও ইহা আলোচনা করা হয় না। কমন্সসভায় উত্থাপন করিবার সামান্য কয়েক মিনিট পূর্বে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট অনবধানতাবশতঃ কোন কোন প্রস্তাব সম্পর্কে ইঙ্গিত দিবার অপরাধে ১৯৪৭ সালে অর্থমন্ত্রী হিউ ডল্টনকে (Hugh Dalton) পদত্যাগ করিতে হয়।

বাজেট প্রস্তাব

ব্যয়াধিকার প্রদান কমিটির অনুরূপ পদ্ধতিতে এবং অনুরূপ সময় লইয়া উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ কমিটিতে আলোচনা চলে। প্রস্তাবগুলি সমগ্র কক্ষ কমিটি হইতে কমন্সসভায় রিপোর্ট করা হয়। এই সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফল হইল দুইটি আইন: (১) ব্যয় মঞ্জুরী আইন (Appropriation Act) ও (২) অর্থাগম আইন (Finance Act)। ইহা ছাড়া রাজস্ব সংক্রান্ত স্থায়ী আইনের সংশোধনের প্রয়োজন হইলে বিশেষ "রাজস্ব আইনের" (Revenue Act) মারফৎ স্থায়ী আইনগুলির সংশোধন করা হয়। মনে রাখিতে হইবে যে লর্ডসভার পরিবর্তনের ক্ষমতা না থাকিলেও প্রতিটি বিলই লর্ডসভায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং লর্ডসভা দ্রুত ফিরত না পাঠাইলে একমাস অপেক্ষা করিতে হইবে।

সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে ব্রিটিশ পদ্ধতির সহিত মার্কিন পদ্ধতির যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। বৃটিশ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হইল যে সরকারের আয় ও ব্যয় সম্পর্কে প্রস্তাবগুলি একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার ফল। একটি সামগ্রিক নীতির ভিত্তিতে আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। ইহা প্রণয়নের দায়িত্ব একটি সংস্থার,—অর্থাৎ অর্থদপ্তরের; ইহার গুণাগুণের দায়-দায়িত্বও তাহারই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাজেটের প্রধান অধ্যক্ষ (Director of Budget) সামগ্রিক প্রস্তাব প্রণয়ন করেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নামে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু

ব্রিটিশ ও মার্কিন পদ্ধতির তুলনা

(১ প্রাচীন ইংরাজি শব্দ bougette (অর্থাৎ ক্ষুদ্র থলি, যাহাতে অর্থমন্ত্রী তাঁহার প্রস্তাবাদি ভরিয়া কমন্সসভায় উপস্থিত হইতেন,) হইতে আধুনিক budget কথাটির উৎপত্তি।)

তাহাকে সর্বপ্রকারে পরিবর্তন করিবার অধিকার কংগ্রেসের রহিয়াছে। ফলে, আইন বাহির হইয়া আসিবার পর তাহাতে সামগ্রিক পরিকল্পনা ও ভারসাম্যের প্রতিচ্ছবি আর পাওয়া যায় না।* উপরন্তু, ব্রিটেনে অর্থ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণাধিকার কমন্সসভার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুই কক্ষেরই প্রায় সমান অধিকার। ব্রিটেনে আয় ও ব্যয় কমন্সসভার দুইটি স্বতন্ত্র কমিটিতে আলোচিত হইলেও, তাহাদের পার্থক্য শুধুই নামে, কার্যতঃ সমগ্র কক্ষ কমিটি হিসাবে উভয়ই এক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় কক্ষের কমিটি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সদস্য লইয়া গঠিত। ব্রিটেনে মন্ত্রিগণ কমন্স সভায় উপস্থিত থাকিয়া প্রস্তাবাদির ব্যাখ্যা করেন ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করেন এবং হয়ত অর্থ সচিব (Secretary of the Treasury) কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করেন ; কিন্তু কংগ্রেসের সম্মুখে নিজস্ব প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিবার কোন উপায় শাসনবিভাগের নাই। সুতরাং তুলনায় মার্কিন পদ্ধতি অনেক বেশী দুর্বল বলিয়া মনে হয়।

ব্রিটিশ পদ্ধতির দুর্বলতা আসিয়াছে বিপরীত দিক হইতে। সামগ্রিক পরিকল্পনার স্বার্থে বস্তুতঃ কমন্স সভা অর্থ সম্পর্কে সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া অর্থ দপ্তরের হস্তেই তুলিয়া দিয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি কমন্স সভার বিচার করিবার ক্ষমতাকে অধিকতর ক্ষুণ্ণ করিতেছে : প্রথমতঃ, বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সকল তথ্য উপস্থিত করিলেও আয় ব্যয় সংক্রান্ত সামগ্রিক বিচার করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। সুতরাং বিশেষজ্ঞ অর্থ দপ্তরের বিচারের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার পক্ষে নির্ধারিত সময় প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। তৃতীয়তঃ, সমগ্র কক্ষ কমিটি কমিটি হিসাবে এত বৃহৎ যে বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিচারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। চতুর্থতঃ, সরকারী প্রস্তাবের যে কোন সংশোধনী ক্যাবিনেটের প্রতি আস্থা-অনাস্থার প্রশ্নে দাঁড়াইয়া যায় ; ফলে এই অর্থ-সংক্রান্ত

ব্রিটিশ পদ্ধতির দুর্বলতা

(১ "Once the President's financial proposals have been set adrift on the legislative sea, they are at the mercy of the winds of congressional prejudice and special interests. Unpopular taxes may be cut ; special expenditures demanded by powerful pressure groups may be added ; executive departments which have incurred congressional wrath may find their appropriations drastically reduced ; and the most carefully laid plans of the administration may be disrupted......And there are times when any resemblance between plans for expenditure and plans for revenue seems to be little more than conicidental." Carter, Herz and Ranney : Major Foreign Powers.)

প্রস্তাবের নিরপেক্ষ, সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সংশোধন আজ পার্লামেন্টের ক্ষমতার বহির্ভূত।* অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা বর্তমানে ক্যাবিনেট বা প্রকৃতপক্ষে অর্থ দপ্তরের, কুক্ষিগত।

সরকারের পক্ষে অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে তাহার 'সরকারী হিসাব-পরীক্ষক কমিটির (Public Accounts Committee) মারফৎ। অর্থ বৎসরের অন্তে প্রতি দপ্তরের হিসাব-রক্ষক (Accounts Officer) দপ্তরের ব্যয়ের সমগ্র হিসাব প্রধান নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষক (Comptroller and Auditor General) মহাশয়ের নিকট পাঠান। তিনি হিসাব পরীক্ষা করিয়া নিজস্ব রিপোর্ট পার্লামেন্টের নিকট পেশ করেন। হিসাব পরীক্ষক কমিটি তখন সেই রিপোর্টের সহায়তায় আয়-ব্যয়ের হিসাব পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৫, ইহার সভাপতি বিরোধীপক্ষীয়। সুতরাং কমিটি যে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে হিসাবের দোষত্রুটী অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। তবে অসুবিধা হইল, এ হিসাব অতীত বৎসরের। অতীতের সমালোচনা বর্তমানের উপর নিতান্তই পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

হিসাব নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা

পার্লামেন্টের সম্মুখে এত দীর্ঘ সরকারী কার্যসূচী সর্বদাই উপস্থিত থাকে যে সাধারণ সদস্যদের বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ অতি সামান্যই। অতি অল্প সময়ই এ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট থাকে। তাহার উপর বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপনকারীর ভিড়ও যথেষ্ট। এ অবস্থায় কে আগে সুযোগ পাইবেন তাহা 'লটারি' করিয়া নির্ধারিত হয়। উত্থাপকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে তাঁহার নাম উঠিবে। কিন্তু এ বিলটিকেও পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচটি পর্যায়ের ভিতর দিয়া উত্তরণ করাইয়া লইতে পারিলে একটি সভার প্রাচীর উত্তরণ করা যাইবে; তাহার পর রহিয়াছে অপর সভার বিবেচনা ও সর্বশেষে রাজার সম্মতি। উপরন্তু মনে রাখিতে হইবে যে তখনও পর্যন্ত এ প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কার্য্যসূচীর অঙ্গীভূত নয়; কারণ তাহা হইলে তো ক্যাবিনেটই এ প্রস্তাব উত্থাপন করিত। সুতরাং উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাওয়া সম্বন্ধেও নিশ্চয়তা নাই। এ অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে সাধারণ সদস্য আনীত বেসরকারী

বেসরকারী বিল

(* "Of dispassionate, straightforward, constructive financial criticism there is very little". Ogg and Zink : Modern Foreign Governments, p. 292)

বিলের আইনে পরিণত হওয়া দুরাশা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহা সত্ত্বেও, সদস্যগণ ইহাকে একটি মূল্যবান অধিকার বলিয়া মনে করেন। ইহার সুযোগে ক্যাবিনেট কর্তৃক অবহেলিত বিভিন্ন বিষয় পার্লামেন্টের মাধ্যমে জনমতের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় এবং অনেক সময়ে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হইলে এবং যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত উপস্থাপিত হইলে, ক্যাবিনেট স্বয়ং এ বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব আনয়ন করিবে এরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় করা সম্ভব।

প্রাইভেট বিল সম্পর্কে বিচার-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধিবেশনের পূর্বেই বিলটি সমেত একটি আবেদন পার্লামেন্টের প্রাইভেট বিল অফিসে পেশ করিতে হয়। এ সম্পর্কে আবেদনের যথাযথ নোটিশ গেজেটে এবং স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে ছাপাইতে হইবে এবং অর্থদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে। বিলে প্রস্তাবিত কার্যের জন্য ব্যয়ভারের আনুমানিক হিসাবও এই সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে এবং এই ব্যয়ের কিয়দংশ 'গ্যারান্টি' হিসাবে জমা রাখিতে হইবে। প্রাইভেট বিলের আবেদন-পরীক্ষক নামক সরকারী কর্মচারীগণ প্রথমে বিলটি পরীক্ষা করিয়া দেখেন। বিলটি নিয়ম-অনুযায়ী প্রস্তুত বলিয়া তাঁহারা অভিমত জ্ঞাপন করিলে, বিল পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হয়। বিলের প্রথম পাঠ নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। দ্বিতীয় পাঠে সাধারণ নীতি লইয়া আলোচনা হয় ও ভোট গৃহীত হয়। যদি কোন বিরোধিতা না থাকে, তাহা হইলে অ-বিরোধিত বিল কমিটিতে (Unopposed Bill Committee) প্রেরিত হয়। ইহাদের রিপোর্ট সভা সাধারণতঃ গ্রহণ করে। যদি কক্ষের ভিতরে অথবা বাহিরে বিলটি সম্পর্কে বিরোধিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিলটি 'প্রাইভেট বিল্‌স্' কমিটিতে প্রেরিত হয়। এ কমিটির কার্যপদ্ধতি আদালতের ন্যায়। বিলের সপক্ষে ও বিপক্ষে আইনজীবীগণ বিতর্ক করেন, সাক্ষ্য-সাবুদ পেশ করেন, প্রয়োজনে সাক্ষীদের জেরা করেন। কমিটি প্রথমেই বিলের 'মুখবন্ধ'টি (Preamble) বিচার করিয়া দেখে। যদি কমিটির মতে বিলের যৌক্তিকতা প্রমাণিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে সাময়িকভাবে অন্ততঃ বিলটি বাতিল হইয়া গেল। কমিটি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলে, ধারা-উপধারা লইয়া বিচার চলে। এক্ষেত্রেও শেষ-পর্যন্ত কমিটি যে রিপোর্ট দেয়, পার্লামেন্ট তাহাই গ্রহণ করে। এ ব্যবস্থার সুবিধা হইল এই যে যে সকল বিষয়ে দলীয় কলহের স্থান নাই, সেগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচার হইয়া থাকে এবং পার্লামেন্টের সময়ও বহু বাঁচিয়া যায়। অসুবিধা হইল,—পদ্ধতিটি ব্যয়-

প্রাইভেট বিল

বহুল এবং সাধারণ স্বার্থের পটভূমিকায় পার্লামেণ্টের বিচার বদ্ধ থাকে।

অস্থায়ী নির্দেশ ও শাসনবিভাগীয় বিশেষ নির্দেশ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। আঞ্চলিক সরকার বা কর্পোরেশনগুলির আবেদনে শাসন কর্তৃপক্ষ যে অস্থায়ী নির্দেশ দান করেন, সেগুলিতে পার্লামেণ্টের অনুমোদনের জন্য, মঞ্জুরী বিল (Confirmation Bill) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী পার্লামেণ্টে উত্থাপন করেন। প্রাইভেট বিলের নিয়ম অনুযায়ী এইগুলিকে পাস করা হয়। বিশেষ নির্দেশের খসড়াও পার্লামেণ্টের অনুমোদনে পাস করাইতে হয়।

আইন প্রণয়ন সম্পর্কে পূর্ববর্তী দীর্ঘ আলোচনার ভিতর দিয়া আমরা কমন্সসভা প্রকৃতপক্ষে কোন দায়িত্ব পালন করে সে সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত ধারণা করিতে পারি। তত্ত্বগতভাবে আমরা জানি যে কমন্সসভার মূল দায়িত্ব তিনটি : (ক) শাসন কর্তৃপক্ষ বা ক্যাবিনেটকে দায়িত্বে বহাল রাখা বা না রাখা ইহার ইচ্ছাধীন ; এককথায়, কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাহার ভাগ্য নির্ধারণ করে ; (খ) কমন্সসভা লর্ড-সভার সাহায্যে এবং রাজার সম্মতি সহযোগে আইন প্রণয়ন করে ; এক্ষেত্রেও কমন্সসভারই ক্ষমতা সমধিক ; (গ) সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে ; বস্তুত : এই ক্ষমতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রক্ষমতা অবাধ রাজশক্তির মুষ্টি হইতে দেশবাসীর প্রতিনিধিদের হস্তে প্রত্যর্পিত হইয়াছে।

কমন্সসভার প্রকৃত দায়িত্ব

কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনা স্মরণ করিলে দেখা যাইবে যে ক্যাবিনেটকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন করা অথবা অপসারিত করা আজ আর কমন্সসভার বিশেষ ক্ষমতাধীন নহে। সাধারণ নির্বাচনে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্যাবিনেট শাসনক্ষমতা লাভ করে, দলীয় শৃংখলার শক্তিতে তাহার আসন নিরাপদ। কমন্সসভার ভিতরে সদস্যগণ "বিদ্রোহ" করিয়া ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে ভোট দিবেন না। কারণ, (১) বিদ্রোহের ফলে ক্যাবিনেটের পতন হইবে। (২) ক্যাবিনেট কমন্সসভা ভাঙিয়া পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলে, শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে দল হইতে বহিষ্কৃত সদস্যের নির্বাচনে জিতিয়া কমন্সসভায় পুনরায় ফিরিয়া আসা প্রায় অসম্ভব। (৩) নিতান্ত যদি পুনরায় জয়লাভও সম্ভব হয় তথাপি দলীয় নেতৃত্বের বাহিরে থাকিয়া কমন্সসভার সাধারণ সদস্যের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করার পথ নাই। (৪) দলীয় নেতৃত্বের সহিত কোন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকিলেও, মতৈক্যই বেশী ; অথচ, ক্যাবিনেটের পতন ঘটানোর অর্থ হইল বিরোধী পক্ষের ক্ষমতা লাভের পথ

সুগম করিয়া দেওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য জানেন যে তিনি যদি স্বদলীয় রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, তাহার জন্য রাষ্ট্রপতির আসন টলিবে না; কিন্তু ব্রিটিশ কমন্সসভার সদস্যগণের বিরোধিতায় ক্যাবিনেটের পতন হইতে পারে। সেই জন্যই ব্রিটেনে এ বিরোধিতা ঘটে না এবং সেই জন্যই বাস্তবে ক্যাবিনেট কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে।

আইন-প্রণয়নের ব্যাপারেও কমন্সসভার প্রকৃত ক্ষমতা আজ ক্যাবিনেটের কুক্ষিগত। একই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্যাবিনেট কমন্সসভায় নিজস্ব সকল প্রস্তাব পাস করাইয়া নেয় এবং কমন্সসভাকে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ বর্তমানে আইন-প্রণয়নের পর্যায়গুলিকে নিম্নরূপে বিভক্ত করা সম্ভব: (ক) আইনের পরিকল্পনা আসে রাষ্ট্রনৈতিক দল (নির্বাচনী কর্মসূচী কার্যকরী করা ও জনসমর্থনের তাগিদে), বিভিন্ন সংগঠিত সংস্থা (নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে) এবং স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দের (শাসন কার্য চালাইবার প্রয়োজনে) নিকট হইতে। (খ) আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ। (গ) আইন প্রণয়ন করা হইবে কি না তাহা স্থির করেন ক্যাবিনেট। (ঘ) মন্ত্রিমণ্ডলীর উত্থাপিত আইনের প্রস্তাবে সম্মতি জানায় কমন্সসভা।

সরকারী তহবিলের নিয়ন্ত্রণে কমন্সসভার ভূমিকা যে কত সামান্য তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ সরকারী তহবিলের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক আজ ক্যাবিনেটও নহে, ক্যাবিনেটের দায়িত্বের অন্তরালে অর্থদপ্তরের উপরেই মূলতঃ এ দায়িত্ব বর্তাইয়াছে।

সেই-জন্যই কমন্সসভার ক্ষমতা সম্পর্কে পুরাতন ধারণা পাল্টাইয়া লইতে হইবে; কমন্সসভার প্রকৃত ভূমিকা বর্তমানে অন্যরূপ।

বর্তমানে কমন্সসভার মূল কার্যভারকে নিম্নলিখিত চারিটি ভাগে ভাগ করিতে পারি:

১। ক্যাবিনেটের নীতি ও শাসন পদ্ধতির সমালোচনা;

২। সমালোচনার মাধ্যমে স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দের নিয়ন্ত্রণ;

৩। নাগরিক অধিকার রক্ষা; ও

৪। জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে শিক্ষিত করিয়া তোলা।

অর্থাৎ, এক কথায় বলিতে গেলে কমন্সসভা আজ প্রত্যক্ষভাবে ক্যাবিনেটকে চালিত করিতে পারে না, ক্যাবিনেটকে প্রভাবিত করে নিয়ত, নিরবচ্ছিন্ন সমালোচনার মাধ্যমে। ক্যাবিনেট জানে, সাধারণ নির্বাচন নিতান্ত কাল না হইলেও, কিছুদিনের

মধ্যেই আসিবে। ক্যাবিনেট ইহাও জানে যে সমগ্র জাতির দৃষ্টি রহিয়াছে কমন্সসভায় কি ঘটিতেছে তাহার উপর ; কমন্সসভায় কি বলা হইল তাহা জাতির কাণ এড়াইবে না। সাধারণের নিকট জবাবদিহির দিন যখন আসিবে, তখন বিরোধী পক্ষ সোচ্চারে ঘোষণা করিবে,—"আমরা পূর্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম"। আর কমন্সসভায় উচ্চারিত এই সমালোচনার যথোপযুক্ত সদুত্তর না দিতে পারিলে ক্যাবিনেটের সমর্থক সদস্যগণ দেখিবেন বাহিরে নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের নিকট জবাব দাবি করিতেছেন। সেই অস্বস্তিতেই কমন্সসভায় ক্যাবিনেটের সাধারণ সমর্থকও ব্যক্তিগতভাবে বা দলীয় সভার ভিতরে মন্ত্রিগণের উপর অপ্রিয় নীতি বা অন্যায় শাসন কর্মের প্রতিবিধান দাবি করিবেন। বিশেষ করিয়া নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে ব্রিটিশ জনমত অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সংখ্যালঘু বিরোধী পক্ষের তরফ হইতেও যদি নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপের প্রকৃত অভিযোগ উত্থাপিত হয়,তাহা হইলে তাহার দ্রুত নিরাকরণ অবশ্যম্ভাবী। কমন্সসভা বাজেট আলোচনায় অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে নূতন কিছু করিতে না পারিলেও, প্রতিটি স্থায়ী কর্মচারী এই আলোচনা সম্বন্ধে তটস্থ থাকেন ; কারণ বিভিন্ন দপ্তরের অপচয়, অযোগ্যতা বা দুর্নীতি এই আলোচনার ভিতর দিয়া সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। উপরন্তু নিয়মিত প্রশ্নোত্তরের মারফৎ ও সরকারী প্রতিটি কার্যক্রমের জবাবদিহি ক্যাবিনেট, তথা শাসনবিভাগকে, প্রতিনিয়ত করিতে হইতেছে।

কমন্সসভা এই সমালোচনার মাধ্যমেই জনমতকে শিক্ষিত ও সজাগ করিয়া রাখে।* জনসাধারণ যে শুধু বিরোধী পক্ষের সমালোচনাই শোনেন, তাহা নহে। প্রতিটি প্রশ্নে সরকারের নিজস্ব বক্তব্য শুনিবার সুযোগ পান। বস্তুতঃ এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র কক্ষের অভ্যন্তরে জাতির শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ বিতর্ক করিতেছেন, পরস্পরকে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা করিতেছেন, বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে নিজ কার্য্যসূচী ব্যাখ্যা করিতেছেন ; ফলে জাতির সম্মুখে প্রধান সমস্যাগুলি নাটকীয় গুরুত্ব লইয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি যদি হয় শিক্ষিত জনমত, তাহা হইলে জনমতকে শিক্ষিত করিয়া গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করিবার এ এক অনবদ্য ব্যবস্থা।

(*"The function of Parliament is not to govern but to criticise. Its criticism too is directed not so much towards a fundamental modification of the Government's policy as towards the education of public opinion.)

কমন্সসভায় এ কার্যভার হইতে বিরোধী পক্ষের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ। কারণ সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে সঠিক পথে চালিত রাখা যখন কমন্সসভার প্রধান দায়িত্ব, সে ক্ষেত্রে সমালোচনার কার্যেও সর্বাপেক্ষা কার্যকরী যন্ত্র হইল কমন্সসভায় সরকারের বিরোধীপক্ষ।* বিরোধীপক্ষ জানে যে তাহার যুক্তিতর্কে সরকারের সমর্থকগণকে বুঝাইয়া তাহার পক্ষে ভোট দেওয়াইতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং বিরোধীপক্ষ সরকারের সমালোচনা করে আগামী নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, জনমতকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে। সরকারও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত আছে। সুতরাং জনমত যাহাতে বিমুখ না হয়, তাহাকে সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

বিরোধী পক্ষের ভূমিকা

বিরোধীপক্ষ একদিকে বর্তমান সরকারের বিকল্প শক্তি ও অপরদিকে জনসাধারণের অভিযোগ ও বিক্ষোভ প্রকাশের কেন্দ্রবিন্দু। শাসন বিভাগের উপর জননিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিবার জন্য সেই জন্যই বিরোধীপক্ষ এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহার অবদান অসামান্য। স্যার আইভর জেনিংস বলেন: "রাণীর অনুগত বিরোধীপক্ষ একটি কথার কথা মাত্র নহে; সরকার যেরূপ প্রয়োজন, বিরোধীপক্ষের প্রয়োজনও রাণীর তদনুরূপ।" ("Her Majesty's Opposition' is no idle phrase. Her Majesty needs an Opposition well as a Government."†)

কিন্তু বিরোধীপক্ষের সমালোচনার কয়েকটি সীমা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রথমতঃ, সমালোচনার উদ্দেশ্য হইল জনমতকে সরকারের ভুলত্রুটি সম্পর্কে সজাগ করিয়া সপক্ষে আনয়ন করা যাহাতে ভাবী নির্বাচনে জয়লাভ করা যায়। সুতরাং সমালোচনা দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। কারণ নির্বাচনে জয়লাভ করিলে বর্তমান সমালোচনা ব্যুমেরাং-এর ন্যায় ফিরিয়া আসিবে। আজ যে কার্যক্রম সরকারের নিকট দাবি করা হইতেছে, তাহা ভবিষ্যতে নিজেদের কার্যকরী করিতে হইবে। সুতরাং অবাস্তব কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকারের সমালোচনা করিলে জনসাধারণের বিশ্বাস সৃষ্টি করা যেরূপ দুরূহ, ভবিষ্যতে কার্যকরী করিবার অক্ষমতাও সেরূপ জনসাধারণের মধ্যে দ্বিগুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা।

দায়িত্বশীল সমালোচনা

* "It is not untrue to say that the most important part of Parliament is the Opposition in the House of Commons." Jennings. Ibid. P. 472

† Sir Ivor Jennings ; Ibid p. 16.

দ্বিতীয়তঃ শাসনব্যবস্থায় অচল অবস্থার সৃষ্টি করা বিরোধিতার উদ্দেশ্য নহে; লক্ষ্য হইল, ভবিষ্যতের নির্বাচনে জয়লাভ করা। পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থায় মানিয়া লইতে হইবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন করিবে এবং সংখ্যালঘু দল সমালোচনা করিবে (The minority agrees that the majority must govern, and the majority agrees that the minority should criticise.)। * আজ যদি বিরোধীপক্ষ অচল অবস্থার সৃষ্টি করে, তবে কাল আবার বর্তমান ক্ষমতাসীন দল পাল্টা অচল অবস্থা সৃষ্টিতে চেষ্টিত হইবে। এরূপ সংঘর্ষ গৃহযুদ্ধকেই ডাকিয়া আনে, যুক্তি ও বিতর্কের মারফত শাসন পরিচালনা অসম্ভব করিয়া তুলে।

অচল অবস্থার সৃষ্টি উদ্দেশ্য নহে

সুতরাং বিরোধীপক্ষের নিকট যেরূপ দায়িত্বশীল সমালোচনা দাবি করা হইবে, অনুরূপ সরকারকেও সজাগ থাকিতে হইবে; বিরোধীপক্ষ যাহাতে সমালোচনার যথোপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পায়। ইহাই হইল সরকার ও বিরোধীপক্ষের বুঝাপড়ার পটভূমিকা। এই কারণেই অনিবার্য পরাজয় জানিয়াও সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা-প্রস্তাব আনিবার জন্য সময় দাবি করে বিরোধী পক্ষ, সরকার সে সময়ের ব্যবস্থা করে। আবার সরকারও চায় যে তিনঘণ্টা নিন্দাপ্রস্তাবের আলোচনার পর, সরকার হয়ত 'গৃহসংস্থান' সম্পর্কীয় প্রস্তাব আলোচনা সুরু করিবে, বিরোধীপক্ষও তাহাতে রাজি হয়। পররাষ্ট্র-নীতির সম্পর্কে সরকার বহু গোপন তথ্য বিরোধীপক্ষের নেতৃবৃন্দকে জানাইয়া রাখে, এই কারণে যে বিরোধীপক্ষ ক্ষমতায় আসিলে এ দায়িত্ব তাহাদের বহন করিতে হইবে। বিরোধীপক্ষও অনেক সময়েই সে সকল গোপন বিষয় কমন্সসভার বিতর্কে উত্থাপন না করিতে সম্মত হয়। অবশ্য বিরোধীপক্ষ যদি সরকারের নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করে তাহা হইলে সে সোচ্চারে তাহা ঘোষণা করিবে এবং এই সরকার-বিরোধিতাকে রাষ্ট্রবিরোধিতার আখ্যা দেওয়া অন্ধতা ও গোঁড়ামিরই পরিচায়ক। ব্রিটেনের ইতিহাসে নীতি সম্পর্কে সরকার ও বিরোধীপক্ষের ঐক্যমত যেমন দেখা গিয়াছে সুদীর্ঘ কালেও ঐক্যমত না হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

সরকার ও বিরোধী পক্ষের পারস্পরিক বুঝাপড়া

* (Jennings : *Ibid.* p. 500)

অষ্টম অধ্যায়

বিচার বিভাগ

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া আমরা ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার মূল দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছি।

বৈশিষ্ট্য : পার্লামেন্টের প্রাধান্য

প্রথমতঃ, পার্লামেন্টের আইনই এখানে চরম ;—সে আইন শাসনতন্ত্রসম্মত হইল কিনা তাহা দেখিবার এক্তিয়ার বিচার বিভাগের নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য

সমগ্র যুক্তরাজ্যে একটি মিলিত সুসংবদ্ধ আদালত প্রথা নাই (no unified court system)। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জন্য এক প্রকার ব্যবস্থা বর্তমান; স্কটল্যাণ্ডের জন্য অন্যরূপ; উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য আবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। অবশ্য ১৮৭৩ সালের পূর্বে ইংল্যাণ্ডেও এক আদালত-প্রথা প্রচলিত হয় নাই, তাহা আসিয়াছে ১৮৭৩ সালের আদালত সম্পর্কীয় আইনের (Judicature Act of 1873) মারফৎ।

যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন আদালত প্রথা

১৮৭৩ হইতে ১৮৭৬ সালের আদালত সম্বন্ধে বিভিন্ন সংস্কার ব্যবস্থায় একটি সর্বোচ্চ আদালত ব্যবস্থা স্থাপিত হইল। সর্বোচ্চ আদালত বস্তুতঃ একটি আদালত নহে; এই নামের অন্তরালে একাধিক আদালত রহিয়াছে: যথা, আপীল আদালত (Court of Appeals) এবং উচ্চ আদালত (High Court of Justice)। আপীল আদালত আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা আপীল আদালত (Court of Appeals) এবং ফৌজদারী আপীল আদালত (Court of Criminal Appeals)। উচ্চ বিচারালয় বিভক্ত হইয়াছে তিন ভাগে; যথা, রাণীর বিচার বিভাগ (Queen's Bench Division), চ্যান্সারী বিভাগ (The Chancery Division) এবং ইচ্ছাপত্র, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নৌবাহিনী সংক্রান্ত বিচার বিভাগ (The Probate, Divorce and Admiralty Division)। এই সর্বোচ্চ আদালতের উপরে রহিয়াছে লর্ড সভা (Lords of Appeal in Ordinary)। ইহা ছাড়া আরও একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় রহিয়াছে, তাহা হইল প্রিভি কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত কমিটি (Judicial Committee of the Privy Council)। প্রিভিকাউন্সিলের নিকট ধর্মীয় আদালত (Ecclesiastical Courts) উপনিবেশগুলির উচ্চ বিচার সভা (Colonial Courts) এবং কতকগুলি ডোমিনিয়নের উচ্চ আদালত (Domimion Courts) হইতে আপীল মামলার শুনানি হয়।

ইংল্যাণ্ডে আদালত প্রথার সংস্কার

সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে, অথবা তাহাদের সহিত কর্পোরেশনগুলির অথবা ইহাদের নিজেদের মধ্যে যে দেওয়ানী মামলা (Civil Cases—উদ্দেশ্য ক্ষতিপূরণ এবং অধিকারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা) সেগুলিতে দুই শত পাউণ্ডের কম অর্থ সংক্রান্ত হইলে, তাহার বিচার হইবে কাউন্টি আদালতে (County Courts)। আদালত গুলির এলাকা অবশ্য কাউন্টির এলাকায় সীমাবদ্ধ নহে। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে প্রায় ৫০০ কাউন্টি আদালত ৬০টি চক্র বা সার্কিটে (circuits) বিভক্ত। লর্ড চ্যান্সেলার প্রতি সার্কিটের জন্য একজন করিয়া বিচারক নিয়োগ করেন। ইনি তাঁহার সার্কিটের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আদালতে মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া বিচারে বসিবেন। কার্যভার খুবই অতিরিক্ত হইত, যদি না আদালতের রেজিষ্ট্রার ও অন্যান্য স্থায়ী কর্মচারী আদালতে শুনানির পূর্বেই বহু মামলার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতেন। প্রয়োজনে এ আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা হয়। যদি অর্থের অঙ্ক যথেষ্ট বেশী হয়, তবে মামলা প্রথমেই উচ্চ বিচারালয়ে উপস্থিত হয়। সেখান হইতে মামলার আপীল উচ্চ আপীল আদালতে যাইবে।

দেওয়ানী মামলা

ফৌজদারী মামলা (Criminal Cases) আনা হয় রাজার তরফ হইতে; উদ্দেশ্য,—অপরাধীর শাস্তি। ইংল্যাণ্ডে অপরাধীকে বিচারের জন্য হয় 'জাষ্টিস অব দি পীস' (Justice of the Peace), বা 'শান্তিরক্ষক বিচারপতি'র, নিকট। নতুবা, বৃহৎ শহরে মাহিনা প্রাপ্ত বিচারকের (stipendiary magistrate) নিকট উপস্থিত করা হয়। প্রথমোক্ত বিচারক কোন সরকারী বেতন পান না। উভয় ধরনের বিচারকদেরই লর্ড চ্যান্সেলার নিয়োগ করেন। ছোটখাট মামলার বিচার ইহারাই করেন। ইহাদের উর্ধ্বে অবস্থিত 'কোর্ট অব কোয়ার্টার সেসন্‌স্' (Court of Quarter Sessions) নামক কাউন্টি বিচারালয়ে আপীল করা চলে। গুরুতর অপরাধসংক্রান্ত মামলা এ্যাসাইজ আদালতে (Assizes) উঠে। দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে উল্লিখিত সার্কিট আদালতের মত, চক্রভুক্ত কাউন্টি ও বৃহৎ শহরগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একজন বা দুইজন বিচারক, জুরী সমেত, বিচার করেন। কিছু কিছু দেওয়ানী মামলাও এ্যাসাইজ আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত। এ্যাসাইজ আদালতের উর্ধ্বে আপীলের শুনানি হয় ফৌজদারি আপীল আদালতের সম্মুখে। এ্যাটর্নি জেনারেলের (Attorney General) সম্মতি মিলিলে ফৌজদারি আপীল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে লর্ড সভায় আপীল করা চলিতে পারে। অবশ্য নূতন ও জটিল আইনের প্রশ্ন জড়িত না থাকিলে এ্যাটর্নি জেনারেল সাধারণতঃ এ ধরনের অনুমতি দেন না।

ফৌজদারী মামলা

লর্ড সভা বিচার বলিতে অবশ্য লর্ড চ্যান্সেলারের সভাপতিত্বে ৯ জন আপীল লর্ডকে লইয়া গঠিত বিচার সভার বিচার বুঝিতে হইবে। অন্যান্য সদস্যগণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন না। প্রিভি কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত কমিটি লর্ড চ্যান্সেলার, প্রাক্তন লর্ড চ্যান্সেলারগণ, ৯ জন আপীল লর্ড, প্রিভি কাউন্সিলের সভাপতি (Lord President of the Privy Council), অন্যান্য কিছু প্রিভি কাউন্সিল সদস্য এবং ডোমিনিয়নগুলির উচ্চ আদালত হইতে কিছু বিচারপতি লইয়া গঠিত। কিন্তু বিচারের আসল কাজ লর্ড চ্যান্সেলার ও ৯ জন আপীল লর্ড, ডোমিনিয়ন হইতে আগত বিচারপতিদের সহায়তায় চালাইয়া থাকেন। এই বিচার সংক্রান্ত কমিটি আদালত না হওয়াতে কখনও রায় দেন না। ইহারা রাজসকাশে সুপারিশ করেন যে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখা বা বাতিল করা হউক। এই সুপারিশ অর্ডার-ইন-কাউন্সিল হিসাবে ঘোষিত হয়।

লর্ড সভা ও প্রিভি কাউন্সিল

ব্রিটিশ আদালতগুলিকে আমরা নিম্নরূপ ছকে সাজাইয়া দেখাইতে পারি :

বিচার ব্যবস্থা

- প্রিভিকাউন্সিল (বিচার সংক্রান্ত কমিটি)
  - ধর্মীয় আদালত
  - ঔপনিবেশিক আদালত
  - কতকগুলি ডোমিনিয়ন আদালত
- লর্ড সভা
  - স্কটল্যাণ্ডের কোর্ট অব সেসনস্
  - উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত
  - ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের চরম বিচারালয়
    - আপীল আদালত
      - উচ্চ বিচারালয়
        - রাণীর বিচার বিভাগ
        - চ্যান্সারি বিভাগ
        - ইচ্ছাপত্র, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নৌবাহিনী বিভাগ
          - কাউন্টি কোর্ট
          - কাউন্টি কোর্ট
          - কাউন্টি কোর্ট ইত্যাদি
    - ফৌজদারী আপীল আদালত
      - এ্যাসাইজ কোর্ট
      - কেন্দ্রীয় ফৌজদারী আদালত (লণ্ডন)
      - কোর্ট অব কোয়ার্টার সেসন্স্
      - কোর্ট অব পেটি সেসন্স্
      - জাষ্টিসেস অব দি পীস
      - মাহিনাপ্রাপ্ত বিচারকের আদালত
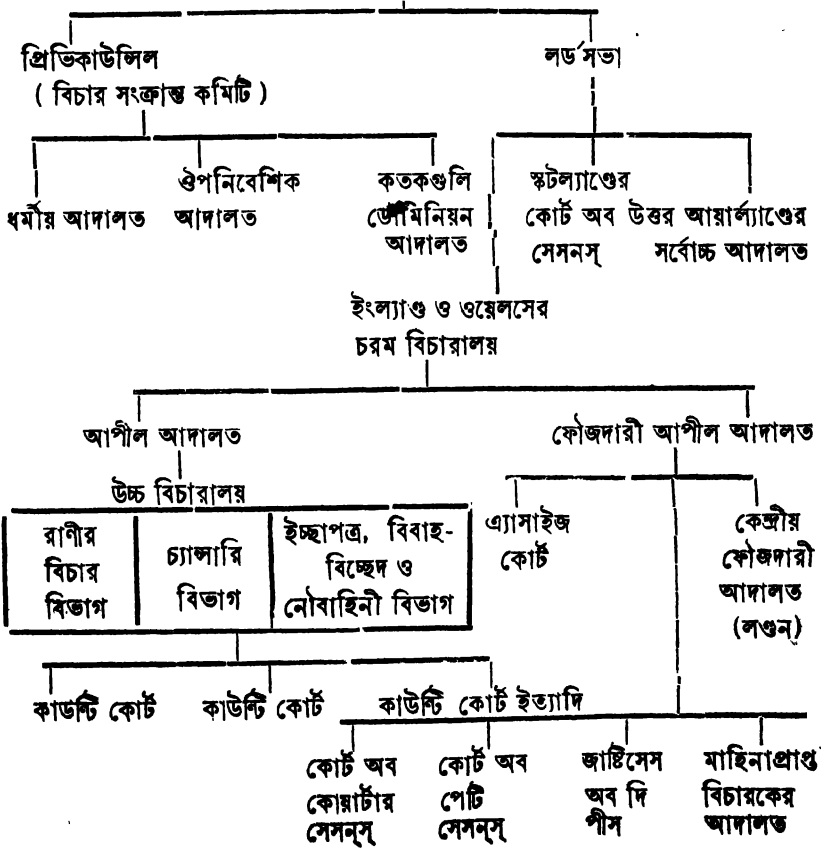
বিচারব্যবস্থার উৎকর্ষের কারণ

ইংল্যাণ্ডের বিচার-ব্যবস্থার উৎকর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কারণ দর্শান হয়:

ক। সুবিচার সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক নীতি অনুসরণ করা হয়। যথা,—

১। বিচার হয় খোলা আদালতে, যেখানে জনসাধারণ সর্বদাই উপস্থিত হইয়া বিচারপদ্ধতি লক্ষ্য করিতে পারে।

২। উভয়পক্ষ উপযুক্ত আইনবিদের সাহায্যে মামলা লড়িতে পারে।

৩। দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয়বিধ মামলাতেই অভিযোগের প্রমাণ হাজির করিবার দায়িত্ব অভিযোগকারীর।

৪। "প্রমাণ সম্বন্ধীয় আইন" (Law of Evidence) অনুযায়ী অভিযুক্তকে দোষী বা নিরপরাধী সাব্যস্ত করা হইবে।

৫। গুরুতর ফৌজদারী মামলায় জুরিসমেত বিচারকের সম্মুখে বিচার হইবে।

৬। অন্ততঃ উচ্চতর আদালতে খোলা আদালতেই রায়দান করা হয় এবং রায়ের কারণ দর্শানো হয়।

৭। সাধারণতঃ প্রায় সব বিচারেই একবার অন্ততঃ আপীল করিবার সুযোগ পাওয়া যায়।

(খ) পদ্ধতিগত নিয়মকানুনও (Rules of Procedure) অত্যন্ত প্রশংসনীয়; আদালত সমূহে দীর্ঘ দিনের বিচারের অভিজ্ঞতা হইতে এগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। দ্রুত বিচার, আনুষ্ঠানিক ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর কম গুরুত্ব আরোপ, উল্লেখযোগ্য ন্যায়-বিচারের ব্যবস্থা,—এইগুলিই হইল বিচারপদ্ধতির মূল লক্ষ্য।

(গ) বিচারক ও আইনজীবী উভয় পক্ষের পারদর্শিতাও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচারকের শ্রেণীগত সংস্কার (class prejudice) এবং ব্যয় সাপেক্ষ বিচার পদ্ধতি (expensive justice) এ ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি বলিয়া গণ্য হয়।

নবম অধ্যায়

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন গণতন্ত্রের শিক্ষাভূমি বলিয়া বিবেচিত হয়। বৃহত্তর রাষ্ট্রনীতিতে নেতৃত্বের শিক্ষানবিশীর জন্যই নহে, ইহা একদিকে কেন্দ্রের দায়িত্বভার লঘু করিয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করে, অপরদিকে বৃহত্তর জনসমাজকে শাসনব্যবস্থায় জড়িত করিয়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ়তর করে।

সুদূর অতীতে স্যাক্সন যুগ হইতে নর্ম্যান শাসনকাল পার হইয়া, টিউডর-ষ্টুয়ার্ট শাসন অতিক্রম করিয়া, আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার ধারা বিভিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে আধুনিক যুগে আসিয়া পড়িয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লবের ফলে দেশে যে মৌলিক রূপান্তর ঘটে তাহা স্থানীয় শাসনকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ১৮৩৫ সালের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনস্ আইন (Municipal Corporations Act, 1835), ১৮৮৮ সালের স্থানীয় শাসন আইন (Local Government Act of 1888), ১৮৯৪ সালের জিলা ও প্যারিশ কাউন্সিল আইন (District and Parish Councils Act of 1894) পরবর্তী ১৯২৯ ও ১৯৩৩ সালের স্থানীয় শাসন আইন (Local Government Act of 1933) স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে। এই সকল সংস্কারের ফলে ইংল্যাণ্ডে এখন স্থানীয় শাসন পাঁচভাগে বিভক্ত: (১) কাউন্টি শাসন বিভাগ (administrative county), (২) বরো (borough), (৩) পৌর কাউন্টি (urban county), (৪) গ্রাম্য কাউন্টি (the rural county) ও প্যারিশ (parish)। সারা দেশকে প্রথমতঃ কতকগুলি কাউন্টি শাসনে ভাগ করা হয়। এইগুলি আবার জনসংখ্যার ঘনতা অনুপাতে পৌর কাউন্টিতে বিভক্ত। গ্রাম্য কাউন্টিগুলিকে প্যারিশে বিভক্ত করা হয়; প্যারিশগুলি নিজস্ব কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত। যে অঞ্চলগুলি মিউনিসিপ্যাল সনদ লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে বরো বলা হয়। বৃহত্তর বরোগুলি কাউন্টি বরো বলিয়া পরিচিত। লণ্ডনের শাসনব্যবস্থা স্বতন্ত্র গোত্রীয়। ইংল্যাণ্ডে প্রায় ৬২টি শাসন বিভাগীয় কাউন্টি এবং ৮০টির অধিক কাউন্টি বরো রহিয়াছে। কাউন্টির শাসন-এলাকার

স্থানীয় শাসনের বিভাগ

অভ্যন্তরে অবস্থিত হইলেও, কাউন্টি বরোগুলি ইহাদের পরিচালনাধীন নহে।

কাউন্টি-শাসন

কাউন্টি শাসনের পরিচালকমণ্ডলী সভাপতি, অল্ডারমেন (Aldermen) এবং কাউন্‌সিলারগণ লইয়া গঠিত। কাউন্টিকে বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে ভাগ করিয়া তথাকার ভোটারদের দ্বারা কাউন্সিলারগণ নির্বাচিত হন। জনসংখ্যার উপর কাউন্সিলারদের সংখ্যা নির্ভর করে। কাউন্সিলারগণ তাঁহাদের সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সংখ্যক অল্ডারমেন নির্বাচন করেন। উভয়েই একই প্রকার অধিকারাদি ভোগ করেন। অল্ডারমেনের কার্যকাল ৬ বৎসর। তবে অর্ধেক সংখ্যক অল্ডারমেন তিন বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন।

কাউন্টি কাউন্‌সিলের বৎসরে চারিটি অধিবেশন হয়; প্রয়োজনে আরও ঘন ঘন সভা বসিতে পারে। গ্রাম্য জেলা কাউন্সিলের কার্যাদির তদারক করা, রাস্তা, সেতু, প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ; কিছু পুলিস ব্যবস্থা চালু রাখা, উন্মাদালয়, রিফর্মেটরী, শিল্পশিক্ষালয়, প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করা, লাইসেন্‌স্ প্রদান করা, বার্ধক্যের পেন্‌সন বা কাউন্টির শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা প্রভৃতি হইল ইহার কাজ।

কাউন্টি কাউন্সিল ও তাহার কমিটিগুলি প্রধানতঃ নীতি নির্ধারণ করে; নিয়মিত কার্যাদি চালাইয়া যায় স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ।

গ্রাম্য-জেলা

কাউন্টি শাসনের অধীনে কতকগুলি গ্রাম্য প্যারিশ লইয়া একটি গ্রাম্য জেলা গঠিত। ইংল্যাণ্ডে এরূপ ৪৭৫টি গ্রাম্য জেলা রহিয়াছে। প্রত্যেক জেলায় নির্বাচিত কাউন্সিল রহিয়াছে। জনস্বাস্থ্য, জলসরবরাহ, প্রভৃতি ইহার দায়িত্বাধীন।

গ্রাম্য-প্যারিশ

গ্রাম্য জেলার অভ্যন্তরে রহিয়াছে গ্রাম্য প্যারিশগুলি। প্রত্যেকেরই একটি করিয়া প্যারিশ কাউন্সিল রহিয়াছে। কাউন্টি কাউন্সিলের পরিচালনাধীনে এগুলি কাজ করে।

পৌর জেলা

জনসংখ্যা যেখানে বিশেষ ঘনসংবদ্ধ হওয়ায় জনস্বাস্থ্য, জলসরবরাহ, প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, কাউন্টি কাউন্সিল সেই এলাকাগুলিকে পৌর-জেলায় সংগঠিত করে। এরূপ ৫৭০টি পৌর জেলা বর্তমানে কাজ করিতেছে। জেলার প্রতি প্যারিশ হইতে অন্ততঃ একজন কাউন্সিলার নির্বাচন করিয়া জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়। কাউন্সিলারগণ একজন সভাপতি নির্বাচন করেন; অল্ডারমেন নাই। ছোটখাট পথঘাট, গৃহসংস্থান, জনস্বাস্থ্য, লাইসেন্স প্রদান, প্রভৃতি ইহার দায়িত্ব।

শহরাঞ্চলে সনদবিশিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি বা বরোর সংখ্যা ৩১২। ইহার মধ্যে ৮০টি কাউন্টি-বরো; ইহাদের কাউন্টিশাসন ও পৌরশাসন উভয়জাতীয় ক্ষমতাই রহিয়াছে। কাউন্টিগুলি ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতে পারে না। মেয়র, অল্ডারমেন ও কাউন্সিলার লইয়া উভয় প্রকার বরোর শাসনব্যবস্থা গঠিত। কাউন্সিলারগণ নির্বাচিত হন ৩ বৎসরের জন্য; কাউন্সিলারগণ এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যার অল্ডারমেন নির্বাচন করেন, সকলে মিলিয়া মেয়র নির্বাচন করেন। ইনি সভাপতিত্ব করেন এবং কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন।

বরো

এই কাউন্সিলগুলি পৌরশাসনের কেন্দ্রস্থল। ইহারা উপ-আইন (bye-laws) প্রণয়ন করে, স্থানীয় কর নির্ধারণ করে, স্থানীয় বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করে, কর্মচারী নিয়োগ করে এবং রাস্তাঘাট, পুলিশ, অগ্নিনির্বাপণ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে পৌর দপ্তরগুলির কার্যাদির তত্ত্বাবধান করে। কমিটি প্রথার যথেষ্ট ব্যবহার এই কাউন্সিলগুলি করিয়া থাকে।

লক্ষণীয় বিষয় যে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে স্থানীয় শাসনবিভাগের উপর কেন্দ্রীয় শাসনের কর্তৃত্ব ক্রমেই বাড়িতেছে। কেন্দ্রীয় সাহায্য তহবিলের (Central grants-in-aid) মারফত প্রধানতঃ এই নিয়ন্ত্রণ আসে। কোন কারণে অর্থ দিলেই সে অর্থ-সংক্রান্ত কার্যের তত্ত্বাবধান চাপিয়া বসিয়া যায়। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য দপ্তর জলসরবরাহ, জনস্বাস্থ্যবিভাগ প্রভৃতির সাধারণ তত্ত্বাবধান করে; স্বরাষ্ট্রদপ্তর স্থানীয় পুলিশবিভাগের উপর নজর রাখে, শিক্ষাবিভাগের শিক্ষা সম্বন্ধে তত্ত্বাবধানের অধিকার আছে; পরিবহণদপ্তর ট্রাম, ফেরি, ডক, প্রভৃতি সম্বন্ধে যোগাযোগ করে। ইহা ছাড়া গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতিও কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানের অধীন। অবশ্য কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধান উপদেশদান, পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ, সম্মতি বা অসম্মতিজ্ঞাপন প্রভৃতির মধ্যেই নিবদ্ধ।

জাতীয় শাসনের কর্তৃত্ব

লণ্ডনের শাসনের তিন বিভাগ: লণ্ডন মহানগরী (City of London), লণ্ডন কাউন্টি এবং মেট্রোপলিটান লণ্ডন। মহানগরী আসলে সমগ্র এলাকার ক্ষুদ্র কেন্দ্র। শাসন চলে লর্ড মেয়র ও তিনটি কাউন্সিলের দ্বারা। কাউন্সিলারগণ ও অল্ডারমেন ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত হন; লর্ড মেয়র নাগরিকসভা হইতে নির্বাচিত হন। ইহার বিশেষ ক্ষমতা নাই, কিন্তু পদটি অত্যন্ত সম্মানজনক। কাউন্টি শাসন পরিচালিত হয় ১২৪ জন কাউন্সিলার এবং ২০ জন অল্ডারমেন দ্বারা। ইহার ক্ষমতা প্রচুর। পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখা, অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা, সুড়ঙ্গ ও ফেরির

লণ্ডনের স্থানীয় শাসন

বন্দোবস্ত, রাস্তার উন্নয়ন ; জনস্বাস্থ্য দপ্তরের সম্মতি অনুযায়ী স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, ট্রামওয়ে ব্যবস্থা, গৃহসংস্থান, বস্তি অপসারণ, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যাপক কার্যভার ইহার উপর ন্যস্ত। বলা যাইতে পারে, লণ্ডন কাউন্টির শাসন চলে ২৮টি, বরো কাউন্সিলের মিলিত যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা জাতীয় পদ্ধতিতে। প্রত্যেকটি বরোরই নিজস্ব কাউন্সিলার, অল্ডারমেন ও মেয়র রহিয়াছে। স্থানীয় পথনির্মাণ, আলোর ব্যবস্থা ; পথ পরিষ্কার রাখা, পয়ঃপ্রণালী খনন, জনস্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি ইহাদের দায়িত্ব। লণ্ডনের পুলিস বিভাগ অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন।

————

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক দল

ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক দলপ্রথার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ ইহার চরিত্র ও ও কর্মপদ্ধতি না বুঝিলে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নহে। ব্রিটিশ দলপ্রথার মাধ্যমেই রাজা আজ ক্ষমতাহীন এবং প্রধানমন্ত্রী এত ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। এই দলপ্রথার উদ্ভবের ভিতর দিয়াই পার্লামেণ্টে ও ক্যাবিনেটের পারস্পরিক সম্পর্ক আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; ক্যাবিনেটের উপর পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে আজ পার্লামেণ্টের উপর ক্যাবিনেটের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ যে কোন দেশের গণতন্ত্র সার্থক হইতে পারে সংগঠিত রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মারফতে। সুতরাং ব্রিটিশ গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনায় দল সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক দলের সহিত তুলনা খুব স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। উভয় রাষ্ট্রেই খুব লক্ষণীয় মিল প্রকট। উভয় রাষ্ট্রের দলই খুব বৃহৎ ও জনপ্রিয় সংগঠন। উভয় রাষ্ট্রেই স্বাভাবিক অবস্থায় জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য মাত্র দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক দলের। সমগ্র জনতাকে এই দুই বিকল্প কর্মসূচী ও নেতৃত্বের মধ্যে শাসনক্ষমতা অর্পণের যোগ্য শক্তি বাছিয়া লইতে হইবে।

মার্কিন ও ব্রিটিশ দল-প্রথায় মিল

দুইটি রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষণীয় আপেক্ষিক কেন্দ্রীকরণের (centralisation) ভিতর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা রহিয়াছে মূলতঃ রাজ্য ও স্থানীয় দলীয় সংগঠনের হস্তে; এই সংগঠনগুলির সমর্থন ভিন্ন জাতীয় সংগঠনের নেতৃত্বে টিকিয়া থাকা যায় না। দুইটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময় জাতীয় সংগঠন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু স্থানীয় সংগঠনগুলি সক্রিয় থাকে। পার্টিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে দাক্ষিণ্য (patronage) বিতরণের ভিতর দিয়া। ফলে সংগঠনের কাজ ক্রমেই নিয়মিত চাকুরিতে পর্যবসিত হইয়াছে। এবং যাহারা চাকুরি করে তাহাদের প্রধান স্বার্থ হইল চাকুরি বজায় রাখা, দলের কর্মনীতি বা দলীয় স্বার্থ তাহাদের প্রধাণ প্রেরণা নহে।

তাহাদের পার্থক্য

ব্রিটেনে জাতীয় সংগঠন দিতে পারে নেতৃত্বের মর্যাদা এবং নির্বাচনী ব্যয়ভারে কিছু সাহায্য। দলগুলি সুসংবদ্ধ এবং কেন্দ্রীকৃত। সুতরাং জাতীয় কর্মনীতি লইয়া মার্কিন দলগুলির তুলনায় ব্রিটিশ দলের মাথাব্যথা অনেক বেশী।

উপরন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি দলকেই নানা প্রকার সংঘাতমুখী আংশিক, শ্রেণীগত ও সামাজিক স্বার্থকে খুশী রাখিয়া নির্বাচনে জয়লাভ করিতে হয়। কিন্তু কোন এক শ্রেণীর স্বার্থের সোচ্চার সমর্থন অপর শ্রেণীকে বিমুখ করিবে। সুতরাং দলীয় কার্যসূচীতে সকলকেই সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু আসল সমস্যা অস্পষ্টতার মায়াজালে আবৃত করিয়া রাখাই নিয়ম। তুলনায় ব্রিটিশ দলগুলির কর্মসূচী অনেক বেশী সরল ও স্পষ্ট। তাহা নীতির জন্য তাহারা সানন্দে পরাজয় বরণ করিতে ইচ্ছুক বলিয়া নয়; ব্রিটেনে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জটিলতা অনেক কম।

মার্কিন দলগুলির তুলনায় ব্রিটিশ দলগুলিতে শৃংখলা অনেক বেশী দৃঢ় ও স্পষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে দক্ষিণাঞ্চলের রক্ষণশীল ডেমোক্রেটরা রিপাব্লিকান দলের ঝানু পুঁজিপতিদের সহিত সহজেই হাত মিলাইয়া থাকেন; দুই দলেরই রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকগণ দলীয় সীমা অতিক্রম করিয়া নিজদলীয় ভিন্ন মতাবলম্বীদের আক্রমণ করিতেছেন এ ঘটনা হামেশাই দেখা যায়। দলীয় শৃংখলায় তাঁহাদের বাঁধা দুষ্কর।

ব্রিটেনেও দলীয় শৃংখলার শ্লথ চরিত্র পূর্বে যথেষ্টই ছিল। তাহার কারণ, কমন্সসভার নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার ছিল খুবই সামান্য লোকের; কমন্সসভার সদস্যের সহিত ভোটারদের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকিত; ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতেই নির্বাচন চলিত, দলীয় নীতির ভিত্তিতে নহে। ১৮৩২ সালের সংস্কারেও অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। সে পরিবর্তন আসিল ১৮৬৭ সালের সংস্কারের পর। ১৮৭৪ সালের নির্বাচনে ডিজরেলি প্রমাণ করিয়া দিলেন যে ভোটাধিকারের ব্যাপক প্রসারের ফলে নির্বাচনে জয়লাভ ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করিবে না, করিবে দলীয় কর্মসূচীর জনপ্রিয়তা ও দলীয় সংগঠনের কার্যকারিতার উপর।

ব্রিটেনে দেশব্যাপী দলীয় সংগঠন গড়িয়া উঠার ফলে পার্লামেন্ট সদস্যের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইল। দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া দলে থাকা যায় না; অথচ দলীয় শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের একক দাঁড়াইবার ক্ষমতাই বা কতটুকু? উপরন্তু ভোটার জানে যে একক কমন্সসভা সদস্য জাতির কার্যক্রমকে প্রভাবিত করিতে পারিবে না; বিকল্প দল দুইটির একটিই সরকার গঠন করিবে। ইহার ফলে একদিকে কমন্সসভায় স্বতন্ত্র সদস্য নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, অপরদিক দলীয় সমর্থকগণ কমন্সসভায় নেতৃবৃন্দের সমর্থনে শৃংখলার শৃংখলাবদ্ধ হস্ত উত্তোলন করিয়া যাইতেছেন।

একই প্রক্রিয়ার ব্রিটেনে দলীয় নেতার কর্তৃত্ব অনেক বেশী। চার্চিলকে প্রধান মন্ত্রীরূপে চাহিলে সাধারণ ভোটারকে রক্ষণশীল দলের প্রার্থীকেই ভোট দিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রপতি ও রিপাব্লিকান কংগ্রেস-সদস্য-পদ-প্রার্থীর সমর্থনে ভোট দেওয়া বিরল নহে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলগুলির শ্রেণীগত পার্থক্যও অনেক বেশী আবছা, দুই দলের মধ্যবর্তী সীমানা অনেক অস্পষ্ট। অবশ্য ক্রমেই দেখা যাইতেছে যে বিত্তশালীগণ রিপাব্লিকান দলের পক্ষে এবং নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণী ডেমোক্রেটিকদের পক্ষে ভোট দিয়া চলিয়াছে। তুলনায় ব্রিটেনে শ্রেণীবিভাগ অনেক বেশী সুস্পষ্ট। শ্রমিকদলের আক্রমণ বৃহৎ ধনিক দ্বারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপর। তাহাদের সমর্থন প্রধানতঃ ট্রেড ইউনিয়ন হইতে আসে। রক্ষণশীল দল সর্বশ্রেণী হইতে সমর্থক সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জাতির বিত্তশালীগণই তাহার মেরুদণ্ড।

তুলনামূলক গুণাগুণ সম্বন্ধে এস্থলে মতামত প্রকাশ দুষ্কর। দুইটি বৃহৎ ধনিক শ্রেণী পরিচালিত গণতন্ত্র হিসাবে উভয়েরই দোষগুণ পরিলক্ষিত হয়। এক দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জটিলতা অধিক; দলীয় শৃংখলা দুর্বল; শাসন ও আইন বিভাগের সম্মিলিত কার্যকারিতা খর্বিত; প্রতিযোগী দলগুলির পার্থক্যের সীমারেখা অস্পষ্ট। অন্যত্র উন্নততর শৃংখলা ও কার্যকারিতার মূল্য দিতে হইয়াছে পার্লামেণ্ট কর্তৃক শাসন বিভাগকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতাহ্রাসে, স্থানীয় সংগঠন ও সাধারণ সদস্যের নেতৃত্বের উপর নিয়ন্ত্রণের শক্তির অবক্ষয়ে। উভয় দেশেই নিজস্ব প্রথার সমর্থক ও সমালোচকের অভাব নাই; উভয় দেশেই সংস্কারের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়।

ব্রিটেনে দুইটি দলের মধ্যেই মূল প্রতিযোগিতা, রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল। শ্রমিকদলের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদ প্রবল, ইহার মূল আবেদন শ্রমিক শ্রেণীর নিকট, যদিও ইহার নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট এবং ইহার সমর্থকগণের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাও যথেষ্ট। রক্ষণশীল দলের ঐতিহ্য হইল রাজভক্তি, গীর্জাভক্তি ও সাম্রাজ্যপ্রীতি। তথাপি পরিবর্তনশীল জগতের সহিত মানাইয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে। ১৯৪৭ সালের রক্ষণশীলদল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার নীতি এবং পরে কল্যাণকর রাষ্ট্রের নীতি গ্রহণ করিয়াছে; একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের কথা বলিতেছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও মধ্যবিত্ত সমাজের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি

ব্রিটেনে প্রধান প্রতিযোগী রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল

সম্বন্ধে ইহার দরদ গগণচুম্বী। ইহার সমর্থন প্রধানতঃ বিত্তশালীদের মধ্যে ও গ্রামাঞ্চলে। ১৯৫৫ সালের পূর্বে কোন কায়িক শ্রমিক রক্ষণশীল দলের পক্ষে কমন্সসভায় আসেন নাই। ১৯৪৫ সালের এক হিসাবে দেখা যায় কমন্‌সসভার রক্ষণশীল সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন অভিজাত উপাধিধারী অথবা তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। শতকরা ৪০ জনেরও অধিক কোম্পানীর ডিরেক্টর। ১৯৫১ সালের নির্বাচনে ৮০ জন কোম্পানী ডিরেক্টর রক্ষণশীল দলভুক্ত কমন্‌সসভার সদস্য ছিলেন।

শ্রমিকদলের সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) নীতিতে গঠিত। মূল চারটি শক্তি, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সংস্থা ও শ্রমিকদলের আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ শ্রমিকদলকে গড়িয়াছে। শ্রমিকদলের বার্ষিক সম্মেলন হয়; প্রতি সদস্য-সংগঠন হইতে প্রতিনিধি আসে সেই সংগঠনের সংখ্যানুযায়ী ভোটের অধিকার লইয়া। কমন্‌সসভা ও লর্ডসভার শ্রমিক দলীয় সদস্য এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনের স্থিরীকৃত প্রার্থীগণও এ সম্মেলনের সদস্য। ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিপুল সদস্য সংখ্যার ফলে মোট ভোটের বৃহদংশই তাহাদের কুক্ষিগত। ট্রেড ইউনিয়নগুলির নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের মূল সুর বাঁধিয়া দেয়। তথাপি কিছুটা গণতান্ত্রিক ভিত্তি থাকার ফলে সম্মেলনে তীব্র বাদানুবাদ ও নেতৃত্বের সমালোচনা হয়, নেতৃত্বকেও জবাবদিহি করিতে হয়।

রক্ষণশীলদলের সম্পূর্ণ নাম হইল 'দি ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব কনজারভেটিভ এণ্ড ইউনিয়নিষ্ট এসোসিয়েসন' (The National Unlon of Conservative and Unionist Associations)। ইহাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। বার্ষিক সম্মেলনে সমালোচনা হয় না; নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দেন, শ্রোতৃবৃন্দ করতালি সহকারে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। শ্রমিকদলের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পার্লামেন্টের সদস্যদের উপর না হইলেও, অন্ততঃ কার্যকরী সমিতির নিকট বাধ্যতামূলক নির্দেশ। রক্ষণশীল-দলের সম্মেলনের সে অধিকার নাই। দলীয় নেতা নীতি নির্ধারণ করেন; দলীয় অফিস তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন, দলীয় তহবিল তাঁহার নির্দেশে ব্যয়িত হয়। রক্ষণশীল-দলের কার্যকরী সমিতি থাকিলেও তাহার ক্ষমতা সামান্যই। তুলনায়, শ্রমিকদলের কার্যকরী সমিতির অনুমতি ব্যতিরেকে কাহাকেও কমন্সসভার প্রার্থীপদে মনোনীত করা যাইবে না এবং প্রয়োজনে কোন সদস্যকে অথবা কোন সংগঠনকে দল হইতে বহিষ্কারের ক্ষমতা তাঁহার রহিয়াছে।

বাহিরের সংগঠন এইরূপ হইলেও উভয় দলেই পার্লামেন্টের সদস্যদের লইয়া যে

দল গঠিত তাহাই আসল শক্তির কেন্দ্র। শ্রমিকদলের ক্ষেত্রে এই পার্লামেন্টারি দলই প্রতি বৎসর নেতাকে নির্বাচন ও পুনর্নির্বাচন করে। ক্ষমতায় থাকিলে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে ইহার অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বমতে চলিবার সুযোগ থাকে। রক্ষণশীল-দলের নেতা সর্বদা নির্বাচিত হয় না; রাজার নির্বাচনই অনেক সময় দলের উপর কার্যকরী হয়।

আসলে দুই দলের পার্থক্যের সীমারেখাও অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। শ্রমিকদলের নরমপন্থী নেতৃত্ব স্বমতে এবং মধ্যপথাবলম্বী জনতার ভোটের মোহে সমাজতন্ত্রের আদর্শে জল মিশাইয়া সারবস্তু প্রায় বিসর্জন দিয়া বসিয়াছেন। রক্ষণশীলদলও ভোটের প্রয়োজনে নূতন অবস্থায় প্রাচীন সংস্কার বর্জন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রথা পারস্পরিক বুঝাপড়াকে উভয়ের মিলের দিককেই প্রকট করিয়া তুলিতেছে। তুলনায় রক্ষণশীলদলের বেশী হইলেও শ্রমিকদলের সংগঠনেও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রাধান্য এবং নেতার ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রকট।

আরও দুইটি ক্ষুদ্রতর দল

উদারনৈতিক দলের গৌরবময় দিন অতীত। গ্ল্যাডস্টোনের আয়ার্ল্যাণ্ডের হোমরুল বিল যে ভাঙ্গন আনিয়াছিল, তাহাতে রক্ষণশীল অংশ রক্ষণশীলদলে সরাসরি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে শ্রমিকদলের স্বতন্ত্র উত্থান উদারনৈতিক দলের ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিল। দুইটি প্রধান বিরূপ শক্তির মধ্য পথে দাঁড়াইয়া উদারনৈতিকদল নিজ সমর্থন প্রসার করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। সাম্প্রতিক যুগে উদারনৈতিকদলের মধ্যে কিছুটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। শ্রমিকদলে আভ্যন্তরীণ বিরোধ, নেতৃত্বের নরমপন্থা, শ্রমিকদলের সমর্থকের একটা অংশকে হতাশ ও বিরক্ত করিয়া তুলিতেছে। অপরদিকে রক্ষণশীলদলের নেতৃত্বের প্রতিও অনাস্থায় একটা তৃতীয় পন্থার দিকে কিয়দংশ ঝুঁকিয়াছিল। সাম্প্রতিক নির্বাচনে উদারনৈতিকদলের ভোটের ইঙ্গিৎ সামান্য আশাপ্রদ। তথাপি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ দলের উপর ভবিষ্যতের ভরসা স্থাপনের কোন কারণ নাই।

১৯১৭ সালের সোবিয়েৎ বিপ্লবের প্রেরণায় সামান্য কিছু সংখ্যক সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কমিউনিষ্ট পার্টি স্থাপন করে। শ্রমিকদলকে ভাঙ্গিয়া বিভেদ সৃষ্টির পরিবর্তে ইহারা সামগ্রিক সদস্যীকরণ (collective affiliation) দাবি করে। ইহাদের চরমপন্থী মনোভাবে শঙ্কিত শ্রমিকদলের নেতৃবৃন্দ বরাবর দলের বাহিরেই ইহাদের রাখিয়া দিয়াছে। এমন কি কমিউনিষ্ট প্রভাবিত সন্দেহে অনেক সদস্যকে

দল হইতে বিতাড়ণ করিয়াছে। ইহাদের মূল নীতি ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান ; যদিও তাহারা পার্লামেন্টোরি প্রথায় ব্যক্তিগত মালিকনায় ধনব্যবস্থা ও শিল্পব্যবস্থায় উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার নীতি ঘোষণা করিয়াছে। দীর্ঘকাল কমন্সসভায় একজন বা দুইজন সদস্য থাকিলেও, ১৯৫০ সালের পরবর্তী কোন নির্বাচনে একজনও কমিউনিষ্ট সদস্যও জয়লাভ করিয়া কমন্সসভায় প্রবেশাধিকার পায় নাই।

আধুনিক শাসনব্যবস্থা

সুইটজারল্যাণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

সুইটজারল্যাণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান : পশ্চিম ইউরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাষ্ট্র সুইটজারল্যাণ্ডের উত্তরে জার্মানী, দক্ষিণে ইতালি, পশ্চিমে অষ্ট্রিয়া ও লাইচেনষ্টেইন নামক স্বাধীন জনপদ ও পূর্বে ফ্রান্স। ইহার আয়তন মাত্র ১৫,৯৫০ বর্গমাইল। এই দেশটি দৈর্ঘ্যে ২২৬ মাইলের কিছু বেশি, প্রস্থে ১৩৭ মাইল। এই ছোট রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৫২ লক্ষ ৩৫ হাজার। আল্‌প্‌স পর্বতমালার সর্বোচ্চ অঞ্চলে অবস্থিত এই রাষ্ট্রটি জলসম্পদে সমৃদ্ধ। সুদৃশ্য ও বিশাল হ্রদ, উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ, অসংখ্য জলপ্রপাত, হিমানীস্তূপ, এই দেশটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভূষিত করিয়াছে। ইউরোপের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর উৎস সুইটজারল্যাণ্ডের তুষার হিমবাহে অবস্থিত। রাইন্, ড্যানিউব্, পো, রোন্ সুইটজারল্যাণ্ড হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। সমগ্র সুইটজারল্যাণ্ডের সিকি ভাগ প্রস্তরবহুল এবং কৃষির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অবশিষ্ট অংশের ৩৫ শতাংশ মাত্র চাষের উপযোগী। বাকি অংশ বন ও মেষ-গবাদির চারণভূমি।

সুইটজারল্যাণ্ডের জাতীয় ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রভাব : এ্যারিষ্টটল, বোড্যাঁ, মঁতেস্ক্যু, বাক্‌ল্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে জাতীয় জীবনের উপর ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রভাব অসামান্য। সুইটজারল্যাণ্ডের ইতিহাস দ্বারা এই নীতি অনেকাংশে সমর্থিত হইয়াছে। (১) পর্বতসঙ্কুল দেশে বাস করিবার ফলে সুইস্ জাতি শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে এবং বীরত্বের সহিত আপন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিরুদ্ধশক্তির সহিত সফল সংগ্রাম করিয়াছে। (২) দেশের আভ্যন্তরীণ পর্বতসঙ্কুলতা, দারুণ শৈত্য, গিরিসংকটের বহুলতা এবং যাতায়াতের অসুবিধা সুইস্‌দিগকে বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত আপন দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সহায়তা করিয়াছে। স্বাধীনতা তাই সুইস্ জাতির চিরসঙ্গী। (৩) সুইটজারল্যাণ্ডের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ঐ দেশের শাসনব্যবস্থাকে আরও একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। সুইটজারল্যাণ্ড অনেকগুলি ছোট ছোট উপত্যকায় বিভক্ত। প্রায় প্রতিটি অন্ততঃ হইতে বন্ধুর পর্বতের

দ্বারা পৃথকীকৃত। ইহার ফলে এক একটি উপত্যকায় এক একটি মানবগোষ্ঠী স্বীয় রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পাইয়াছে। এই কারণেই সুইটজারল্যাণ্ডে বিভিন্ন রাজ্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যসমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। (৪) ইহাও লক্ষণীয় যে সুইটজারল্যাণ্ড উত্তরে জার্মানী, দক্ষিণে ইটালী, পূর্বে ফ্রান্স ও পশ্চিমে অষ্ট্রিয়া হইতে কোন দুরতিক্রমণীয় ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা বিভক্ত নহে। ইহার ফলে প্রাচীন যুগ হইতে ঐ কয়টি দেশের মানুষই সুইটজারল্যাণ্ডে আসিয়া বসবাস করিয়াছে এবং কালক্রমে আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়া নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন অধিবাসীগণ সংস্কৃতির দিক হইতে কিছুটা ভিন্ন-ভিন্নই রহিয়া গিয়াছে। তাই এই দেশের নাগরিকেরা প্রধানতঃ জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয় এই তিনটি ভাষা-ভাষী। প্রায় তিনচতুর্থাংশ অধিবাসী জার্মান, এক পঞ্চমাংশ ফরাসী ও অবশিষ্টাংশের বেশির ভাগ ইতালীয় ভাষা-ভাষী। ইহা ব্যতীত সুপ্রাচীন ল্যাটিন ভাষা হইতে উদ্ভূত প্রাচীন রোম্যান্স্ ভাষা-ভাষী ব্যক্তিও কিছু রহিয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা শতকরা ১ জন মাত্র। ইহাও লক্ষণীয় যে সুইটজারল্যাণ্ডের এক একটি ক্যাণ্টনে বা রাজ্যে এক এক ভাষাভাষী মানুষের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। তথাপি জাতীয় সংহতি এমনই সুদৃঢ় যে ভাষার পার্থক্য তাহা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

সুইটজারল্যাণ্ডে ভাষার দিক হইতে যেমন ঐক্য অবর্তমান, ঠিক তেমনি ধর্মের দিক হইতেও তাহারা এক নহে। যদিও দেশের অধিকাংশ নাগরিকই খ্রীষ্টান, তথাপি তাহারা এক সম্প্রদায়ভুক্ত নহে, শতকরা প্রায় ৫৭ জন প্রটেষ্টাণ্ট এবং ৪১ জন ক্যাথলিক। কয়েক হাজার ইহুদীও সুইটজারল্যাণ্ডের নাগরিক। ১২টি ক্যাণ্টনে ক্যাথলিকদের চেয়ে প্রটেষ্টাণ্টেরা অনেক বেশি, আবার ১০টি ক্যাণ্টনে ক্যাথলিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রটেষ্টাণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাণ্টনগুলিতে বিপুল সংখ্যায় ক্যাথলিকদেরও বস-বাস আছে; তেমনি ক্যাথলিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাণ্টনসমূহেও প্রটেষ্টাণ্টদের অনুপাত মোটেই নগণ্য নহে। এই কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলা-মেশা ও তদ্দরুন একতার উদ্ভব সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

সুইস্ জাতীয়তার একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে ভাষা ও ধর্মগত পার্থক্য অতিক্রম করিয়া ইহা জাতিকে উদার মিলন ক্ষেত্রে পৌছাইয়া দিয়াছে।

সুইস্ জাতির ঐক্যবোধ

জাতীয় একতা এই দেশে যেরূপ সুদৃঢ় এবং সর্বব্যাপী যে যদি বলা যায় সুইটজারল্যাণ্ডের ন্যায় সুসম্বদ্ধ ও দেশপ্রাণ জাতি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নাই তাহা হইলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না।

সুইটজারল্যাণ্ডে, জার্মান, ইতালীয়ান ও ফরাসী এই তিনটি ভাষা জাতীয় ও সরকারী ভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত অধিবাসী অন্ততঃ দুইটি ভাষা লিখিতে ও বলিতে পারেন। ১৯৩৮ সালে রোম্যান্স ভাষাকেও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। ভাষার ব্যাপারে সুইটজারল্যাণ্ড যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহা বহু-ভাষাভাষী দেশ মাত্রেরই অনুকরণযোগ্য। ধর্মের ক্ষেত্রে সুইস্‌গণ দীর্ঘকাল হইতে যে অসাধারণ সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছে তাহাও বিস্ময়ের বস্তু।

ভাষা, গোষ্ঠী ও ধর্মের বিভিন্নতার জন্য সুইটজারল্যাণ্ডে সাংস্কৃতিক পার্থক্যও যে কিছু পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই পার্থক্যটুকু এক রাজনৈতিক জীবনবোধ ও আদর্শের প্রভাবে নগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিহাসের অমোঘ বিবর্তনের ফলে একটি আশ্চর্য জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া সুইটজারল্যাণ্ডে স্থানীয় মমত্ববোধ অর্থাৎ ক্যাণ্টন বা রাজ্যগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ক্যাণ্টনগুলির অধিবাসীদের অনুরাগ বিশেষ উল্লেখনীয়। কিন্তু স্থানীয় অনুরাগ অথবা cantonal patriotism সহজেই ছাড়াইয়া গিয়া সমগ্র অধিবাসী জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমে (national patriotism) উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সুইটজারল্যাণ্ডে একাধিক ভাষা বর্তমান কিন্তু ভাষাগত অন্ধতা নাই; এখানে একাধিক ধর্ম সম্প্রদায় রহিয়াছে কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিংসা নাই, এখানে সাংস্কৃতিক ও গোষ্ঠীগত পার্থক্য বিদ্যমান কিন্তু তজ্জনিত সঙ্কীর্ণতা অবর্তমান; এখানে স্থানীয় ক্যাণ্টনের প্রতি মমত্ববোধ রহিয়াছে কিন্তু প্রাদেশিকতা লেশমাত্র নাই। সুইস জাতি এক মহান ঐক্যবোধের দ্বারা সংহত হইয়া জাতীয়তার ক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। যে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ মনে করিতেন যে ভাষা, গোষ্ঠী ও ধর্মগত ঐক্য জাতীয়তাবোধের ভিত্তিস্বরূপ তাহারা যে ভ্রান্ত তাহা সুইটজারল্যাণ্ডের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।

সুইটজারল্যাণ্ডে জাতীয় ঐক্য ও শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস: প্রথম হইতেই সুইটজারল্যাণ্ড একটি একতাবদ্ধ জাতি হিসাবে ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করে নাই। দেখা যায় যে মধ্যযুগের প্রথমভাগে এই দেশটি ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ও ইতিহাসগত যোগাযোগ

বিশেষ ছিল না। তবে সকল রাষ্ট্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধিকারে বিশ্বাসী ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১২৯১ সালে অস্ট্রিয়ার রাজা ডিউক লিওপোল্ডের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনটি ছোট ছোট সুইস্ রাষ্ট্র একতাবদ্ধ হইয়া আধা-যুক্তরাষ্ট্রে বা Confederation গঠন করে এবং ১৩১৫ সালে মরগারটেনের যুদ্ধে সামন্ত শক্তিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। এই ভাবে সুইটজারল্যাণ্ডে জাতীয় একতা স্থাপনের সূত্রপাত হইল। পরবর্তী ৪০ বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে আরও পাঁচটি ক্যাণ্টন বা রাষ্ট্র উল্লিখিত ত্রিশক্তির সহিত যোগদান করে এবং আটটি ক্যাণ্টন লইয়া কনফেডারেশন গঠিত হয়। এই একতাবদ্ধ অষ্ট-ক্যাণ্টনের সহিত যুদ্ধে ১৩৮৬ সালে অস্ট্রিয়া পুনরায় পরাজিত হয়। বিভিন্ন ক্যাণ্টনের পরস্পরের সহিত সাময়িক বিবাদ থাকা সত্ত্বেও কনফেডারেশন আড়াইশত বৎসর বর্তমান থাকে। ১২৯১ হইতে রিফরমেশন পর্যন্ত সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার ইতিহাসের প্রথম যুগ বলা যাইতে পারে।

প্রথম যুগ—১২৯১ হইতে রিফরমেশন পর্যন্ত

রিফরমেশনের যুগে উপরোক্ত সুইস্ কনফেডারেশনের আটটি ক্যাণ্টনের মধ্যে অর্ধেকভাগ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মমত গ্রহণ করে, অর্ধেক ক্যাথলিক থাকিয়া যায়। একদিকে প্রটেষ্টাণ্ট ও অন্যদিকে ক্যাথলিক ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে তীব্র ধর্মীয় বিবাদ-বিসংবাদ রেষারেষি চলিতে থাকে। কিন্তু স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা বজায় রাখিবার তাগিদে এই রেষারেষি বৈরিতায় পরিণত হয় না এবং সকল ক্যাণ্টনগুলি কনফেডারেশনের আওতায় জাতীয় ঐক্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এইভাবে সুইটজারল্যাণ্ডের জাতীয়তার উদ্ভব হইল। ১৬৪৮ সালে ওয়েষ্ট-ফ্যালিয়ার সন্ধি অনুযায়ী সুইটজারল্যাণ্ডের উপর অস্ট্রিয়া প্রভাবিত পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের ক্ষমতা চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং সুইটজারল্যাণ্ড সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

দ্বিতীয় যুগ—রিফরমেশন যুগ—১৬৪৮ সাল পর্যন্ত

১২৯১ সাল হইতে ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত সুইটজারল্যাণ্ডে একপ্রকার কন্‌ফেডারেশন বর্তমান ছিল। পররাষ্ট্র-নীতি, যুদ্ধবিগ্রহ এবং ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও মতদ্বৈধের সমাধান এই কন্‌ফেডা-রেশনের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। এই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত একটি কেন্দ্রীয় ডিয়েট বা পরিষদের অধিবেশন মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে আহ্বান করা হইত। ডিয়েট বা কেন্দ্রীয় পরিষদ বিভিন্ন স্বাধীন ক্যাণ্টনের প্রতিনিধি-

-গণের দ্বারা গঠিত হইত। পরিষদীয় সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হইলে তাহা ক্যাণ্টনগুলির উপর আইনত বাধ্যতামূলক হইত না।

ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তীকালে সুইটজারল্যাণ্ডে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। ১৭৯৮ সালে ফরাসী ডাইরেক্টরীর সৈন্যদল সুইটজারল্যাণ্ড দখল করে এবং হেলভেটিক গণতন্ত্র নাম দিয়া একটি নূতন রাষ্ট্র স্থাপন ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই শাসন পদ্ধতি অনুযায়ী সুইটজারল্যাণ্ড ২২টি বিভাগে বিভক্ত হয়। প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় বিধানসভা স্থাপিত হইল এবং বিভাগগুলিকে সামান্য স্থানীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হইল। কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট বিধানমণ্ডলী স্থাপন করা হয়। এই সংবিধানবলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বর্ধিত হইয়া ক্যাণ্টনের স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সুইটজারল্যাণ্ডের অধিবাসীগণ ফরাসী কর্তৃক চাপাইয়া দেওয়া এই সংবিধানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিতে থাকে এবং পরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮০৩ সালে নেপোলিয়ন শান্তিস্থাপনে সমর্থ হন এবং Act of Mediation নামক আইন-বলে সুইটজারল্যাণ্ডের পুরাতন শাসনব্যবস্থা আংশিকভাবে পুনঃপ্রবর্তিত করেন।

তৃতীয় যুগ—
ফরাসী বিপ্লব হইতে
১৮১৫ সাল পর্যন্ত

নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুইটজারল্যাণ্ডের পুরাতন শাসনব্যবস্থা ফিরিয়া আসে। Unity in diversity অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে রাজনৈতিক একতার নীতি এই সময় হইতেই স্থায়িভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু নানা কারণে ১৮৪৫ সালে সুইটজারল্যাণ্ডের জাতীয় ঐক্যের ভিতর বিভেদ রেখা দেখা দেয়। এই বৎসরে ক্যাথলিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাণ্টনগুলি একত্রীভূত হইয়া Sonderbund অথবা একটি পৃথক রাষ্ট্র সমষ্টি গঠন করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ১৮৪৭ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই ক্যাথলিক রাষ্ট্র সমূহ পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধটি দ্বারা সুইটজারল্যাণ্ডের জাতীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে।

চতুর্থ যুগ—
১৮১৫ হইতে ১৮৪৮

১৮৪৮ সালের সংবিধানবলে সুইটজারল্যাণ্ডে কনফেডারেশনের পরিবর্তে কতকটা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংবিধান অনুসারে সমগ্র দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি যেমন, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ,

ক্যাণ্টনগুলির স্বার্থে কতকগুলি আর্থিক বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা—সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করা হয়। শাসন সম্বন্ধীয় (Executive) ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী (Parliament) দ্বারা নির্বাচিত ৭ জন মন্ত্রীর (Federal Council) হস্তে ন্যস্ত করা হইল।

পঞ্চম যুগ (১৮৪৮ হইতে ১৮৭৪)—১৮৪৮ সালের সংবিধান

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট বিধানমণ্ডলী বা Parliament -এর হস্তে। উচ্চপরিষদটি অর্থাৎ Council of States বা রাজ্য পরিষদ প্রতি ক্যাণ্টন হইতে সম সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইল; নিম্ন পরিষদ বা জাতীয় পরিষদ (National Council) সুইটজারল্যাণ্ডের সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি মণ্ডলী হিসাবে সংবিধানে স্থান পাইল। ১৮৪৮ সালের শাসন ব্যবস্থানুসারে একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় বা Federal Tribunal বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপিত হয়। কিন্তু বিচারান্তে কোন আইনকে সংবিধান বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা এই আদালতকে দেওয়া হয় না।

এই সংবিধানবলে প্রতি ক্যাণ্টনের ভৌগোলিক এলাকার সার্বভৌম নিরাপত্তা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় বটে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে একটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহা দ্বারা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠতা ও নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া হইল। কোন ক্যাণ্টনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে বা ক্যাণ্টনে ক্যাণ্টনে সংঘর্ষের সূচনা দেখা গেলে কেন্দ্রীয় যুক্তরাজ্য সরকারকে ক্যাণ্টনের ঐরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৮৪৮ সালের সংবিধান ছাব্বিশ বৎসর চালু থাকে। এই সময়ে শাসন পরিচালন ও আইন প্রণয়নের অভিজ্ঞতার ফলে বেশ বোঝা যায় যে কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী না করিলে শাসন সৌকর্য সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে। এই কালের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করে এবং দেশের একটি প্রতিনিধিমূলক অংশ Referendum, Initiative প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দাবি জানাইতে থাকেন। এই প্রাগ্রসর গণতান্ত্রিক আন্দোলন জনমতের উপর গভীর রেখাপাত করে। Federal Assembly বা কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলী নূতন সংবিধান প্রস্তুত করিয়া নাগরিক মতামত সংগ্রহের জন্য নাগরিক জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করেন। এই সংবিধান বিপুল গণভোটাধিক্যে এবং ২২টি ক্যাণ্টনের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত হয়। তদনুসারে ১৮৭৪ সালের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৮৭৪ সালের ২৯শে

ষষ্ঠযুগ (১৮৭৪ –)

যে নব-সংবিধান প্রবর্তিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি এই সংবিধানের মুলসূত্র। ১৮৭৪ সালের পরেও কয়েকবার সুইস্ সংবিধানের পরিবর্তন হইয়াছে। এই সকল পরিবর্তনের দ্বারা অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সংবিধানে আরও শক্তিশালী আকার ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার লক্ষণীয় বিশেষত্ব

(Characteristics of the Swiss Constitution)

পৃথিবীর সকল দেশেরই সংবিধান বা শাসনব্যবস্থারই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ইতিহাসের প্রবহমান ধারা জাতীয় জীবনের তটে অভিঘাত করিয়া কখনও ভাঙ্গিতেছে, কখনও গড়িতেছে। যাহাই করুক না কেন ইতিহাস জাতীয় জীবনে আপন স্বাক্ষর রাখিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব রূপ প্রতিভাত হইতেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থার উপর ইতিহাস যে বৈশিষ্ট্য আনিয়া দেয় এখানে তাহাই আমাদের আলোচ্য।

১। প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ন্যায় একটি লিখিত সংবিধান। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সুইস শাসনব্যবস্থায়ও কতকগুলি সংবিধান বহির্ভূত প্রথা স্থান পাইয়াছে। অর্থাৎ শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু অংশ অলিখিত রহিয়া গিয়াছে।

২। দ্বিতীয়তঃ সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা প্রায় ছয় শত বর্ষ ধরিয়া ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়াছে। শুধু মাত্র বিবর্তনের দিক হইতে বিচার করিলে সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা কতক পরিমাণে যুক্তরাজ্যের শাসন পদ্ধতির সহিত তুলনীয়। তফাৎ এই যে সুইটজারল্যাণ্ডের লিখিত সংবিধান রহিয়াছে কিন্তু যুক্তরাজ্যে সেইরূপ সংবিধান নাই।

৩। সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন-প্রণালী প্রজাতান্ত্রিক বা republican। বস্তুতপক্ষে এই দেশটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বপুরাতন প্রজাতন্ত্র।

৪। এই দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। যদিও ১৮৭৪ সালের সংবিধানে শাসনব্যবস্থাকে Confederation বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তথাপি মূলতঃ এই সংবিধানটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ২২টি ক্যাণ্টন লইয়া সুইস যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। প্রতিটি ক্যাণ্টনের আপন শাসনব্যবস্থা, নাগরিকত্ব সম্বন্ধে বিধি, নিজস্ব আইন, প্রথা ও ইতিহাস রহিয়াছে। প্রতি ক্যাণ্টনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতির উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি ক্যাণ্টনকেই প্রজাতান্ত্রিক হইতে হইবে, অন্যথা হইবার উপায় নাই। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ১৮৭৪ সাল হইতে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ইহার ফলে সুইটজারল্যাণ্ডবাসীগণের সুদৃঢ় জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়তর হইয়াছে।

৫। কেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে সংবিধানের গতি সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য। চারিটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে এই কেন্দ্রমুখীনতা বিবর্তিত হইয়াছে। তাহা হইল—যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয়তা এবং যানবাহন ও শিল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিধান। ১৯১৪ সালে বিশেষতঃ ১৯৩৯ সালে জাতীয় নিরাপত্তা, নিরপেক্ষতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা কল্পে এবং সুইটজারল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও খাদ্য-সরবরাহ সুরক্ষিত করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রভূত ক্ষমতা ব্যবহার করিবার অনুমতি দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী এই ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করিয়া সমগ্র সুইটজারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উল্লেখনীয় উন্নতি বিধানে সমর্থ হন। সুইটজারল্যাণ্ডের নাগরিকদের তরফ হইতে জাতীয় সরকার এই জন্য বিপুল সমর্থন লাভ করেন। এই সকল ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৩৫ সালে নাৎসী নীতি ও কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদ প্রচারের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৯৩৬ সালে একটি ইতালীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাণ্টনে ইটালীর সহিত সংযুক্তির আন্দোলনও কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করিয়া দেন। Growth of Centralisation বা কেন্দ্রমুখীনতা সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার আধুনিক বিবর্তনের একটি লক্ষণীয় বিষয়। বলা বাহুল্য যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বর্ধিত করার দিকে বিপুল জনমত রহিয়াছে।

(৬) সুইটজারল্যাণ্ডকে প্রাগ্রসর গণতন্ত্রের আবাসভূমি বলা যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রথা এখানে অঙ্কুরিত হইয়া সতেজ আকার ধারণ করিয়াছে। ব্রাইস তাহার Modern Democracies (Vol I, p 367) গ্রন্থে বলিতেছেন "Among the modern democracies which are true democracies, Switzerland has the highest claim to be studied. It is the oldest, for it contains communities in which Popular Government dates further back than it does anywhere else in the world and it has pushed democratic doctrines farther, and worked them out more consistently than any other European State." সত্যই সুইটজারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য শুধু পুরাতন নহে, রীতিমত বিস্ময়কর। এ্যাপেনজেল (Appenzel) ও আণ্টারওয়ালডেন (Unterwalden) নামক দুইটি ক্যাণ্টনই ঐতিহাসিক কারণে দুইটি অর্ধ-ক্যাণ্টনে বিভক্ত হইয়াছে। এই চারটি অর্ধ-ক্যাণ্টনে এবং গ্লেরাস (Glarus) নামক ক্যাণ্টনে পাঁচশত বৎসর হইতে শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমগ্র অধিবাসীগণের গণসম্মেলনের (Landsgemeinde) ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। অন্য সকল ক্যাণ্টনে আইন ও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে রেফারেন্ডাম ও ইনিসিয়েটিভ অর্থাৎ গণভোট ও গণউদ্যোগের প্রথা সক্রিয় ভাবে বিরাজ করিতেছে। ইহা ব্যতীত সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান পরিবর্তন করিতে হইলে যে সকল বিধি অনুযায়ী চলিতে হয়, তাহার মধ্যে একটি হইতেছে এই যে পরিবর্তনের প্রস্তাবটি সুইটজারল্যাণ্ডের অধিকাংশ নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা গৃহীত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। অর্থাৎ সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে Referendum অপরিহার্য।

৭। সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid)। কারণ সাধারণ আইন যেরূপ ভাবে বিধিবদ্ধ করা যায় সংবিধানের পরিবর্তন সেইরূপে করা যায় না। Federal Legislature বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী যদি সংবিধান পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব পাস করে, তবে তাহা গৃহীত হইবার পূর্বে তাহা শুধু যে গণভোটে দিতে হইবে তাহা নহে, অধিকাংশ ক্যাণ্টনের সমর্থনও প্রয়োজন। ক্যাণ্টনের ভোট গণনা কালে প্রতি পূর্ণ ক্যাণ্টনের অধিকাংশ নাগরিকের ভোট এক ভোট বলিয়া গণ্য করা হয়। অর্ধ-ক্যাণ্টনের অধিকাংশের গণভোট অর্ধ ভোট বলিয়া গণনা করা হয়। সুতরাং সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অপেক্ষাও দুষ্পরিবর্তনীয় বা Rigid।

৮। লিখিত সংবিধানে সাধারণতঃ নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার

সম্বন্ধে একটি অধ্যায় দেখা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে তাহা আছে। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধানে তাহা নাই। তথাপি সংবিধানের বিভিন্ন ধারার বলে গণতান্ত্রিক দেশে প্রচলিত অধিকারগুলি সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। ১৮৪৭ সালে সুইটজারল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল। এই কারণে ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করে কতকগুলি বিশেষ নীতি সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে।

৯। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর উচ্চতর ও নিম্নতন কক্ষ দুইটিকে আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বিধান-মণ্ডলীর দুইটি কক্ষকে এইরূপ সমানাধিকার দেওয়া হয় নাই। এই বিষয়ে সুইস সংবিধান একক ও অনন্য।

১০। সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রতি ক্যাণ্টন হইতে রাজ্যপরিষদ অর্থাৎ উচ্চতর পরিষদে দুইজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

এই জন্য রাজ্য পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ৪৪টি। বিভিন্ন ক্যাণ্টনে প্রতিনিধি নির্বাচনের নিয়ম বিভিন্ন এবং তাহাদের term of office বা প্রতি-নিধিদের কার্যকালও এক নহে। কারণ নির্বাচন বিধি ও প্রতিনিধিদের কার্যকাল ক্যাণ্টনীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১১। সংবিধান অনুসারে সুইটজারল্যাণ্ডে একটি Federal Tribunal অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় আছে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় ইহার ক্ষমতা নাই। সংবিধানবিরোধী হইলে সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ক্যাণ্টনের আইনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের উপর ইহার হস্তক্ষেপের ক্ষমতা অবর্তমান; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় বলিতে সুইটজারল্যাণ্ডে একটিমাত্র বিচার প্রতিষ্ঠান বুঝায়। ইহার অধীনস্থ ক্যাণ্টনে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের শাখা নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের শাখা প্রতিটি ষ্টেট বা রাজ্যে স্থাপিত রহিয়াছে।

১২। সুইটজারল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভাও একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সাতজন লইয়া গঠিত এই সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকে। যুক্তরাজ্যে বা ভারতবর্ষে যেমন প্রধান মন্ত্রী আছেন অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেমন রাষ্ট্রপতি রহিয়াছেন সুইটজারল্যাণ্ডে তেমন

কেহই নাই। শাসনক্ষমতা সাতজন লইয়া গঠিত সম্মিলিত মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত করা হয়। এই সাতজনের মধ্যে একজনকে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলী এক বৎসরের জন্য কনফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করে। নির্বাচিত সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর বা রাষ্ট্রপতির তুল্য নহে। সভার অন্যান্য মন্ত্রী অপেক্ষা তাহার ক্ষমতা বেশী নহে। এক বৎসরের কার্যকাল শেষ হইলে মন্ত্রিসভার অন্য এক ব্যক্তি সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সভাপতি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কতকগুলি মামুলি (formal) কার্য সম্পন্ন করেন ; যেমন বিদেশীয় রাষ্ট্রদূতদের সরকারীভাবে স্বীকার ও সম্বর্ধনা করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সুইটজারল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা একটি Collegial Executive বা সম্মিলিত মন্ত্রিসভার দৃষ্টান্ত। মন্ত্রিসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করেন না।

১৩। সুইটজারল্যাণ্ডের বর্তমান সংবিধান উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৭৪ সালে বিধিবদ্ধ হয়। এই সময়ে ইউরোপের সর্বত্র উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক মতবাদ বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সংবিধান প্রণেতৃগণ এই Liberalism বা উদারনৈতিক মতবাদ মানিয়া লইয়া, সেগুলিকে সংবিধানে স্থান দিয়াছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা রক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য, ধর্মমত সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র প্রভৃতি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ১৮৭৪ সালের সংবিধান গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন পদ্ধতি সংবিধানের উপর রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের প্রভাবের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৪। উদারনৈতিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াও সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধান প্রণেতৃগণ ১৮৭৪ সালের শাসন পদ্ধতির মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যবস্থাকে স্থান দিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা সুইস্ রাষ্ট্র প্রগতিশীল নীতি অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয়করণ নীতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, নানা শ্রমিক সহায়ক আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সমাজ কল্যাণকল্পে শিল্প প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। অর্থাৎ গোঁড়া উদারতান্ত্রিক মতবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সত্য কিন্তু সমগ্র সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি

(Nature of the Swiss Federation)

১৮৭৪ সালের সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে সুইটজারল্যাণ্ডকে কন্‌ফেডারেশন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ সুইটজারল্যাণ্ড একটি যুক্তরাষ্ট্র। কন্‌ফেডারেশন্‌ রাষ্ট্রসমষ্টি মাত্র; কন্‌ফেডারেশনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে; এই ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি মিলিয়া বৃহত্তর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয় না। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধানের বলে সত্য সত্য একটি সার্বভৌম federal বা যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সংবিধানের মুখবন্ধে কিন্তু এই কথাটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে "The Swiss Confederation, resolved to consolidate the alliance of the Confederated members and to maintain and increase the unity, strength and honour of the Swiss nation, has adopted the following Federal Constitution।" ১৭৮৯ সালে যেমন উত্তর আমেরিকার ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র আপনাপন সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়া জাতীয় একতা স্থাপন মানসে সার্বভৌম যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি সুইটজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টন গুলিও ১৮৭৪ সালে পূর্ণ স্বাধিকার ক্ষুণ্ন করিয়া একটি কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনে প্রয়াসী হয়।

শাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal), রাষ্ট্র-সমষ্টিমূলক (Confederation) নহে।

সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে: "The object of the Confederation is to ensure the independence of the country against the foreigners, to maintain peace and order within its borders, to protect the liberties and rights of its members, and to promote thei common prosperity." এই অনুচ্ছেদে যে উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে তাহা লাভ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে বহির্নীতি, যুদ্ধ ও শান্তি, সন্ধি ও চুক্তি, যানবাহন,

যুক্তরাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট ক্যাণ্টনের মধ্যে ক্ষমতা বিভাগ

ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রা, ওজন নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, শুল্ক উচ্চ-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেমন কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে অবশিষ্ট সকল ক্ষমতাই সংযুক্তীকৃত (Constituent) রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করা হইল, তেমনি সুইটজারল্যাণ্ডেও কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অর্পিত ক্ষমতাগুলি বর্ণনা করা হইযাছে এবং সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে অবশিষ্ট ক্ষমতা ক্যাণ্টন সমূহ ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ উভয় রাষ্ট্রে Residuary Powers (অবশিষ্ট ক্ষমতা) সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা ক্যাণ্টন সমূহের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Powers) ক্যাণ্টনের হস্তে

সুইটজারল্যাণ্ডের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই দেশে ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক কারণে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে ব্যাঙ্ক, পেটেণ্ট, রেল, রেডিও, সামরিক শিক্ষা, চলাচল ব্যবস্থা, অস্ত্র শস্ত্রের কারবার, আবগারী, কৃষি, শিল্প, বিদেশী পর্যটক, বেকারী, জীবনবীমা, আমদানী-রপ্তানী, বহিঃ-শুল্ক, করস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছেন। রেল ও রেডিও জাতীয় শিল্পে পরিণত করা হইয়াছে। সুইটজারল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে—ইহাই শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র-মুখীনতার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

কেন্দ্রমুখীনতা

দুইটি মহাযুদ্ধ, ১৯৩০ সালের পৃথিবীব্যাপী অর্থসংকট, শিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন ক্যাণ্টনের অর্থনৈতিক স্বার্থের অঙ্গাঙ্গী যোগ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণের প্রধান কারণ। অনেকে এই ক্ষমতাবৃদ্ধিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে এমন সময় আসিতে পারে যখন ক্যাণ্টনগুলি কেন্দ্রীভূত Unitary রাষ্ট্রের জেলা-গুলির ন্যায় কেবল মাত্র শাসন-অঞ্চলে (administrative unit) পরিণত হইবে। কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার প্রসারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রও (bureaucracy) সংখ্যা-বহুল ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ইহাও ক্যাণ্টনীয় স্বাধীনতার অনুকূল নহে। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা ভিত্তিহীন। কারণ সংবিধান ক্যাণ্টন গুলির অধিকার সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইয়াছে, ইহার ব্যত্যয় হওয়া সম্ভব নহে।

কেন্দ্রমুখীনতার কারণ ও তাহার সপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ যে সকল দিকে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা ক্যাণ্টনসমূহের আপনাপন স্বার্থরক্ষার জন্য অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই সকল ক্ষমতা ব্যবহার না করিতেন তাহা হইলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি, সমাজ কল্যাণ ও দেশকে প্রগতিশীল নীতি অনুযায়ী পরিচালন অসম্ভব হইয়া উঠিত। বলা বাহুল্য সুইটজারল্যাণ্ডের জনমত বিপুলভাবে কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রসার সমর্থনই করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ ক্যাণ্টনস্থিত সরকারই কেন্দ্রীয় সরকারের আইন-কানুন কার্যে পরিণত করেন ও ক্যাণ্টনে কেন্দ্রের করণীয় সমস্ত কিছু সম্পন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং কেন্দ্র সহজে ক্যাণ্টন কর্তৃক অবাঞ্ছিত কোন নীতি সহজে কার্যকরী করিতে পারে না। চতুর্থতঃ, রাজ্যপরিষদে প্রতিটি ক্যাণ্টনের সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার আছে। এই সকল প্রতিনিধির মারফত প্রতিটি ক্যাণ্টন রাজ্যপরিষদে আপনাপন বক্তব্য পেশ করিতে পারে। যদি ক্যাণ্টনের কোন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কাড়িয়া লইতে সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে সক্রিয় প্রতিবাদের সুযোগ প্রতিটি ক্যাণ্টনেরই রহিয়াছে। পঞ্চমতঃ প্রতি ক্যাণ্টনের জনসাধারণ নিম্নতন বিধান-সভা অর্থাৎ National Council বা জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। তাহাদের মাধ্যমেও ক্যাণ্টনের ক্ষমতারক্ষার প্রচেষ্টা চলিতে পারে। ষষ্ঠতঃ সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধান পরিবর্তন করিতে হইলে অধিকাংশ ক্যাণ্টনের সম্মতি প্রয়োজন। এই রূপেই ক্যাণ্টনীয় ক্ষমতার বেদখলের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের সুযোগ রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধানের আধুনিক কেন্দ্রমুখীনতা কখনও ক্যাণ্টনগুলির স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য

অধ্যাপক আর্থার কীথ্ সুইটজারল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শাসন (Executive) ক্ষমতা প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; সুইটজারল্যাণ্ডে ঐ ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদকে দেওয়া হইয়াছে।

(২) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একটি বিশেষভাবে নির্বাচিত নির্বাচন-সংস্থা (Electoral College) কর্তৃক নির্বাচিত হন; সুইটজারল্যাণ্ডে শাসন-পরিষদটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী বা পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর পরিষদের ক্ষমতা সুইটজারল্যাণ্ডের অনুরূপ পরিষদ হইতে এই অর্থে বেশি যে প্রথমোক্ত রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী সন্ধি ও উচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ সেনেট বা উচ্চতর পরিষদের অনুমতি সাপেক্ষ।

(৪) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দলগত শাসনব্যবস্থা বর্তমান ; এই জন্য দলীয় অপ-ব্যবস্থা প্রভৃতি ঐ দেশে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ; সুইটজারল্যাণ্ডে তাহা প্রায় একেবারেই নাই।

(৫) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত-রাজ্যগুলি পররাষ্ট্রের সহিত কোন প্রকার সন্ধি বা চুক্তি করিতে পারেন না। সুইটজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলির এই ক্ষেত্রে সামান্য ক্ষমতা রহিয়াছে।

(৬) সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধান অনুযায়ী ব্যাপকভাবে গণভোটের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সেরূপ কোন বিধি নাই।

(৭) সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধান, আমেরিকার সংবিধান অপেক্ষা অনেক সহজে পরিবর্তন করা যায়। দ্বিতীয়োক্ত সংবিধানটি প্রথমোক্ত সংবিধান অপেক্ষা অনেক বেশী দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid).

(৮) সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও জনসাধারণের দাবি অনুসারে গণভোটের জন্য নাগরিক জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে ; কিন্তু আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সম্বন্ধে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

(৯) সুইটজারল্যাণ্ডের Federal Tribunal অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিচারালয় রায় দান করিয়া সুইস যুক্ত-রাষ্ট্রীয় আইন বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না। কিন্তু আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের (সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত) এই ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্যাণ্টনীয় ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা

(Cantonal & Local Governments)

সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনপদ্ধতির ইতিহাসে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও ক্যাণ্টন-গত শাসনের মূল্য অপরিসীম। সংবিধানের বিবর্তনের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে প্রথমেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্থানীয় শাসনাঞ্চল ক্যাণ্টনে মিলিত হইয়াছে এবং সর্বশেষ স্তরে ক্যাণ্টনগুলি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংহত হইয়াছে। সুইটজারল্যাণ্ডের নাগরিকেরা অবশ্য জাতীয় একতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তথাপি তাহারা আপনাদিগকে সর্বপ্রথম ক্যাণ্টনের অধিবাসী বলিয়াই গণনা করে এবং আপনাপন ক্যাণ্টনের প্রতি তাহাদের মমতাবোধ সুদৃঢ়। ১৮৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর ক্যাণ্টনগুলির রাজনৈতিক মর্যাদা কিছুটা কমিয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি সংবিধানের ব্যবস্থানুযায়ী তাহাদের গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। যে সকল বিষয়ে সুইস্ যুক্ত-রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, সে সকল বিষয়ে ক্যাণ্টনগুলি 'সার্বভৌম' ক্ষমতার অধিকারী রহিয়া গিয়াছে। এই সূত্রে সংবিধানের তৃতীয় ধারাটি লক্ষণীয়ঃ "The Cantons are sovereign so far as their sovereignty is not limited by the Federal Constitution, and as such they exercise all rights which are not delegated to the Federal Power."

দ্বিতীয়তঃ ক্যাণ্টনগুলিই সুইটজারল্যাণ্ডের রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। র‍্যাপার্ড বলিয়াছেন যে এমন এক সময় ছিল যখন কেবল মাত্র ক্যাণ্টনের রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়াই দলগত রাজনীতি নির্ধারিত হইত। এখন পূর্বাবস্থা কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে, তথাপি এখনও দলগত নীতি নির্ধারণে ক্যাণ্টনীয় রাজনীতিতে সুইটজারল্যাণ্ডের নাগরিকগণের উৎসাহের অবধি নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি, শিল্পের উন্নতি, যানবাহন ও যোগাযোগের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে শাসনব্যবস্থা আজকাল অনেকটা কেন্দ্রমুখীন হইয়াছে বটে, তথাপি ক্যাণ্টনের রাজনীতির সহিত সুইটজারল্যাণ্ডের নাগরিকগণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই

সকল কারণে ক্যাণ্টন ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রথমেই আলোচনা করিবার সার্থকতা আছে।

ক। সুইটজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলির শাসনব্যবস্থা

সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রে বাইশটি ক্যাণ্টন আছে। ইহার মধ্যে তিনটি ক্যাণ্টনের প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার ভিত্তিতে দুইটি অর্ধ-ক্যাণ্টনে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯টি পূর্ণ ক্যাণ্টন ও ৬টি অর্ধক্যাণ্টন লইয়া সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। প্রতি ক্যাণ্টন হইতে রাজ্য পরিষদে দুইজন এবং প্রতি অর্ধ-ক্যাণ্টন হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি রাজ্যপরিষদে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয়তঃ সংবিধান পরিবর্তনের সময় যখন ক্যাণ্টনগুলির ভোট গণনা করা হয় তখন প্রতি ক্যাণ্টনকে এক ভোটের এবং প্রতি অর্ধ-ক্যাণ্টনকে অর্ধ ভোটের অধিকারী বলিয়া ধরা হয়। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে অর্ধ-ক্যাণ্টনগুলি অন্যান্য সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্যাণ্টনগুলিরই মত ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং যদি বলা হয় যে সুইটজারল্যাণ্ডে দুই প্রকারের পঁচিশটি ক্যাণ্টন আছে তাহা হইলেও ভুল হয় না। প্রতিটি পূর্ণ ও অর্ধ-ক্যাণ্টনের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা, ঐতিহ্য এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আয়তন ও জনসংখ্যায় বিভিন্ন ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু ক্ষমতার ক্ষেত্রে সকল পূর্ণ ক্যাণ্টনের একই সাংবিধানিক মর্যাদা; তেমনি সকল অর্ধ-ক্যাণ্টনেরও একই প্রকারের অধিকার।

সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধানের তৃতীয় ধারা অনুসারে Residuary Powers বা অবশিষ্ট ক্ষমতা ক্যাণ্টনগুলির নিকটই ন্যস্ত হইয়াছে। তৃতীয় ধারায় বলা হইয়াছে, যে সকল ক্ষমতা সংবিধান অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষমতা সম্বন্ধে ক্যাণ্টনগুলিই সর্বময় ক্ষমতা ব্যবহার করিবার অধিকারী থাকিবে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সহিত সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের ৬ ধারা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ক্যাণ্টন ও অর্ধ-ক্যাণ্টনগুলির সংবিধান কয়েকটি সর্তাধীনে মানিয়া লইবার নির্দেশ দিয়াছে। এই সর্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) প্রথমতঃ ক্যাণ্টনীয় সংবিধানে এমন কোন বিধান থাকিতে পারিবে না যাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পরিপন্থী; (২) দ্বিতীয়তঃ প্রতি ক্যাণ্টনের শাসনব্যবস্থা প্রজাতান্ত্রিক হইতে হইবে; (৩) তৃতীয়তঃ ক্যাণ্টনীয় সংবিধান জনগণ কর্তৃক গৃহীত হওয়া চাই; এবং যখন ক্যাণ্টনের অধিকাংশ

অধিবাসী সংবিধানের পরিবর্তন কামনা করেন, তখন তাহা পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কয়েকটি ধরা বাঁধা নিয়ম ব্যতীত শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ক্যাণ্টনগুলির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে ক্যাণ্টনীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মিল খুবই বেশি। দ্বন্দ্বের কোন সম্ভাবনা নাই।

শাসন ব্যবস্থানুযায়ী ক্যাণ্টনের শ্রেণী-বিভাগ : প্রথমতঃ সুইটজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইতে পারে। ২২টি ক্যাণ্টনের মধ্যে তিনটি ক্যাণ্টন দুইটি করিয়া ৬টি অর্ধ-ক্যাণ্টনে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯টি ক্যাণ্টন ও ৬টি অর্ধ-ক্যাণ্টন। প্রতিটি ক্যাণ্টন ও অর্ধ-ক্যাণ্টনের নিজস্ব সংবিধান রহিয়াছে। এই বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ক্যাণ্টনের দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ বিশেষ অর্থপূর্ণ। কতকগুলি ক্যাণ্টনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বিদ্যমান, কতকগুলিতে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র প্রচলিত।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ক্যাণ্টনের শাসন ব্যবস্থা : ল্যাণ্ডস্‌গেমেইন্‌ডে (প্রত্যক্ষ নাগরিক সভা) : গ্লেরাস্ নামক ক্যাণ্টনে এবং নিম্নলিখিত অর্ধ-ক্যাণ্টনে যথা অবওয়ালডেন্, নিড্‌ওয়ালডেন, ভিতর এ্যাপেন্‌জেল (Appenzel Interior) ও বাহির এ্যাপেনজেল-এ (Appenzel Exterior) বার্ষিক খোলা ময়দানের সমস্ত বয়স্ক পুরুষ নাগরিকগণের সভায় শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত আবশ্যকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং শাসকবর্গ মনোনীত হন। এই প্রত্যক্ষ নাগরিকসভা প্রাচীন গ্রীসের গণসভার (Ecclesia) সহিত তুলনীয়। উপরোক্ত পাঁচটি ক্যাণ্টন ও অর্ধ-ক্যাণ্টনে প্রায় পাঁচ শত বৎসর হইতে এইরূপ সভা হইয়া আসিতেছে। এই সভা আইন প্রণয়ন ও শাসকগণকে নির্বাচিত করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ এই সভা এপ্রিল-মে মাসে কোন একটি রবিবারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গুরুগম্ভীর পরিবেশে প্রার্থনা দ্বারা সাধারণতঃ সভার কাজ শুরু হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই সাধারণ সভায় যদিও গুরুতর রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে তথাপি ইহার পরিচালনায় একটি সুষ্ঠু নিয়মানুবর্তিতা ও শালীনতা দেখা যায়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সুইটজারল্যাণ্ডে গণতন্ত্র ও নাগরিকগণের দায়িত্ববোধ কত উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে।

প্রত্যক্ষ নাগরিক সভার সদস্যবৃন্দ হাত তুলিয়া আপনাপন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। এইরূপে তাহারা লাণ্ডামান বা ক্যাণ্টনপ্রধান বিচারপতি, সাতজন সদস্য বিশিষ্ট শাসনপরিষদ (Executive Council) যুক্ত-রাষ্ট্রীয় উচ্চ আইন পরিষদে বা রাজ্যসভায় ক্যাণ্টনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। লাণ্ডামান প্রত্যক্ষ জন-

সভায় ও শাসন পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ইহা ব্যতীত আরও একটি প্রতিষ্ঠান আছে যাহার উল্লেখ প্রয়োজন। তাহা হইল ল্যাণ্ডরাট (Landrat) বা ক্যাণ্টনীয় পরিষদ; এই পরিষদটি প্রতিনিধিমূলক, গণভোট দ্বারা নির্বাচিত। হিসাব পরীক্ষা, নিম্নতম কর্মচারি-নিয়োগ, অন্তর্বর্তীকালীন আইন প্রণয়ন এবং নাগরিক সভা কর্তৃক গৃহীত মূল আইনের খুঁটি-নাটি বিষয়ে ব্যবস্থা, সরকারী ব্যয়ের জন্য ছোট-ছোট অর্থ-ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষমতা ক্যাণ্টনীয় পরিষদকে দেওয়া হইয়াছে।

প্রতিনিধিমূলক ক্যাণ্টনের (Representative Cantons) শাসন ব্যবস্থা: অন্য সকল ক্যাণ্টনেই প্রতিনিধিমূলক প্রজাতন্ত্র বর্তমান। এই ক্যাণ্টন-গুলির শাসনব্যবস্থাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অন্য গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি হইতে বিভিন্ন। শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে প্রাগ্রসর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট। নাগরিকগণের সংখ্যার সহিত প্রতিনিধি সংখ্যার অনুপাত, আইন পরিষদের আয়ুষ্কাল, গণভোটের ব্যাপক ব্যবস্থা সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনবিধিকে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে।

প্রতিনিধিমূলক ক্যাণ্টনের আইন ব্যবস্থা: সুইটজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিমূলক ক্যাণ্টনগুলির আইন সভা বৃহৎ পরিষদ (Great Council) অথবা ক্যাণ্টনীয় পরিষদ (Cantonal Council) বলিয়া পরিচিত। এই পরিষদগুলি যে সকল ক্ষমতার অধিকারী তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগের উপর তদারক; আয়-ব্যয়, ঋণ ও কর স্থাপন; জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও ক্যাণ্টনীয় সৈন্যদলকে জরুরী অবস্থায় কর্তব্যে আহ্বান; শাস্তি মকুব, এক ক্যাণ্টনের সহিত অন্য ক্যাণ্টনের চুক্তি, নাগরিকত্ব প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত অধিকাংশ ক্যাণ্টনে উচ্চতর বিচারকগণ এবং যে সকল সরকারী কর্মচারিগণ শিক্ষা, ব্যাঙ্ক ও গীর্জা সম্বন্ধীয় কাজে লিপ্ত আছেন, তাহারা সকলেই আইন পরিষদ দ্বারাই নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

সকল ক্যাণ্টনীয় পরিষদ বা আইন সভা এক কক্ষ বিশিষ্ট। অধিকাংশ পরিষদের আয়ুষ্কাল ৪ বৎসর। অবশিষ্ট ক্যাণ্টনের ১ হইতে ৬ বৎসরের আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন ক্যাণ্টনীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আবার কোন কোন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ক্যাণ্টনের লোক সংখ্যার সহিত আনুপাতিক হারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও ২৫০ জন নাগরিক পিছু ১ জন সদস্য কোথাও বা ৪০০০ নাগরিক পিছু পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অন্য দেশীয় প্রতিনিধি মণ্ডলীর সহিত আনুপাতিক তুলনায় সুইট-

জারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশী। ইহার দ্বারা জনসাধারণের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে এবং গণতন্ত্র প্রাগ্রসরতা লাভ করিয়াছে। ক্যাণ্টনীয় পরিষদের সদস্যগণ কোন মাহিয়ানা পান না, তবে একটা দৈনিক ভাতা পাইয়া থাকেন।

সুইটজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিমূলক ক্যাণ্টনে গণভোট ও গণ-উদ্যোগ (Referendum ও Initiative)*: সুইটজারল্যাণ্ডের প্রতিটি প্রতিনিধিমূলক ক্যাণ্টনে নিম্নলিখিতরূপ গণভোট ও গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে :—

প্রথমতঃ ক্যাণ্টনীয় সংবিধান পরিবর্তন করিতে হইলে গণভোট পরিবর্তনের বিষয়বস্তু গণভোটে দিতেই হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের ৬ ধারাতে এই গণভোট নীতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। (১)

দ্বিতীয়তঃ নাগরিকগণের অধিকাংশ যদি সংবিধানের পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে ঐরূপ পরিবর্তন করা অপরিহার্য। ক্যাণ্টনীয় সংবিধান গুলির এই নিয়মটি গণ-উদ্যোগের উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের ৬ ধারা অনুসারে এই গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা প্রতি ক্যাণ্টনের পক্ষে বাধ্যতামূলক (২)।

তৃতীয়তঃ সংবিধানগত গণভোট ব্যতীত প্রতিনিধিমূলক ক্যাণ্টনগুলিতে আইনবিষয়ক গণভোটেরও ব্যাপক প্রচলন আছে। (ক) কোন কোন ক্যাণ্টনে বাজেট সংক্রান্ত গণভোট, (খ) কোন কোন ক্যাণ্টনে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ের অতিরিক্ত খরচ সম্বন্ধীয় গণভোট প্রথা বর্তমান!

চতুর্থতঃ সাধারণ আইন বিষয়েও গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা বর্তমান।

* গণভোট ও গণ-উদ্যোগ তত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকারদ্বয় কর্তৃক প্রণীত "আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের" দ্বিতীয় খণ্ডের ৪১-৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১) ও (২) সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের ৬ ধারাটি এইরূপ :—

Article 6 :—The Cantons are required to demand from the confederation its guarantee of their constitutions.

This guarantee must be accorded provided :

(a) That the constitutions contain nothing contrary to the provisions of the Federal Constitution ;

(b) That they ensure the exercise of political rights according to republican forms—representative or democartic ;

(c) That they have been accepted by the people and can be revised when an absolute majority of citizens so demand.

গণভোট ও গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা থাকায় নাগরিকগণ ক্যাণ্টনের গণতন্ত্রের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। নানা বিষয়ে তাহাদের ভোট দিতে হয়, এই সক্রিয় গণ-সংযোগ ক্যাণ্টনীয় গণতন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাইস্ তাহার Modern Democracies গ্রন্থে তাই বলিতেছেন "Switzerland contains a greater variety of institutions based on democratic principles than any other country." এই বিষয়ে আমেরিকান লেখক মান্‌রো (Munro) বলিতেছেন : "The advantages of direct legislation in Switzerland far outweigh its defects." কিন্তু এই মত সকলে গ্রহণ করেন নাই। ওয়েলটি (Welti) গণ-ভোটের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন "Imagine a cowherd or stable boy with the commercial code in his hand going to vote for or against it." *

প্রতিনিধিমূলক ক্যাণ্টনের শাসন বিভাগঃ সুইটজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধি-মূলক ক্যাণ্টনের সর্বোচ্চ শাসকমণ্ডলী যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের ন্যায় ক্যাণ্টনীয় আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। এই শাসক-মণ্ডলী সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মাবলীও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ সম্বন্ধীয় আইন-কানুনের ন্যায়। ক্যাণ্টনীয় শাসনপরিষদের সদস্য সংখ্যা কোথাও পাঁচ, কোথাও সাত কোন কোন ক্যাণ্টনে ৯ এবং কোথাও বা ১১। শাসনপরিষদটি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে দলীয় চক্রান্ত দলগত ক্ষমতালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্যাণ্টনগুলির শাসনব্যবস্থাকে কলুষিত করিতে পারে না। অধিকাংশ ক্যাণ্টনেই শাসনপরিষদীয় সদস্যগণ ৪ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কোন কোন ক্যাণ্টনে ভিন্ন নিয়মও আছে। কিন্তু কোথাও ১ বৎসরের কম নহে, বা পাঁচ বৎসরের বেশী নহে। এই শাসনপরিষদটি Collegial Executive বা সম্মিলিত শাসন-মণ্ডলী হিসাবে কাজ করে, দলগত ভাবে নহে। এই জন্য ইহার দলগত রাজনৈতিক সত্তা নাই বলিলেই চলে, যদিও পরিষদটি দলীয় প্রতিনিধি দ্বারাই গঠিত।

শাসন পরিষদের একজন প্রধান বা নেতা নির্বাচিত হন। ইনি Landamann বলিয়া পরিচিত। Landamann ক্যাণ্টন ভেদে তিন প্রকার পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। কোন কোন ক্যাণ্টনে আইন সভা, কোন কোন ক্যাণ্টনে শাসন পরিষদ

* এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য গ্রন্থকারদ্বয় প্রণীত 'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে'র ৪১-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্বয়ং আবার কোথাও বা গণ ভোটের দ্বারা Landamann নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

ল্যাণ্ডামান বা শাসন পরিষদের পুরোধা কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন। ক্ষমতার ক্ষেত্রে তিনি শাসন পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সমপর্যায়ভুক্ত। পুরোধাগণ সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং এক বৎসর অতীত হইলে সাধারণতঃ তিনি পুনর্নির্বাচিত হন না। কিন্তু শাসনপরিষদের সদস্যগণ সাধারণতঃ পুনঃ পুনঃ নির্বাচিত হইতে থাকেন। কারণ সুইটজারল্যাণ্ডের নাগরিকগণ মনে করেন যে যাহারা দক্ষতা ও সততার সাহিত কাজ করিতেছেন ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকিলে এবং তাহারা পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদের পুনর্নির্বাচিত করা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। পরিষদের এক একজন সদস্য এক একটি বিভাগের কর্তা হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন। তাহারা সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার জন্য ক্যাণ্টনীয় আইন সভার নিকট দায়ী। আইন সভার নির্দেশ অনুযায়ী তাহাদের শাসন পরিচালনা করিতে হইবে। যদি আইনপরিষদ তাহাদের নীতি অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাহারা পদত্যাগ করেন না। অর্থাৎ ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থানুযায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী যেমন আইনসভার আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করে, সুইটজারল্যাণ্ডে তেমন ব্যবস্থা নাই। ক্যাণ্টনীয় শাসনমণ্ডলী আইনসভার মতানুযায়ী পরিষদীয় নীতি পরিবর্তন করেন। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে শাসন পরিষদীয় সদস্যগণ শাসন পরিচালনা বিষয়ে এত অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার সুযোগ পান যে ক্যাণ্টনীয় আইনসভার উপর তাহারা সাধারণতঃ উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। এই জন্য ক্যাণ্টনীয় আইন সভার নেতৃত্ব শাসন পরিষদের উপরই কার্যতঃ বর্তায়।

ক্যাণ্টনীয় বিচার বিভাগ : ক্যাণ্টনগুলিতে বিচার বিভাগের তিনটি স্তর দেখা যায়। সর্বনিম্ন আদালত আমাদের দেশের পঞ্চায়েতী বিচার বিভাগের সহিত তুলনীয়। ইহারা হইতেছেন Justices of the Peace বা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় উপযোগী ভারপ্রাপ্ত বিচারকগণ। ইহার উপরের স্তরে রহিয়াছে Courts of First Instance অথবা জেলা বিচারালয় (District Courts)। এই ধর্মাধিকরণটি আমাদের জেলা আদালতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সর্বোচ্চ স্তরে রহিয়াছে High Court বা ক্যাণ্টনীয় সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালতের আপীল শুনিবার অধিকার রহিয়াছে।

সর্বস্তরের বিচারকেরাই হয় জনসাধারণ অথবা ক্যাণ্টনীয় আইন পরিষদের দ্বারা নির্বাচিত হন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন কোন রাজ্যে বিচারপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই প্রথা হইতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বিচার বিভাগে নানা ধরনের দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে সুইটজারল্যাণ্ডে নির্বাচন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিচার বিভাগীয় কোন দুর্নীতি ধর্মাধিকরণের পবিত্রতা কলুষিত করে নাই। এই দিক হইতেও সুইটজারল্যাণ্ডের গণতন্ত্র প্রশংসার্হ।

অনেক ক্যাণ্টনেই বিচারকগণের সহিত বিচারকালে Assessor বা কয়েকজন নাগরিক দ্বারা গঠিত উপদেষ্টা মণ্ডলী সংযুক্ত থাকেন। ক্যাণ্টনে সালিশী ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, ইহাতে অল্প ব্যয়ে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হয়। কোন কোন ক্যাণ্টনে বিচারাদালতে মামলা-মোকদ্দমাকারীগণের কোন ব্যয়ই নাই। বিনামূল্যে বিচার ব্যবস্থা করা হয়। আইন ও শাসন ব্যবস্থায় সুইটজারল্যাণ্ডের যেমন বিশেষত্ব আছে, ঠিক তেমনি ঐ দেশের বিচার ব্যবস্থাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুইটজারল্যাণ্ডের প্রাগ্রসর প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে যে বিচার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতেও উচ্চস্তরের গণতান্ত্রিক নীতি প্রতিফলিত হইয়াছে। ব্রাইস সুইটজারল্যাণ্ডের স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে এই সকল সংস্থা নাগরিকতা-শিক্ষার প্রশস্ততম কেন্দ্র।

খ। সুইটজারল্যাণ্ডের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

স্থানীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দুই স্তরের প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। নিম্নস্তরে রহিয়াছে কমিউন। কতকগুলি কমিউন লইয়া District বা জেলা গঠিত হইয়াছে। আবার জেলাগুলি লইয়াই ক্যাণ্টন এবং বিভিন্ন ক্যাণ্টন মিলিয়া সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। স্বায়ত্তশাসন সংস্থা বলিতে কেবলমাত্র কমিউন্ ও জেলাগুলিকেই বুঝায়।

কমিউন : সমগ্র সুইটজারল্যাণ্ডে ৩১১৮টি কমিউন আছে। বিভিন্ন কমিউন-গুলির আয়তন ও লোক সংখ্যায় অনেক পার্থক্য আছে। কমিউনগুলির গঠন পরিচালন ব্যবস্থা ও কর্মের প্রসার ক্যাণ্টনীয় সংবিধান ও ক্যাণ্টন কর্তৃক স্থানীয় শাসন সম্বন্ধে প্রণীত আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। রাস্তা, আলোকব্যবস্থা জল সরবরাহ পুলিশ, জন-স্বাস্থ্য, দরিদ্র-সেবা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থা করা কমিউনগুলির কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

সুইটজারল্যাণ্ডে ক্যাণ্টন ভেদে দুই প্রকারের শাসন ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। (১) এক রকমের ব্যবস্থানুসারে জনসাধারণ একটি কমিউন পরিষদ নির্বাচিত

করেন। কমিউনের পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ নীতি নির্ধারণ এই কমিউন পরিষদের কর্তব্য। কয়েকটি কমিউনের নিয়মানুযায়ী, কমিউন পরিষদের সিদ্ধান্ত গণ-ভোট দিয়া যাচাই করিয়া লওয়া হয়। ইহা ব্যতীত একটি ছোট শাসন পরিষদও নির্বাচিত হয়। দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন, আইন ও নীতি কার্যে পরিণত করা এই শাসন পরিষদের কর্তব্য। এই শাসন পরিষদের নির্বাচিত প্রধান হইতেছেন মেয়র। সাধারণভাবে বলা যায় যে ফরাসীভাষী কমিউন সমূহে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। (২) অন্য প্রকারের কমিউন শাসন ব্যবস্থানুযায়ী নির্ধারণ ও প্রধান প্রধান কর্মচারী নিয়োগ সর্বসাধারণের সভায় স্থিরীকৃত হয়। দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য সর্বসাধারণের সভা একটি মাত্র পরিষদ নির্বাচিত করে।

জেলা শাসন ব্যবস্থা : কতকগুলি কমিউন লইয়া জেলা গঠিত হয়। জেলার শাসনকর্তা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কোন কোন জেলায় জেলা শাসনকর্তাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি জেলা পরিষদও জনগণ নির্বাচিত করেন। জেলা শাসনকর্তা ক্যাণ্টন সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে একদিকে ক্যাণ্টন সরকার আবার অন্যদিকে ক্যাণ্টনের অন্তর্গত কমিউন সমূহের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন। বিভিন্ন কমিউনের কার্যাবলীর সামঞ্জস্য সাধনও জেলা শাসনকর্তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

নাগরিকত্ব ও কমিউন : কোন সুইস অধিবাসীকে ক্যাণ্টনের বা সুইটজার-ল্যাণ্ডের নাগরিক হইতে হইলে সর্ব প্রথম কমিউনের নাগরিক হইতে হইবে। নতুবা ক্যাণ্টনের বা সুইটজারল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ প্রতি কমিউনকে, সেই কমিউনের মূল নাগরিক ও তাহার পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিতে হয়। তৃতীয়তঃ কমিউনের মূল নাগরিকগণের প্রতি এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য প্রতি কমিউনে একটি পৃথক ব্যয়ভাণ্ডার রক্ষিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কমিউনের মূল নাগরিক ও কমিউনের অধিবাসীদের (Resident) মধ্যে একটা তফাৎ রহিয়াছে চতুর্থতঃ অনেক কমিউনে স্থানীয় শাসন পরিষদের পক্ষ হইতে জনকল্যাণমূলক সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কিছু কিছু কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। এই কর্মপদ্ধতি আজকাল সুইটজারল্যাণ্ডের গণতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ (Federal Executive)

সুইটজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসন প্রতিষ্ঠান ফেডারাল কাউন্সিল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ নামে পরিচিত। এই পরিষদের সাতজন সদস্য প্রতি সাধারণ নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর দুই পক্ষের অর্থাৎ জাতীয় পরিষদ ও রাজ্যপরিষদের যুক্ত অধিবেশনে চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে বিধানমণ্ডলীর আয়ুষ্কাল চার বৎসর। এই সাতজনের মধ্যে একজন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে এবং অন্য একজন উপরাষ্ট্রপতি রূপে এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। শাসন পরিষদের কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে বা কোন কারণে তিনি পদত্যাগ করিলে তাহার স্থলে বিধানমণ্ডলী কর্তৃক পুনর্নির্বাচন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্য হইতে শাসন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শাসন পরিষদে নির্বাচিত হইবার পর তাহাদিগকে বিধানমণ্ডলীর সদস্যপদে ইস্তফা দিতে হয়। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর সহিত সংশ্রবহীন ব্যক্তিও শাসন পরিষদে নির্বাচিত হইতে পারেন; কিন্তু তাহা প্রায় কখনই হয় না।

সংবিধানের ৯৬ ধারাতে নিম্নলিখিত বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে: "......Not more than one person from each canton may be chosen for the Federal Council." এই বিধানানুযায়ী এক ব্যক্তির বেশি একটি ক্যাণ্টন হইতে নিযুক্ত হইতে পারে না। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে কয়েকটি প্রধান ক্যাণ্টন হইতে একজন করিয়া শাসন পরিষদের সদস্য নির্বাচনের নীতি চিরাচরিত প্রথায় পরিণত হইয়াছে। এই প্রথানুযায়ী বার্ণ, জুরিখ ও ফাউড (Vaud) নামক ক্যাণ্টন তিনটি হইতে একজন করিয়া সদস্য থাকিবেই। কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আরও একটি প্রথা মানিয়া চলা হয়। সুইটজারল্যাণ্ডে প্রধানতঃ তিনটি ভাষাভাষী নাগরিক রহিয়াছেন—জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদে ৪ জন জার্মান, দুইজন ফরাসী ও একজন ইতালীয় ভাষাভাষী সদস্য বা মন্ত্রী থাকিবেন এই নিয়মটিও প্রথাগত হইয়া গিয়াছে। জাতীয় একতা ও সংহতি রক্ষার পক্ষে এই দুইটি প্রথাগত ব্যবস্থা যথেষ্ট সুফল দিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের প্রকৃতি (Nature of the Federal Council) সুইটজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদটিকে Collegial Executive বা সম্মিলিত শাসন সংস্থা বলা হইয়া থাকে। যুক্ত রাজ্য ও ফ্রান্সে মন্ত্রিবর্গ কেবলমাত্র দলীয় প্রতিনিধি হিসাবেই মন্ত্রিসভায় আসন পাইয়া থাকেন। সুইটজারল্যাণ্ডে তেমন নহে। সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনপরিষদ সম্বন্ধে ব্রাইস বলিতেছেন যে ইহাদের ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক দলের সহিত একেবারে সম্পর্ক নাই তাহা নহে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ইহারা দলের বাহিরে এবং দলীয় নীতি কার্যে পরিণত করিবার জন্য ইহারা নির্বাচিত হন না (১)। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী যে কার্যের ভার ইহাদের উপর অর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এইজন্য ডাইসি সুইস্ মন্ত্রিপরিষদকে জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ডের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা, সততা রাজনৈতিক বুদ্ধি কার্যকুশলতা, ধীরতা ও বিচক্ষণতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী বলিয়াই শাসন পরিষদের ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হন। দলীয় সম্পর্ক এই নির্বাচনে অবান্তর বলিয়াই মনে করা হয়।

যুক্তরাজ্য (United Kingdom) ও ফ্রান্সে মন্ত্রিমণ্ডলী পার্লামেন্টের নেতৃত্ব করেন, শাসন-নীতি গঠন করিবার ভার তাহাদের উপরই ন্যস্ত। সুইট-জারল্যাণ্ডের মন্ত্রিমণ্ডলী অর্থাৎ শাসন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর আজ্ঞা-বাহী মাত্র। দলগত রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকিয়া শাসনপরিষদ সুইটজারলাণ্ডের পার্লামেন্টের নীতি অনুযায়ী সরকারী কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। শাসন পরিষদীয় সদস্যগণ বিভিন্ন দলভুক্ত ও বিভিন্ন ক্যাণ্টনের অধিবাসী। কিন্তু পরিষদের সভ্য হিসাবে তাহারা দলগত বা ক্যাণ্টনগত সভ্যগণ রাজনীতি পরিহার করিয়া জাতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীর আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। তাহাদের নিরপেক্ষতার উপর শাসনব্যবস্থার সাফল্য সম্পূর্ণ পরিমাণে নির্ভর করে। সুখের বিষয় এই যে এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায় যে সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

এই কারণে সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদ পুনঃ পুনঃ নির্বাচিত হইয়া প্রায় স্থায়ী পরিষদে পরিণত হইয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত তাহারা স্বাস্থ্যের অধিকারী ও কাজ করিতে ইচ্ছুক থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাহারা পরিষদে পুনর্নির্বাচিত হন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে যদিও পরিষদের আয়ুষ্কাল ৪ বৎসর মাত্র, তথাপি পরিষদের সদস্যগণ পুনঃ পুনঃ নির্বাচিত হইয়া গড়ে অন্ততঃ দশ বৎসর

মন্ত্রীত্ব পদে বহাল থাকেন। কেহ কেহ আপন যোগ্যতার দরুন ১৫, ২০ এমন কি ৩০ বৎসর পর্যন্ত একাদিক্রমে পরিষদীয় সদস্যপদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

দুইটি কারণে সুইটজারল্যাণ্ডের মন্ত্রিপরিষদ বা শাসন পরিষদের সদস্যগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদের আসনে পুনঃ পুনঃ নির্বাচিত হন। প্রথমতঃ সুইটজারল্যাণ্ডের অধিবাসীগণ মনে করে যে সকল মন্ত্রী নিরপেক্ষতা, সততা ও কর্মদক্ষতা দ্বারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের পুনর্নিয়োগ করিলে দেশের মঙ্গলই হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে সকল ব্যক্তিবর্গ হইতে মন্ত্রী বা পরিষদীয় সদস্য বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহাদের সংখ্যা সংবিধানগত ও প্রথাগত নিয়মানুসারে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রথমতঃ একটি ক্যাণ্টন হইতে একাধিক মন্ত্রী নিয়োগ সংবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ প্রথানুযায়ী ৪ জন জার্মান, তিনজন ফরাসী ও ১ জন ইতালীর ভাষাভাষী ব্যক্তি লইয়া পরিষদ গঠিত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ বার্ণ, জুরিখ ও ফাউড (Vaud) হইতে একজন করিয়া মন্ত্রী থাকিতে হইবে। চতুর্থতঃ যদিও নির্বাচনের পর শাসন পরিষদের মন্ত্রিবর্গ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান-মণ্ডলীর সদস্যপদে ইস্তফা দিতে বাধ্য তথাপি সাধারণ প্রথানুযায়ী কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীর সভ্যশ্রেণী হইতেই শাসন বা মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচন করা হইয়া থাকে। এই সকল নিয়ম পালন করিতে হইলে যে সকল ব্যক্তির মধ্য হইতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নিযুক্ত করিতে হয় তাহার সংখ্যা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। এই কারণে সততা, কর্মকুশলতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত মন্ত্রিগণ সহজেই পুনর্নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

সুইটজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি ঃ সংবিধানের ৯৮ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নিয়োগ ব্যবস্থা নির্ধারিত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী বা জাতীয় পরিষদ কর্তৃক এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। ঐ ধারা অনুযায়ী এক বৎসর পর বিদায়ী রাষ্ট্রপতি পুনরায় রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন না। তেমনি উপ-রাষ্ট্রপতি দুই বৎসর একাদিক্রমে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হইতে পারেন না। এক বৎসর উপ-রাষ্ট্রপতি রূপে কাজ করিবার পর তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োজিত হইতে পারেন। প্রথানুযায়ী এইরূপই হইয়া থাকে। এক বৎসরের ফাঁক দিয়া প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পুনরায় যথাক্রমে ঐ পদদ্বয়ে নিযুক্ত হইতে বাধা নাই। কিন্তু প্রথানুসারে এই দুইটি পদে Seniority (কর্মকাল) অনুযায়ী পরিষদের বিভিন্ন সদস্যদের নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

রাষ্ট্রপতি শাসন পরিষদ বা মন্ত্রিপরিষদে সভাপতিত্ব করেন। যুক্তরাজ্য বা

ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় মন্ত্রিপরিষদে তাহার কোন বিশেষ মর্যাদা নাই। তিনি অন্যান্য পরিষদীয় মন্ত্রী বা সদস্যগণের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তিনি শাসনপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিদেশীয় রাষ্ট্রদূত-গণকে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্বীকার করিয়া লন ও বৈদেশিক রাষ্ট্র-প্রধানগণকে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা করেন বলিয়া তাহার মন্ত্রি বা শাসন পরিষদে formal precedence বা নামমাত্র প্রাধান্য রহিয়াছে। যদি শাসন পরিষদে ভোটাভুটি হইয়া ভোটসাম্য হয় তবেই তাহার একটি casting vote বা অতিরিক্ত ভোট দিবার ক্ষমতা আছে। ইহা ব্যতীত তাহার যাহা কিছু ক্ষমতা সমস্তই তিনি পাইয়া থাকেন শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে। রাষ্ট্রপতি পরিষদের অন্য ছয়জন মন্ত্রীর ন্যায় একটি শাসনবিভাগের কর্তা। তাহার বেতন অন্য সকল মন্ত্রীর সমান; তবে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে ভোজ সম্বর্ধনা প্রভৃতি বাবদ পৃথক ভাতা (৩,০০০ ফ্রাঙ্ক) পাইয়া থাকেন।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন যে এইরূপ রাষ্ট্রপতির কোন আবশ্যকতা আছে কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয় যাহা সাতজন সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না। ১৯১৪ সালের শাসনবিভাগীয় আইনে বলা হইয়াছে: "The President represents the confederation at home and abroad."। সকল দিক হইতে বিবেচনা করিলে সুইটজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতির যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা নিঃসন্দেহ।

সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের ক্ষমতা: সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধানের ১০২ ধারাতে শাসন পরিষদের ক্ষমতার বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে:

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে দেশের শাসন পরিচালন।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ও সুইটজারল্যাণ্ডের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সন্ধি-চুক্তি প্রভৃতির মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা।

৩। সংবিধান অনুযায়ী ক্যাণ্টনের শাসন ব্যবস্থার অক্ষুণ্ণতা বিধান।

৪। কোন আইন বা নীতি গ্রহণ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীকে উপদেশ দান এবং তদনুযায়ী কোন বিবরণী বা আইনের খসড়া বিধানমণ্ডলীতে পেশ করা।

৫। ক্যাণ্টনে ক্যাণ্টনে বিরোধের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা।

৬। বিধান মণ্ডলী বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী ব্যতীত অন্য সকল কর্মচারী নিয়োগ।

৭। অন্য রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ ও সুইটজারল্যাণ্ডের আন্তর্জাতিক স্বার্থরক্ষা।

৮। রাষ্ট্রের স্বাধীনতায় নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা।

৯। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা।

১০। জরুরী অবস্থায় সৈন্যদলকে কর্তব্যে আহ্বান এবং ইহার অব্যবহিত পরেই বিধান মণ্ডলীর অধিবেশনের ব্যবস্থা।

১১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ও বাজেট্।

১২। যুক্তরাষ্ট্রের বিধান মণ্ডলীর প্রতি অধিবেশনে শাসন পদ্ধতি, আভ্যন্তরীণ ও বহির্নীতি সম্বন্ধে বিবরণী পেশ ও তৎসম্বন্ধে সুপারিশ।

১৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সর্ববিভাগের সুষ্ঠু পরিচালন ও সমস্ত কর্মচারী সম্পর্কে বিধি ব্যবস্থা।

১৪। রেল কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন বিভাগীয় শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ ও তৎসম্বন্ধে মীমাংসা।

১৫। ক্যাণ্টনগুলির প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি পক্ষপাতিত্ব দেখা দেয় বা ক্যাণ্টনের ব্যবসা, পেটেণ্ট, সামরিক কর, শুল্ক ও ক্যাণ্টনীয় নির্বাচন সম্বন্ধে বিরোধ দেখা দেয়, তাহা হইলে আপীল শ্রবণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কার্য সাতটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার এক একটি বিভাগ এক একজন শাসন পরিষদীয় সদস্যের হস্তে ন্যস্ত আছে। কিন্তু বিধান মণ্ডলীর নিকট শাসন পরিষদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণ্ডলী যৌথ ভাবে দায়ী। সংবিধানের ১০৩ ধারাতে আছে যে: "The business of the Federal Council is distributed among its members by departments. All decisions emanate from the Federal Council as a single authority." অন্ততঃ চারজন উপস্থিত না থাকিলে শাসন পরিষদের সভা আইনতঃ চলিতে পারে না। অধিকাংশের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যদিও মন্ত্রী বা শাসন পরিষদীয় সদস্যগণ বিভিন্ন দলভুক্ত ও অন্ততঃ তিনটি ভাষা-ভাষী তথাপি দলীয় মত পার্থক্য কোন সদস্যই বেশী দূর অগ্রসর হইতে দেন না। মিলিয়া

মিশিয়া পরস্পর সহযোগিতামূলক ভাবে শাসন নীতি নির্ধারিত হইয়া থাকে।

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের, বিধানমণ্ডলীর উচ্চতর বা নিম্নতন অর্থাৎ যথাক্রমে রাজ্য পরিষদ ও জাতীয় পরিষদ এই দুই পরিষদেই বক্তৃতা করিবার ও প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার আছে। তেমনি যুক্ত পরিষদে তাহারা বক্তৃতা ও প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের ভোট দিবার অধিকার নাই কারণ তাহারা কোন পরিষদেরই সদস্য নহেন।

সুইটজারল্যাণ্ডে শাসনপরিষদের প্রকৃতি (Nature of the Swiss Executive): সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুযায়ী শাসন বা মন্ত্রি-পরিষদের ক্ষমতা যুক্ত-রাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী অর্থাৎ উচ্চতর কক্ষ—জাতীয় (National Council) ও নিম্নতম কক্ষ—রাজ্য পরিষদের নির্দেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ। শাসনকার্য পরিদর্শন ও পরিচালনের ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের রহিয়াছে; সংবিধান অনুসারে স্বাধীনভাবে নূতন নীতির প্রবর্তন করিবার অধিকার তাহাদের নাই। তবে তাহারা এই ক্ষেত্রে বিধানমণ্ডলীর নিকট প্রস্তাবাদি মারফৎ পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।

সংবিধানের ৭১ ধারাতে বিধানমণ্ডলীর সর্বময় ক্ষমতা উল্লিখিত হইয়াছে: "Subject to the rights reserved to the people and to the cantons (Articles 89 and 121), the supreme power of the confederation is exercised by the Federal Assembly, viz :—A. The National Council, B. The Council of States." সংবিধানের ৯৫ ধারায় শাসন পরিষদকে "supreme directing and executive power." অর্থাৎ শাসনযন্ত্র চালাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

বিধানমণ্ডলী নানা বিষয়ে শাসন পরিষদকে নির্দেশ দিয়া থাকেন। পরিষদকে এই নির্দেশ অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য থাকিতে হয়। পরিষদ কোন বিষয়ে কোন বিবরণী বিধানমণ্ডলীতে পেশ করিলে তাহার বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং যে সিদ্ধান্ত বিধানমণ্ডলী গ্রহণ করেন তাহা পরিষদকে মানিয়া চলিতে হয়। শাসন পরিষদের কোন প্রস্তাব বা বিধানমণ্ডলীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তুত কোন আইন যদি বিধানমণ্ডলী অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে শাসনপরিষদের সদস্যগণ পদত্যাগ করেন না। বিধানমণ্ডলীর নির্দেশ মানিয়া লইয়া তাহাদেরই নির্দেশিত পথে অগ্রসর হন। প্রস্তাব বা আইন আলোচনাকালে শাসন পরিষদের সদস্যদের আলোচ্য বিষয়

সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিবার অধিকার আছে। অর্থাৎ সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে Cabinet Government বলা যায় না। শাসন পরিষদ Cabinet নহে ইহাকে collegial executive বলা হয়।

এই সম্পর্কে ডাইসি (Dicey) ও লাওয়েল (Lowell) যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাইসি লিখিতেছেন: শাসন পরিষদ (Federal Council) "is expected to carry out and does carry out, the policy of the Assembly, and ultimately the policy of the nation, just as a good man of business is expected to carry out the order of his employers." (Law of the Constitution)। লাওয়েল বলিয়াছেন: It "is a general maxim of public life in Switzerland that an official gives his advice, but like a lawyer and an architect, he does not feel obliged to throw up his position because his advice is not followed." অর্থাৎ যেমন একজন স্থপতি বা উকিল তাহার পরামর্শ কোন মক্কেল গ্রহণ করে নাই বলিয়া কাজে ইস্তফা দেয় না, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী শাসনপরিষদের নীতি অগ্রাহ্য করিলে পরিষদীয় সদস্যগণ পদত্যাগ করেন না।

সুইটজারল্যাণ্ডের মন্ত্রী বা শাসন পরিষদের প্রকৃতি সম্বন্ধে গণতন্ত্র বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ব্রাইসের (Bryce) Modern Democracies-এ যে মন্তব্য আছে তাহা উদ্ধৃতির যোগ্য। ব্রাইস বলিতেছেন: "In no other modern republic the executive power is entrusted to a council instead of to a man, and in no other free country has the working executive so little to do with party politics. The Council is not the Cabinet, like that of Britain, for it does not lead the legislature and is not displacable thereby. Neither is it independent of the legislature, like the executive of the United States and though it has some of the features common to both these schemes, it differs from these in having no distinctively partisan character. It stands outside party, is not chosen to do party work, does not determine party policy, yet is not wholly without some party colour." উদ্ধৃতিটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও অবশ্য পাঠ্য: কারণ ব্রাইস

এইখানে সুইটজারল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং সুইস্ শাসনপরিষদের সহিত ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার তুলনা করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের অলিখিত ক্ষমতা : উপরোক্ত আলোচনা হইতে মনে হইতে পারে যে শাসনপরিষদ সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন। এইরূপ মনে করা ভ্রমাত্মক। আইন অনুসারে শাসনপরিষদ কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীর অধীন বটে কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে পরিষদের প্রভাব বা ক্ষমতা নাই। সংবিধানের ১০২ ধারা অনুসারে যে ক্ষমতা পরিষদকে দেওয়া হইয়াছে তাহা সুদূরপ্রসারী। সেই সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে যে প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা শাসন-পরিষদের হাতে পৌঁছায় তাহা কম নহে। এই প্রভাব প্রতিপত্তির কাছে বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণ কিছু পরিমাণে মাথা নোয়াইতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়তঃ পরিষদীয় সদস্যগণ সততা, কর্মদক্ষতা ও নিরপেক্ষতার জন্য পুনঃপুনঃ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাহারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার সুযোগ পায় তাহাও মন্ত্রিপরিষদের প্রভাব বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ বিধানমণ্ডলী আইন প্রণয়ন, শাসন-নীতি স্থিরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে শাসনপরিষদের পরামর্শের উপর আস্থা রাখেন, কারণ তাহারা ঐ সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। এই জন্যও পরিষদের প্রভাব প্রতিপত্তি সত্য হইয়া উঠে। চতুর্থতঃ বর্তমান শাসনব্যবস্থা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এই জটিলতা বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণ ভালভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন না। এই কারণে অভিজ্ঞ ও কুশলী শাসকবর্গ অর্থাৎ শাসন পরিষদের উপর বিধানমণ্ডলীকে নির্ভর করিতে হয়। এই জন্যও শাসন বা মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই সকল ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা অলিখিতভাবেই মন্ত্রিপরিষদের হাতে আসিয়া পড়ে। আইনানুসারে তাহারা এইগুলির অধিকারী নহেন।

পঞ্চমতঃ আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার ফলে বিধানমণ্ডলীতে বহুদলীয় প্রতিনিধি আসিয়াছে। এই কারণে বৃহত্তর দলগুলির ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে। দলীয় কোন্দল বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য বিধানমণ্ডলীর পূর্বের মর্যাদা ও একযোগে কাজ করিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। তাহার ফলে বিধানমণ্ডলী আর পূর্বের ন্যায় শাসনপরিষদকে তাহাদের তাঁবে রাখিতে পারিতেছে না। ইহা শাসনপরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ষষ্ঠতঃ দুই মহাযুদ্ধ ও ১৯৩০ সালের পৃথিবীব্যাপী অর্থসংকটের সময় বিধানমণ্ডলী বিপুল ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার

শাসনপরিষদকে দিয়াছিল। এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া শাসনপরিষদ Ordinance বা হুকুম আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই হুকুম আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এখন সাধারণ নিয়মে পরিণত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থসংরক্ষণ কল্পে আধুনিক কালে পরিষদ নানা জটিলতাপূর্ণ আইন প্রস্তুতির সুপারিশ করিয়াছেন। বিধানমণ্ডলী নির্বিবাদে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এমনি করিয়া আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শাসনপরিষদের নেতৃত্ব লক্ষণীয়ভাবে কায়েম হইয়াছে। এই সকল আইনের দ্বারা দেশের প্রভূত উপকারও হইয়াছে। এই জন্য শাসনপরিষদের উপর বিধানমণ্ডলীর কর্তৃত্ব কমিয়া গিয়াছে। সপ্তমতঃ আধুনিক কালে বিধানমণ্ডলী দ্বারা সমর্থিত কতকগুলি সাংবিধানিক পরিবর্তন গণভোটে বাতিল হইয়া গিয়াছে, আবার বিধানমণ্ডলী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত কতকগুলি সাংবিধানিক পরিবর্তন গণউদ্যোগে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে বিধানমণ্ডলীর মর্যাদাহানি হইয়াছে। তাই পূর্বের ন্যায় তাহারা শাসনপরিষদের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিতেছে না।

উপরোক্ত সমস্ত কারণে শাসনপরিষদ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। তাই ব্রাইস্ বলিয়াছেন যে শাসনপরিষদ "exerts in practice almost as much authority as do English, and more than do some French Cabinets, so that it may be said to lead as well as to follow."

যুক্তরাজ্যের ক্যাবিনেট শাসনযন্ত্র ও সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনযন্ত্রের পার্থক্য :

(১) ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে বিধানমণ্ডলীর সভ্য হইতে হইবে। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ বিধানমণ্ডলীর সদস্য থাকিতে পারেন না।

(২) ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাহাদের দলের নেতৃস্থানীয় বলিয়াই ক্যাবিনেটে স্থান পান। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডে শাসন পরিষদীয় সদস্যগণ দলের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহারা তাহাদের যোগ্যতার জন্যই বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন।

(৩) ক্যাবিনেট মন্ত্রিমণ্ডলী পার্লামেন্টের নেতৃত্ব করেন ও তাহাদের দলীয় নীতি অনুসারে শাসন পরিচালনা করিতে থাকেন। সুইটজারল্যাণ্ডের মন্ত্রিপরিষদের দলীয় নীতির সহিত কোন সম্পর্ক নাই। বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্দিষ্ট নীতিই তাহাদের নীতি।

(৪) ক্যাবিনেট মন্ত্রিমণ্ডলীর পশ্চাতে কমন্স্ সভার অধিকাংশের সমর্থন

সর্বদা সক্রিয়ভাবে রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের হস্তে কার্যতঃ শুধু শাসন ক্ষমতা নহে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতাও অপ্রত্যক্ষভাবে আসিয়া পড়ে। কারণ যুক্ত-রাজ্যের পার্লামেণ্ট আইন অনুসারে কমন্‌স্ সভাই আইন প্রণয়নের এক রকমের সর্বময় ক্ষমতাপন্ন কক্ষ। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের হস্তে কেবল মাত্র শাসন পরিচালনের ক্ষমতা রহিয়াছে। আইনের ক্ষেত্রে তাহারা যুক্ত-রাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর উপর নির্ভরশীল।

(৫) শাসন পরিচালনের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট সভা একচ্ছত্র ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুইস্ শাসন পরিষদ এই ক্ষেত্রেও বিধানমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রাপ্ত নির্দেশ মানিয়া চলে।

(৬) যুক্তরাজ্য ক্যাবিনেট প্রায় সকল সময়েই (যুদ্ধকালের অথবা জরুরী অবস্থা ব্যতীত) একই দলের সদস্যগণ কর্তৃক গঠিত হয়। সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের সদস্যগণ বিভিন্ন দলভুক্ত ব্যক্তি।

(৭) দলীয় নীতি কমন্‌স্ সভায় ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হইলে যুক্ত রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করে। সুইটজারল্যাণ্ডের মন্ত্রিপরিষদ তাহা করে না। বিধানমণ্ডলীর নির্দেশ মানিয়া লইয়া, নিজস্ব নীতি অগ্রাহ্য হইবার পরও পূর্বের ন্যায় তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলে।

(৮) ক্যাবিনেটে এক দলভুক্ত সদস্যগণ যেমন একযোগে সম্মিলিতভাবে শাসন কার্যে লিপ্ত থাকেন, সুইটজারল্যাণ্ডের collegial executive বা সম্মিলিত শাসনপরিষদের সদস্যরাও বিভিন্ন দলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণতঃ একযোগে কাজ চালাইয়া যান। শাসনপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই পরিষদীয় সকল সদস্যদের মত বলিয়া গণ্য হয়। যদিও তাহারা একযোগে কাজ করিয়া চলেন তথাপি ইচ্ছা করিলে যে কোন পরিষদীয় সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধে বিধানমণ্ডলীতে বক্তৃতা করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। কিন্তু যুক্তরাজ্যে সেইরূপ হয় না বলিলেই চলে। এই দিক হইতে যুক্তরাজ্যের ক্যাবিনেটের সহিত সুইস শাসন পরিষদের পার্থক্য লক্ষণীয়।

ভারতবর্ষে ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, সুতরাং যুক্তরাজ্যের ক্যাবিনেট প্রথার সহিত সুইস শাসন ব্যবস্থার যে প্রভেদ, ভারতের প্রথার সহিত সুইটজার-ল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থার সেই একই প্রভেদ।

(৯) যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট গঠন করেন। তিনিই ক্যাবিনেটের স্থায়ী সভাপতি। তিনি পদত্যাগ করিলে ক্যাবিনেট ভাঙ্গিয়া যায়। সুইটজার-

ল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সেইরূপ কোন পদাধিকারী নাই। শাসন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হয়। তাহার কার্যকালও আইন দ্বারা নির্ধারিত।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ও সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন-পরিষদ : ১। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা (Executive Authority) রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত একটি বিশেষ নির্বাচন সংস্থা বা Electoral College কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি স্বয়ং আপন ইচ্ছা ও সুবিধানুযায়ী কয়েকজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া থাকেন। এই সকল মন্ত্রীর হাতে রাষ্ট্রপতি বিভাগীয় ভার প্রদান করেন। প্রতিটি মন্ত্রী একক ও পৃথকভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট তাহার বিভাগীয় পরিচালনের জন্য দায়ী থাকেন। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস বা বিধানমণ্ডলীর নিকট দায়ী নহেন।

সুইটজারল্যাণ্ডে শাসন কার্য পরিচালন ক্ষমতা এক ব্যক্তির উপর নহে, Collegial Executive বা সমষ্টিমূলক শাসন পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে। শাসন পরিষদের সদস্যবর্গ যুক্ত-রাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই শাসন পরিষদের সকলেই সমপর্যায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে এক বৎসরের জন্য একজনকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করা হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রাধান্য নামমাত্র। সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন বা মন্ত্রিপরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর নিকট দায়ী এবং তাহাদেরই নির্দেশবাহী।

২। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যুক্ত-রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী শাসক; তাঁহার শাসনকার্যবিষয়ক ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি অতুলনীয়। তিনি একাধারে রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ এবং রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কার্যকারক।

সুইটজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি কতকগুলি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য (যথা বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণকে স্বীকার করিয়া লওয়া প্রভৃতি) সামান্য মাত্র প্রাধান্য পাইয়া থাকেন। নতুবা তিনি শাসন পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় একটি শাসন বিভাগের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ন্যায় তাঁহার সম্মান, প্রভাব ও প্রতিপত্তি নাই।

৩। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ সরকারী বেতন ভোগী রাষ্ট্রকর্মচারী। সুইটজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি বেতন শাসন পরিষদের অন্যান্য মন্ত্রীর অপেক্ষা বেশী নহে।

৪। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির অগণিত উচ্চ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা রহিয়াছে। সুইটজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতির সেরূপ ক্ষমতা নাই। কর্মচারী নিয়োগ ক্ষমতা অনেক পরিমাণ বিভাগীয় মন্ত্রিবর্গের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

৫। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেসীয় আইন ভিটো অর্থাৎ বাতিল করিবার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুইটজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রিপরিষদের সে ক্ষমতা নাই।

৬। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি সৈন্য, নৌ ও বিমান বিভাগের প্রধান। সুইট-জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি বা শাসন পরিষদের এইরূপ কোন শাসন নাই। তবে জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইলে সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ সৈন্যদল আহ্বান করিয়া যথা কর্তব্য করিতে আদেশ দিতে পারেন।

৭। কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ আপন দলের সাহায্যে কংগ্রেসে বাণী পাঠাইয়া বা কংগ্রেসে ভাষণ দান করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। সুইটজার-ল্যাণ্ডের শাসন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বিধানমণ্ডলীকে কিছুটা প্রভাবিত করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা আমেরিকার রাষ্ট্রপতির প্রভাবের তুলনায় অতিশয় নগণ্য।

৮। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও তাহার উপদেষ্টা মন্ত্রিবর্গ কংগ্রেসের কোন কক্ষের দৈনন্দিন অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন না। সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের সদস্যগণকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর উভয় কক্ষের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে হয় এবং শাসনকার্য সম্বন্ধে সমালোচনার উত্তর দিতে হয়। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তাহারা বিধানমণ্ডলীর কোন কক্ষেরই সদস্য হইতে পারেন না, তথাপি বিধানমণ্ডলীর সহিত তাহাদের যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। তবে তাহারা বিধানমণ্ডলীতে ভোটের অধিকারী নহেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থা Cabinet শাসন ও Presidential শাসন ব্যবস্থা হইতে বিভিন্ন। এই দুইটি শাসন পদ্ধতি মিলাইয়া সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন পদ্ধতি প্রস্তুত হইয়াছে। সুইস মন্ত্রিপরিষদ আমেরিকার সর্বোচ্চ শাসন অধিকারিক রাষ্ট্রপতি ও তাহার মন্ত্রিবর্গের ন্যায়, বিধানমণ্ডলীর অনাস্থা সত্ত্বেও পদত্যাগ করেন না। ইহারা তাহাদেরই ন্যায় বিধানমণ্ডলীর সদস্য নহেন। সুইটজারল্যাণ্ডের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ বিধানমণ্ডলীর নিকট জবাব-দিহি করিতে বাধ্য রাষ্ট্রপতি ও তাহার ক্যাবিনেটের সেই বাধ্যবাধকতা নাই।

সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদের (Collegial Executive) গুণ : সুইটজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের প্রধান গুণ এই যে ইহাতে ক্যাবিনেট প্রথার কতকগুলি সুবিধা দেখা যায়, কিন্তু অসুবিধাগুলি এড়াইয়া চলা সম্ভব হয়। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ যেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া সহযোগিতার মাধ্যমে একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করেন, সুইটজারল্যাণ্ডের মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যরাও তেমনি পরস্পরের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া মিলিত ভাবে সরকারী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যুক্তরাজ্য ক্যাবিনেট সরকারের সভ্যবৃন্দ প্রায় সকল সময়ই এক দলভুক্ত হইয়া থাকেন। ইহার ফলে অনেক সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল যেরূপ শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তাহাতে দলীয় একনায়কত্বের চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। কারণ দলীয় নীতি কার্যে পরিণত করাই ক্যাবিনেট পদ্ধতির সরকারের উদ্দেশ্য। সুইটজারল্যাণ্ডে মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন দলভুক্ত। তাহারা যখন একযোগে সম্মিলিত ভাবে শাসন কার্য পরিচালন করেন তখন কোন বিশেষ দলীয় নীতি অনুসারে শাসন যন্ত্র পরিচালন স্বভাবতঃই অসম্ভব হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সংবিধান অনুযায়ী তাহাদের কর্তব্য বিধানমণ্ডলী নির্দেশিত নীতি সুষ্ঠুভাবে শাসন যন্ত্রের মাধ্যমে কার্যে পরিণত করা। এই জন্য সুইস্ মন্ত্রিপরিষদের পক্ষে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিভিন্ন দলের স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন অধিকতর রূপে সম্ভব হয়। ব্রাইস সুইট-জারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের এই গুণটির বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সহিত সুইস্ শাসন পরিষদের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

সুইটজারল্যাণ্ডের সম্মিলিত মন্ত্রি পরিষদ প্রথার আর একটি সুবিধা এই যে এই পরিষদটিকে বিধান মণ্ডলীর অধিকাংশের ভোটের অর্থাৎ দলীয় ভোটের উপর নির্ভর করিতে হয় না। ইহার ফলে চারটি সুবিধালাভ করা যায়। (১) সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া পরিষদ জাতীয় স্বার্থের সুপ্রশস্ত পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়। (২) বিধানমণ্ডলীতে ভোটে পরাজিত হইলেও পরিষদের সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে হয় না বলিয়া সদস্যগণ দীর্ঘ-কাল সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতায় অর্জন করিবার সুযোগ পান। অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা তাহারা দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করিবারও সুযোগ পাইয়া থাকেন। দেশের শাসনব্যবস্থার পক্ষে ইহার উপকারিতা অপরিসীম। (৩) বিধানমণ্ডলীতে ভোটে পরাজিত

হইলে পদত্যাগ করেন না বলিয়া শাসন পরিষদের সদস্যগণ দীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন এবং সেই জন্য শাসননীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে না। তাহার ফলে সুস্থ শাসন ব্যবস্থা ও ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিতে পারে। ইহাও শাসনতন্ত্রের পক্ষে পরম উপকারী। (৪) মন্ত্রীপদরক্ষা বিধানমণ্ডলীর ভোট সাপেক্ষ হইলে মন্ত্রিগণ দলীয় চক্রান্তে লিপ্ত হইতে বাধ্য হন, নানা মিথ্যাচার তাহাদের কর্ম-পদ্ধতিকে কলুষিত করে। সুইটজারল্যাণ্ডে মন্ত্রিমণ্ডলীকে কোন বিষয়ে বিধান মণ্ডলীর আস্থা হারাইলেও পদত্যাগ করিতে হয় না বলিয়া তাহারা শাসন ব্যবস্থাকে বহুলাংশে ক্লেদমুক্ত রাখিতে পারেন। ব্রাইস সুইটজারল্যাণ্ডের দুর্নীতিমুক্ত গণতন্ত্রের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন।

সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনযান্ত্রিক বিভাগঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থানুযায়ী সুইটজারল্যাণ্ডে সাতটি বিভাগ আছে। এক একজন মন্ত্রী এক একটি বিভাগের কর্তা। বিভাগগুলি এইরূপ, যথা—(১) রাজনৈতিক বিভাগ (Political Department), (২) আভ্যন্তরীণ (Interior) বিভাগ; (৩) অর্থ ও শুল্ক বিভাগ; (৪) প্রতিরক্ষা বিভাগ; (৫) বিচার ও পুলিশ বিভাগ; (৬) জাতীয় অর্থনৈতিক বিভাগ; (৭) পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফ বিভাগ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় Chancellor বা সচিবঃ সংবিধানের ১০৫ ধারায় যুক্তরাষ্ট্রীয় Chancellor বা সচিবের পদ, ক্ষমতা ও নিয়োগ পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান মণ্ডলী ও যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষদের প্রধান সচিব চ্যান্সেলার নামে পরিচিত। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যান্সেলারীর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা। তিনি বিধান মণ্ডলীর ও মন্ত্রিপরিষদের দপ্তর দুইটি পরিচালনা করেন। চ্যান্সেলার চার বৎসরের জন্য বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন। সাধারণতঃ তিনি ইচ্ছাপূর্বক অবসর গ্রহণ না করিলে পুনঃ নির্বাচিত হইতে থাকেন। সহ-সচিবগণ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। সচিব অবসর গ্রহণ করিলে তাহাদেরই একজন সাধারণতঃ সচিব পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। চ্যান্সেলার বা সচিব যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান-মণ্ডলীর এবং মন্ত্রিপরিষদের প্রধান সচিব বা সম্পাদক বলিয়া, তাহার পদটি গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাজ্যে ও ভারতে বিধানমণ্ডলীর সম্পাদকের সহিত মন্ত্রিপরিষদের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর সচিব মন্ত্রিপরিষদেরও সচিব হিসাবে কাজ করেন। ইহা সুইস শাসনব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী

সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী দুই কক্ষবিশিষ্ট। ইহা National বা জাতীয় পরিষদ এবং Council of States বা রাজ্য পরিষদ লইয়া গঠিত। জাতীয় পরিষদ সুইটজারল্যাণ্ডের সমগ্র নাগরিকবর্গের প্রতিনিধি স্থানীয় আইন সভা ; রাজ্যসভা বিভিন্ন ক্যাণ্টনগুলির প্রতিনিধিগণ কর্তৃক গঠিত।

সংবিধানের ৭১ ধারায় লিখিত হইয়াছে যে : "Subject to the rights reserved to the people and the Cantons (Articles 89 and 121), the supreme power of the Confederation is exercised by the Federal Assembly......" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে Federal Assembly বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার ক্ষমতাবলীর মধ্য দিয়া এই গুরুত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর ক্ষমতা (Powers of the Federal Assembly) ঃ সংবিধানের ৮৪ ধারায় লিখিত হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অধিকারকগণকে যে সকল ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য সকল ক্ষমতা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী (জাতীয় পরিষদ ও রাজ্য পরিষদ) আলোচনা ও পরিচালনা করিতে পারিবে। ৮৫ ধারায় বিধানমণ্ডলীর কর্মক্ষেত্র বিস্তারিত উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান ক্ষমতাগুলি এইরূপঃ—

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের গঠন ও নির্বাচন প্রথা ;

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সকল বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন ;

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন শাসন বিভাগের কর্মচারিদের এবং প্রধান সচিবের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভা, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, প্রধান সচিব ও প্রধান সেনাপতির নির্বাচন।

৫। পররাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব ও সন্ধি এবং ক্যাণ্টনগুলির পরস্পরের সহিত চুক্তি মঞ্জুর করা।

৬। সুইটজারল্যাণ্ডের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ;

৭। যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন ;

৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব ;

৯। সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা ও ক্যাণ্টনীর শাসনব্যবস্থার নিরাপত্তা রক্ষা ;

১০। বার্ষিক বাজেট ;

১১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন যন্ত্র ও বিচার বিভাগের সাধারণ তত্ত্বাবধান ;

১২। বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের মতবিরোধের মীমাংসা ;

১৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পরিবর্তন।

উপরে উল্লিখিত ক্ষমতাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান মণ্ডলীর ক্ষমতা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম আইন বিষয়ক ক্ষমতা, দ্বিতীয় শাসন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা, তৃতীয় বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ও চতুর্থতঃ সংবিধান পরিবর্তন বিষয়ক ক্ষমতা পঞ্চমতঃ বাজেট ও আয় ব্যয় বিষয়ক ক্ষমতা।

আইন বিষয়ক ক্ষমতা

(ক) বিধান মণ্ডলী উপরোক্ত যে কোন বিষয়ে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা ও নিয়ম অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে এই আইন গণভোটে দিবার বিধি আছে।*

(খ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিধানমণ্ডলী ও রাজ্য পরিষদ যুক্ত অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদের সাতজন সদস্য, রাষ্ট্রপতি, যুক্তরাষ্ট্রীয়-আদালতের বিচারপতিগণ, প্রধান সচিব ও প্রধান সেনাপতিকে নির্বাচিত করেন। শাসন যন্ত্রের (Civil Service) কার্য তত্ত্বাবধান, কর্মচারিগণের বেতন নির্ধারণ বিষয়ে বিধান মণ্ডলীকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন, সৈন্যদলের কর্তৃত্ব, সন্ধি ও পররাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর এক্তিয়ারভুক্ত। ক্যাণ্টনের সহিত ক্যাণ্টনের চুক্তিও বিধান-মণ্ডলীর মঞ্জুরসাপেক্ষ। ইহা ব্যতীত কয়েদীগণের শাস্তি মকুব করিবার বা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর আছে।

প্রসাসনিক ক্ষমতা

(গ) প্রশাসনিক কোন বিভাগের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যদি কোন মোকদ্দমা কেহ মন্ত্রিপরিষদের কাছে উত্থাপন করেন, এবং মন্ত্রিপরিষদ যদি সেই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, এবং সেই সিদ্ধান্ত যদি মোকদ্দমাকারীর মনঃপূত না হয়, তাহা হইলেই তিনি বিধানমণ্ডলীর নিকট আপীল করিতে পারেন। বিধানমণ্ডলীর এই আপীল শুনিবার ও রায় দিবার অধিকার আছে।

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা

---

* গণভোট, গণ-উদ্যোগ ও প্রত্যাহার আজ্ঞা শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) যখন উভয় পরিষদ সংবিধান আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন উহা গণভোটের জন্য জনসাধারণের নিকট দেওয়া হয়। যদি দুই পরিষদের পরিবর্তন সম্বন্ধে মতৈক্য না হয়, তাহা হইলে পরিবর্তন জন-সাধারণ ইচ্ছা করেন কিনা, এই বিষয়টি জানিবার জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। যদি অধিকাংশ ভোট দাতা পরিবর্তন ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উভয় পরিষদের কার্যকাল শেষ হইয়া যায়। পুনরায় নির্বাচনের দ্বারা নূতন বিধানমণ্ডলী গঠিত হয়। তখন পরিবর্তনের প্রস্তাব ও তদনুযায়ী আইন বিধানমণ্ডলীতে গৃহীত হইবার পর গণভোটে দেওয়া হয়। গণভোটে উহা গৃহীত হইলে সংবিধান পরিবর্তিত হয়।

সংবিধানিক পরিবর্তন বিষয়ক ক্ষমতা

বাজেট সংক্রান্ত ক্ষমতা

(ঙ) সংবিধান বাজেট ও আয় ব্যয়, আয় ব্যয়ের হিসাব, ঋণগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে বিধানমণ্ডলীকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সুইটজারল্যাণ্ডের বিধানমণ্ডলীর ক্ষমতা ব্যাপক। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে সুইটজারল্যাণ্ডের গণতন্ত্র অসাধারণ ভাবে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে, সেই দেশের নাগরিকেরা অত্যন্ত সচেতন। তাই বিধানমণ্ডলীর জনমতের ভয়ে যথেচ্ছাচারিতার পথে অগ্রসর হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিপুল ক্ষমতায় অধিকারী বিধানমণ্ডলী যাহাতে তাহাদের ক্ষমতা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার না করে, তাহারই প্রতিবিধানকল্পে সংবিধান জনসাধারণকে সংবিধান পরিবর্তন এমনকি সাধারণ আইন বিষয়েও মতামত প্রকাশের ক্ষমতা দিয়াছে। এই ক্ষমতা নাগরিকগণ প্রায়শঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সংবিধান অনুসারে গণভোট মারফত প্রকাশিত নাগরিকগণের এই মতামত বিধানমণ্ডলী মানিতে বাধ্য তাই সুইটজারল্যাণ্ডের গণতন্ত্র সত্য হইয়া উঠিয়াছে, গণতন্ত্রের নামে বিধানমণ্ডলীর একনায়কত্বে পরিণত হয় নাই।

জাতীয় পরিষদ (National Council)ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের সংগঠন পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। (১) পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৯৬। (২) ১৯১০ সাল হইতে আনুপাতিক নির্বাচন প্রথানুযায়ী জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। (৩) সুইটজারল্যাণ্ডের যে সকল পুরুষ নাগরিকের বয়স ২০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তাহারা গোপন ভোট (Secret Ballot) প্রথায় প্রতিনিধিদিগকে নির্বাচন করিয়া থাকেন। নির্বাচনে আনুপাতিক ভোট প্রথা (Proportional Representation) প্রচলিত আছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে সুইটজারল্যাণ্ড প্রাগ্রসর গণতন্ত্র হইলেও নারীদের ভোট দানের অধিকার নাই।* (৪) প্রতি ক্যাণ্টন ও অর্ধক্যাণ্টনের প্রতি ২৪০০০ হাজার নাগরিক পিছু একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ক্যাণ্টনে বা অর্ধক্যাণ্টনে ভোট দানের গুণসম্পন্ন জনসংখ্যা যতই থাকুক না কেন, প্রতি ক্যাণ্টন বা অর্ধক্যাণ্টন হইতে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ। (৫) জাতীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল চার বৎসর। তাহার পূর্বে পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলে না বটে; কিন্তু যদি বিধানমণ্ডলীর দুই কক্ষের মধ্যে একটি কক্ষ সংবিধানের সামগ্রিক পরিবর্তন কামনা করিয়া প্রস্তাব পাস করে এবং অন্য কক্ষ যদি তাহাতে সম্মতি না দেয়, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। সংবিধানের ১২০ ধারায় এইরূপ ব্যবস্থা আছে। (৬) ধর্মযাজক যুক্তরাষ্ট্রের কর্মচারী, রাজ্য পরিষদের সদস্যগণ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী বা শাসনপরিষদের সদস্যগণ জাতীয় পরিষদের সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন না। (৭) পরিষদ এক বৎসরের জন্য পরিষদের অধ্যক্ষ (Chairman) ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করে। (৮) সাধারণতঃ বৎসরে চারবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হয়। কিন্তু যদি জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা হইলে মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। শালীনতা ও সুষ্ঠুভাব ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্য জাতীয় পরিষদ গণতান্ত্রিক জগতে অশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে।

জাতীয় পরিষদের অভ্যন্তরে দলগত ব্যবস্থা

(৯) জাতীয় পরিষদের অভ্যন্তরে দলীয় সংগঠনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাই। তাহার কারণ এই যে জাতীয় পরিষদে কোন দল শাসন বা মন্ত্রিপরিষদকে পদচ্যুত করিয়া সেই স্থলে নিজেদের দলীয় মন্ত্রী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। ক্ষমতা লাভের কোন আশা যেখানে নাই সেখানে দলীয় সংগঠন অপেক্ষাকৃত দুর্বল না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ সংবিধানবলে সমগ্র বিধানমণ্ডলীর উপরে সর্বময়তা জনসাধারণের হাতেই রহিয়াছে এবং জনসাধারণ খুবই সক্রিয়ভাবে গণভোট ও গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে আপন কর্তব্য সম্পাদন করে। এই কারণেও দল ও জাতীয় পরিষদের আভ্যন্তরীণ দলীয় সংগঠন স্বভাবতঃই দুর্বল হইয়া রহিয়াছে। জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ বলিয়া কিছুই নাই।

---

* সুইটজারল্যাণ্ডের বিধানমণ্ডলী ১৯৫৯ সালে নারী ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া তাহা সংবিধান অনুযায়ী গণভোটে উপস্থাপিত করেন। ঐ বৎসরের ১লা ফেব্রুয়ারী গণভোটে উহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ৩২৩৭২৭ জন সপক্ষে ভোট দেন বিপক্ষের ভোট সংখ্যা ছিল ৬৫৪৯৩৯।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের সদস্যগণ অবশ্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন কিন্তু তাহারা জাতীয় পরিষদের সদস্য নহেন এবং তাহাদের পদরক্ষা জাতীয় পরিষদের ভোটের উপর নির্ভর করে না। আরও লক্ষণীয় যে বিভিন্ন দলের সদস্যগণ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ক্যাণ্টন অনুযায়ী আসন গ্রহণ করেন দল অনুযায়ী নহে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে একটি প্রস্তাব বা আইন, তাহা যে দল হইতেই আসুক না কেন, অন্য দল যদি মনে করে যে তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা হইলে সেই প্রস্তাব বা আইন অন্যান্য দল উৎসাহের সহিত সমর্থন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। এইরূপ দেশাত্মবোধ যুক্তরাজ্যে বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দলগুলির মধ্যে দেখা যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

(১০) জাতীয় পরিষদ ও রাজ্য পরিষদের যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

যুক্ত-অধিবেশন

যদিও সাধারণতঃ দুইটি কক্ষের আলাদা ভাবে অধিবেশন হইয়া থাকে। সংবিধান অনুসারে নিম্ন লিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য দুইটি কক্ষের যুক্ত অধিবেশন হইয়া থাকে।

ক। যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী বা শাসন পরিষদের ও রাষ্ট্রপতির নির্বাচন;

খ। যুক্তরাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ আদালতের (Federal Tribunal) বিচারকগণের নির্বাচন;

গ। যুক্তরাষ্ট্রের দপ্তরের সর্বোচ্চ স্থায়ী কর্মচারীর Chancellor বা প্রধান সচিবের নির্বাচন;

ঘ। যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতির নির্বাচন;

ঙ। মন্ত্রিপরিষদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের মত বিরোধের মীমাংসা;

চ। কয়েদীর শাস্তি মকুব করা;

জাতীয় পরিষদ ও রাজ্য পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

(১১) দুই পরিষদের মতবিরোধ উপস্থিত হইলে কমিটিমূলক আলোচনার

দুই কক্ষে মতবিরোধ

মাধ্যমে ঐক্যে উপস্থিত হইবার প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু মতৈক্য না হইলে বিরোধীয় বিষয়টি ছাড়িয়া দিতে হয়। কারণ সকল বিষয়ে দুইটি কক্ষের ক্ষমতা সম্পূর্ণ এক। যদি বিষয়টি সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে দুইটি পরিষদের সম্মিলিত অধিবেশনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের রাজনীতি এমন নহে যাহাতে এরূপ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে।

রাজ্য পরিষদ (Council of States) : সংবিধানের ৮০ ধারা অনুসারে রাজ্য পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুইটজারল্যাণ্ডে ১৯টি ক্যাণ্টন ও ছয়টি অর্ধক্যাণ্টন আছে। প্রতি ক্যাণ্টন হইতে ২ জন এবং প্রতি অর্ধক্যাণ্টন হইতে ১ জন প্রতিনিধি রাজ্য পরিষদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪৪। জাতীয় পরিষদ অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ রাজ্য পরিষদের সদস্য হইতে পারেন না। রাজ্য পরিষদ একজন করিয়া অধ্যক্ষ (Chairman) ও উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কোন ক্যাণ্টনীয় প্রতিনিধি পর পর দুইটি অধিবেশনে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইতে পারেন না। ভোটাভুটির সময় ভোটের সমতা হইলেই অধ্যক্ষ মীমাংসামূলক (Casting) Vote দিতে পারেন। রাজ্য পরিষদের সদস্যগণ যে ক্যাণ্টন হইতে নির্বাচিত হন সেই ক্যাণ্টন হইতে ভাতা পাইয়া থাকেন। পরিষদের সভ্যগণের সদস্য থাকিবার কাল নির্ণয়, নির্বাচনের নিয়ম প্রভৃতি ক্যাণ্টনগুলিই স্থির করেন। কয়েকটি ক্যাণ্টনে ক্যাণ্টনীয় আইন সভা রাজ্য পরিষদীয় প্রতিনিধিদের নির্বাচন করেন। অধিকাংশ ক্যাণ্টনে রাজ্যপরিষদীয় প্রতিনিধিগণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সদস্যদের কার্যকাল এক, দুই, তিন বা চার বৎসর পর্যন্ত স্থির হইয়াছে—এক এক ক্যাণ্টনে এক এক নিয়ম। দুইটি ক্যাণ্টনে রাজ্য পরিষদীয় প্রতিনিধিদিগের কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই ক্যাণ্টনীয় আইন সভার প্রত্যাহার আজ্ঞা (Recall) দ্বারা কার্যকাল শেষ করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

রাজ্যপরিষদ ও জাতীয় পরিষদ সম্বন্ধে আর একটি লক্ষণীয় ব্যবস্থার উল্লেখ প্রয়োজন। ইহা জাতীয় পরিষদ সম্পর্কেও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সংবিধানের ৮৭ ধারায় এইরূপ লিখিত আছে : "The attendance of an absolute majority of the total number of its members is necessary for the valid transaction of business of either Council." সুতরাং আইনত রাজ্য-পরিষদের অন্ততঃ ২৩ জনের উপস্থিতি অপরিহার্য। জাতীয় পরিষদেও তেমনি ১৯৬ জন সদস্যের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ৯৯ জনের উপস্থিতি আইনতঃ আবশ্যক। নতুবা বিধানমণ্ডলীর কোন সভাই কোন কার্য বৈধভাবে সম্পাদন করিতে পারে না।

জাতীয় পরিষদ ও রাজ্য পরিষদের সম্পর্ক : জাতীয় পরিষদ ও রাজ্যপরিষদ সংবিধান অনুসারে সমান ক্ষমতাধিকারী। এমন কি আয়ব্যয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়নেও দুই পরিষদের ক্ষমতার কোন পার্থক্য নাই। এই বিষয়ে Strong নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন : "Swiss Legislative like the

Swiss executive is unique ; it is the only legislature in the world the functions of whose Upper House are in no way differentiated from those of the lower." যে কোন আইনের প্রস্তাব উচ্চতর বা নিম্নতন পরিষদে আনয়ন করা যাইতে পারে। আইন পাস করিতে হইলে উভয় পরিষদেরই সম্মতি প্রয়োজন। দুই পরিষদে মতদ্বৈধ হইলে যুক্ত কমিটির মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। মতৈক্য না হইলে প্রস্তাবিত আইনটি বাতিল হইয়া যায়। অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার লইয়া মতবিরোধ উপস্থিত হইলে দুই পরিষদের যুক্ত বৈঠকেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এইরূপ deadlock বা অচলাবস্থা সুইটজারল্যাণ্ডের রাজনীতিতে কখনই ঘটে না। যুক্ত বৈঠকের অধিবেশনে জাতীয় পরিষদের প্রভাবই বলবৎ হইবার সম্ভাবনা, কারণ তাহার সদস্য সংখ্যা ১৯৬, রাজ্যপরিষদের মাত্র ৪৪।

জাতীয় পরিষদ ও রাজ্যপরিষদে আইন প্রণয়নের নিয়মাবলী (Legislative Procedure) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর দুইটি পরিষদই সমক্ষমতা-সম্পন্ন। যে কোন আইন যে কোন পরিষদে উত্থাপন করা চলে। একটি পরিষদ উহা পাস করিলে অন্য পরিষদে পুনর্বার আলোচনা ও পাস করার নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। প্রতি অধিবেশনের পূর্বে দুইটি পরিষদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে কাজের ভাগাভাগি হইয়া যায়। (ক) যদি কোন সদস্য কোন আইন উত্থাপন করেন তাহা হইলে সর্ব প্রথম তাহার আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে জাতীয় পরিষদ ও রাজ্য-পরিষদ আলোচনা করে। যদি দুইটি পরিষদই এই স্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করে তাহা হইলে মন্ত্রিপরিষদকে ঐ আইনের খসড়া প্রস্তুত করিতে বলা হয়। বিধানমণ্ডলীর আলোচনার আলোকে মন্ত্রিপরিষদ খসড়াটি প্রস্তুত করেন এবং পরে দুইটি পরিষদে আলোচনা হয়। দুইটি পরিষদ গ্রহণ করিলে তবে আইনটি পাস হইতে পারে। (খ) যদি মন্ত্রিপরিষদ কোন আইন উত্থাপন করিতে চান, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি উহা প্রস্তুত করিয়া বিধানমণ্ডলীতে পেশ করিতে পারেন। ঐরূপ আইনের খসড়া প্রতি পরিষদে আলাদাভাবে আলোচনা করিয়া পাস করিতে হয়। (গ) আয়ব্যয় সম্বন্ধে যাবতীয় আইন কেবল শাসন বা মন্ত্রিপরিষদই উত্থাপন করিতে পারেন। (ঘ) উপরোক্ত প্রায় সকল আইন সম্বন্ধেই আর একটি নিয়ম প্রযুক্ত হয়। প্রায় সকল আইনই পরিষদ কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং কমিটির রিপোর্ট পরিষদে পেশ করিতে হয় এবং তাহার উপর আলোচনা চলে। আলোচনার পর আইন গৃহীত বা অগ্রাহ্য হয়।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর দুইটি কক্ষকে সংবিধান আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমান অধিকার দিয়াছে। এই জন্য দুই পরিষদে মত বিরোধ হইলে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় (এই পরিচ্ছেদের জাতীয় পরিষদ শীর্ষক আলোচনার ১১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Federal Tribunal)

১৮৭৪ সালে সুইটজারল্যাণ্ডে যে সংবিধান গ্রহণ করিয়াছে তাহার দ্বারাই ঐ দেশে সর্বপ্রথম যুক্ত রাষ্ট্রীয় আদালত বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার পূর্বে অর্থাৎ ১৮৪৮ সালের সংবিধানে যে ব্যবস্থা ছিল তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সমশ্রেণীর নহে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের ক্ষমতা সাধারণভাবে সংবিধানের ১০৬ ধারায় লিখিত হইয়াছে: "The Federal Tribunal is established for the administration of Justice in Federal matters." অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিচার ক্ষমতা এই আদালতের হাতে থাকিবে। সংবিধানের ব্যাখ্যা ও তদনুযায়ী বিচার ব্যবস্থার ক্ষমতা এই বিচারালয়ের নাই। ইহা ব্যতীত বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত আইনের উপরও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের ক্ষমতা নাই। তথাপি এই আদালতটির ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত এবং ইহা সুইটজারল্যাণ্ডের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

দেওয়ানী ক্ষমতা

(ক) প্রথমতঃ সংবিধানের ১১০ ধারা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যান্টনের মধ্যে এবং এক ক্যান্টন ও অপর ক্যান্টনের মধ্যে বিরোধ সম্বন্ধীয় দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের মামলার মূল্য যদি ৪০০০ ফ্র্যাঙ্ক বা ততোধিক হয় তাহা হইলে সেই মামলা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বিচার করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ ক্যান্টন এবং কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মামলার মূল্য যদি ৪০০০ ফ্র্যাঙ্কের বেশি হয় তাহা হইলেও যে কোন পক্ষের আবেদন সাপেক্ষে সেই মামলা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের এক্তিয়ার ভুক্ত হয়। ইহা ব্যতীত কপিরাইট, দেউলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য, পেটেন্ট প্রভৃতি

বিষয়ক মামলার আপীল আদালত হিসাবে এই বিচারালয়টি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

(খ) সংবিধানের ১১২ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী মামলা বিভাগে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে :

ফৌজদারী ক্ষমতা
Criminal
Jurisdiction

(১) দেশদ্রোহিতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সহিংস বিদ্রোহ ;

(২) আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গ বিষয়ক অপরাধ ;

(৩) যে সকল সাধারণ অপরাধ বা রাজনৈতিক অপরাধ দমনকল্পে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদল নিযুক্ত করিতে হয় তাহার বিচার ;

(৪) কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যদি তাহার অধীনস্থ কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাহা হইলে সেই মোকদ্দমা বিচারের ক্ষমতা।

(গ) তৃতীয়তঃ শাসন পদ্ধতিমূলক নিম্নলিখিত ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে :

শাসনব্যবস্থামূলক ক্ষমতা
Constitutional
Jurisdiction

(১) যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ক্যাণ্টনের "Conflict of Jurisdiction" বা এক্তিয়ারের পরিসর লইয়া বিরোধ সম্বন্ধীয় মামলা।

(২) শাসন-আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্যাণ্টনের সহিত ক্যাণ্টনের বিরোধ বিষয়ক মামলা।

(৩) নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ।

(৪) কোন ব্যক্তি কর্তৃক আনীত সন্ধি বা চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা।

উপরের ক্ষমতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের Appellate ও Original—দুই প্রকার ক্ষমতাই রহিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা আপীল শুনিতে পারেন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রথম শুনানীর আদালত হিসাবেও ইহারা কাজ করিবার অধিকারী।

সংবিধানের ১০৭ ধারা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে বিচারপতি নির্বাচনের সময় বিধানমণ্ডলীকে দেখিতে হইবে যে সুইটজারল্যাণ্ডের তিনটি জাতীয় ভাষাভাষী ব্যক্তিগণ বিচারকমণ্ডলীতে থাকেন। বিচারপতিগণ তাঁহাদের কার্যকালে অন্য কোন কর্মে লিপ্ত হইতে পারেন না। জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে হইলে আইনত যে সকল গুণ থাকা

প্রয়োজন সেই সকল গুণ থাকিলেই কোন ব্যক্তি বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারেন। বলা বাহুল্য আইনে পারদর্শী, সৎব্যক্তি ব্যতীত কেহই এই পদে নির্বাচিত হন না। বিচারপতিগণের সংখ্যা, কার্যকাল ও বেতনাদি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী আইন মারফত স্থির করেন।

সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে বিচারপতির সংখ্যা ২৭ হইতে ২৮। ১১ হইতে ১৩ জন বিকল্প বিচারপতি (alternate or supplementary judges) আছেন। ইঁহাদের কার্যকাল ৬ বৎসর। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী বিচারপতি ও বিকল্প বিচারপতিগণকে নির্বাচিত করেন। বিধানমণ্ডলী বিচারপতিগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি ২ বৎসরের জন্য নির্বাচন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তাহারা নয় জন উপদেষ্টা (Assessors) ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারে সাহায্য করিবার জন্য একটি জুরিদলও নির্বাচন করেন।

আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত : ১৮৭৪ সালে সংবিধান গ্রহণের সময় আমেরিকার সুপ্রীমকোর্টের কতকটা অনুকরণে, সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিধি সমূহ রচিত হয়। কিন্তু সুপ্রীমকোর্টের সহিত সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। (১) প্রথমত: সুইটজারল্যাণ্ডের আদালতটির কোন শাখা নাই। ইহা এক এবং অদ্বিতীয়। সুপ্রীমকোর্টের শাখা বা অধীনস্থ আদালত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গ রাজ্যেই রহিয়াছে। (২) সুপ্রীমকোর্টের রায় ও নির্দেশ কার্যকর করিবার জন্য সুপ্রীমকোর্টের অধীনে পৃথক কর্মচারিবৃন্দ রহিয়াছে; কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের আদালতটির আদেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর মাধ্যমে ও ক্যাণ্টনীয় সরকারের সাহায্যে কার্যে পরিণত করিতে হয়। (৩) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীমকোর্ট কংগ্রেসকৃত বা কোন রাজ্য বিধান-মণ্ডলীকৃত যে কোন আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, যদি সুপ্রীমকোর্ট মনে করে যে ঐ আইন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্যহীন। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের এইরূপ বিপুল ক্ষমতা নাই। তাহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান-মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত সকল আইন এবং সংবিধান অনুযায়ী গঠিত হুকুমনামা মানিতে বাধ্য। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের এই আদালত যদি মনে করেন যে কোন ক্যাণ্টনীয় আইন সংবিধানকে লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহা হইলে সেই ক্যাণ্টনীয় আইন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। (৪) আমেরিকার

সুপ্রীমকোর্টের আর একটি ক্ষমতা এই যে, এই বিচারলয়টি সংবিধানের প্রামাণিক ভাষ্য (Interpretation) করিবার অধিকারী। এই অধিকার সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধান অনুযায়ী সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীকে দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের কোন ক্ষমতা নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে Federal Court বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের পূর্ণ ক্ষমতা সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে দেওয়া হয় নাই। মারবেরী বনাম ম্যাডিসন (Marbury vs Madison) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মামলার রায়ের মধ্য দিয়া আমেরিকার সুপ্রীমকোর্ট যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের ভাষ্য ও তদনুসারে সংবিধানের বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সে ক্ষমতা নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুইটজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democrarcy): Referendum (গণভোট) Initiative (গণ-উদ্যোগ) ও Recall (প্রত্যাহার আজ্ঞা)

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র : সুইটজারল্যাণ্ডের জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে আইন প্রণয়ন ও শাসননীতি নির্ধারণ, ঐ দেশের একটি প্রাচীনকালাগত প্রথা। Lands-gemindo বা গণ-সভার পুরাতন ঐতিহ্য সুইটজারল্যাণ্ডে এখনও জীবিত রহিয়াছে। গণ-সভা সমস্ত নাগরিকগণের সমাবেশ। এই সমাবেশে সুইটজারল্যাণ্ডের কতকগুলি ক্যাণ্টনে আইন প্রণীত হইত ও শাসননীতি স্থিরীকৃত হইত। এখনও এ্যাপেনজেল, আণ্টারওয়াল্‌ডেন ও গ্লেরিয়াস্ নামক ক্যাণ্টনে প্রাচীন Lands-gemindo বা গণসভা পূর্বের ন্যায় আইন প্রণয়ন ও শাসনব্যবস্থা চালাইয়া যাইতেছে। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে গণসভাগুলি যোগ্যতার সহিত তাহাদের কর্তব্য সম্পন্ন করিতেছে।

অন্যান্য ক্যাণ্টনে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাও প্রতিনিধিমূলক। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে গণভোট, গণ-উদ্যোগ এবং

দু-চারটি ক্ষেত্রে প্রত্যাহার আজ্ঞা প্রচলিত আছে। এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে সুইটজারল্যাণ্ডে এক হিসাবে "মিশ্র গণতন্ত্র" বিদ্যমান। কারণ নাগরিকগণের মতামত শুধু প্রতিনিধিমূলক আইন সভাগুলির মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় না; জন সাধারণ প্রত্যক্ষ ভাবে আপন মতামত প্রকাশ করিয়া গণতন্ত্রকে সার্থক ও সফল করিয়া তোলেন। ব্রাইস তাঁহার Modern Democracies গ্রন্থে তাই সুইস গণতন্ত্রের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় গণভোটঃ গণ-ভোটের নিয়মানুযায়ী কোন সাংবিধানিক পরিবর্তন বা কোন আইন আইনসভার প্রথানুযায়ী গৃহীত হইবার পর নাগরিকদের মতামত প্রকাশের জন্য ভোটে দেওয়া হয়। অধিকাংশ ভোটদাতা অথবা অবস্থাবিশেষে নাগরিকগণের অধিকাংশ প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলে তাহা পাস হইয়া যায়, গ্রহণ না করিলে বাতিল হয়।

দুই প্রকারের গণভোট আছে—বাধ্যতামূলক গণভোট (Compulsory Referendum) ও ইচ্ছাধীন গণভোট (Optional Referendum)।

Compulsory Referendum (বাধ্যতামূলক গণভোট) বা Constitutional Referendum (সাংবিধানিক গণভোট)

১। **বাধ্যতামূলক গণভোট**: যুক্তরাষ্ট্রীয় ও ক্যাণ্টনীয় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক গণভোটের বিধি রহিয়াছে। (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সংশোধন প্রথমতঃ সাধারণ আইনের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী (অর্থাৎ জাতীয় পরিষদ ও রাজ্য পরিষদ) কর্তৃক গৃহীত হইবে; পরে তাহা নাগরিকদের নিকট গণভোটের জন্য প্রেরিত হইবে। যদি অধিকাংশ নাগরিক সমর্থন করেন এবং অধিকাংশ ক্যাণ্টনও সংশোধন মানিয়া লন তাহা হইলে সংশোধক প্রস্তাব পাস হইয়া যায়। কিন্তু যদি জাতীয় পরিষদ ও রাজ্য পরিষদে মতদ্বৈধ হয় তাহা হইলে সাংবিধানিক পরিবর্তন নাগরিকগণ ইচ্ছা করেন কিনা, এই সাধারণ প্রস্তাবটি গণভোটে দেওয়া হয়। যদি অধিকাংশ ভোটদাতা পরিবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিধানমণ্ডলীর কার্যকাল শেষ করিয়া দেওয়া হয় এবং বিধানমণ্ডলীর নূতন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নূতন বিধানমণ্ডলী পুনরায় বিশেষ সংশোধনটি আলোচনা করেন এবং উহা গৃহীত হইলে সংশোধনটি গণভোটে দেওয়া হয়। তখন যদি অধিকাংশ নাগরিক এবং অধিকাংশ ক্যাণ্টন সংশোধন সমর্থন করেন তাহা হইলে প্রস্তাবটি পাস হইয়া যায়।

২। **ইচ্ছাধীন গণভোট :** সংবিধানিক সংশোধনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক গণভোটের বিধি আছে। ইহা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্যান্য আইন সম্বন্ধে গণভোটের ব্যবস্থা আছে। (Legislative Referendum) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সাধারণ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার ৯০ দিনের মধ্যে যদি ৩০,০০০ নাগরিক অথবা ৮টি ক্যাণ্টন গণভোট দাবি করে তাহা হইলে ঐ আইনটি গণভোটে দেওয়া হয়।

(Optional Referendum (ইচ্ছাধীন গণভোট) বা Legislative Referendum (সাধারণ আইন সংক্রান্ত গণভোট)

গণভোট সম্বন্ধে ব্যতিক্রম (Exception) : যুক্তরাষ্ট্রীয় গণভোট সম্বন্ধে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণ আইনের সকল ক্ষেত্রেই গণভোট ব্যবস্থা প্রযোজ্য নহে। যদি কোন আইন কোন বিশেষ বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রণীত হইয়া থাকে অর্থাৎ উহা যদি সাধারণ ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকগণ বা সকল ক্যাণ্টনগুলির উপর প্রযুক্ত না হয়, কিম্বা যদি উক্ত আইনটি কোন জরুরী ব্যাপার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা হইলে গণভোটের কথা উঠিতে পারে না। কোন একটি আইন সাধারণ ভাবে নাগরিকবৃন্দ বা ক্যাণ্টনগুলির উপর প্রযুক্ত হইবে বলিয়া প্রণীত হইয়াছে কিনা, অথবা আইনটি জরুরী কিনা তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীই স্থির করিবে। দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেট বা কোন আদেশও (decree) গণভোটসাপেক্ষ নহে। তৃতীয়তঃ ১৯২১ সালের পূর্বে আন্তর্জাতিক সন্ধি গণভোটে দেওয়ার নিয়ম ছিল না। ১৯২১ সালের সংবিধান সংশোধনের পর স্থির হইয়াছে যে একেবারে স্থায়ী বা পনের বৎসরের অধিককাল স্থায়ী যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্বন্ধে গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে যদি ৩০,০০০ নাগরিক বা অন্ততঃ ৮ টি ক্যাণ্টন তাহা দাবি করে।

ক্যাণ্টনীয় গণভোট : ক্যাণ্টনের সংবিধান সংশোধনের কালে গণভোট অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক। ইহা ব্যতীত সকল ক্যাণ্টনেই সাধারণ আইন সম্বন্ধে গণভোটের ব্যবস্থা আছে। অনেক ক্যাণ্টনেই তাহা ইচ্ছাধীন গণভোট। এই সকল ক্যাণ্টনে নির্দিষ্ট সংখ্যক (ক্যাণ্টন ভেদে সংখ্যা বিভিন্ন) নাগরিকবৃন্দের স্বাক্ষরিত দরখাস্ত হস্তগত হইলে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি ক্যাণ্টনে সাধারণ আইনও বাধ্যতামূলক গণভোটসাপেক্ষ। অধিকাংশ ক্যাণ্টনে অস্থায়ী আইন বা কোন বিশেষে অবস্থায় গৃহীত জরুরী আইনের জন্য গণভোটের আবশ্যকতা নাই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় গণউদ্যোগ : সুইটজারল্যাণ্ডের নাগরিকবৃন্দ মনে করেন যে কেবল মাত্র বিধান পরিষদগুলিরই আইন প্রণয়নের অধিকার থাকা উচিত নহে ;

জনসাধারণই গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের অধিকারী সুতরাং তাহাদেরও এই ক্ষমতা না থাকিলে গণতন্ত্র বৃথা হইয়া যায়। এই কারণে সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় গণ-উদ্যোগ একটি বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে।

গণ-উদ্যোগের দ্বারা দুই প্রকারে সংবিধানকে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করা সম্ভব (১) সংবিধানের সামগ্রিক পরিবর্তন (২) সংবিধানের আংশিক পরিবর্তন। সংবিধানের ১২০ ধারায় লিখিত হইয়াছে যে ৫০,০০০ নাগরিকগণ দরখাস্ত করিয়া উহার সামগ্রিক সংশোধন দাবি করিতে পারে। সামগ্রিক পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় কি না কেবল এই বিষয়টি বিবেচনা করিবার জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। যদি অধিকাংশ নাগরিক ইচ্ছা প্রকাশ করে যে সামগ্রিক সংশোধন বাঞ্ছনীয় তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর দুইটি কক্ষেরই পুনর্নির্বাচন হয়। তাহার পর নূতন বিধানমণ্ডলী সংশোধনের প্রস্তাব আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যদি উহারা সামগ্রিক সংশোধন গ্রহণ করে তবে পুনরায় তাহা গণভোটের জন্য পাঠান হয়। যদি অধিকাংশ নাগরিক এবং অধিকাংশ ক্যাণ্টন ইহা গ্রহণ করে তাহা হইলে সংবিধানের সংশোধন পাকা হইয়া যায়। সংবিধানের ১২১ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে ৫০০০০ নাগরিক দরখাস্ত করিয়া সংবিধানের আংশিক সংশোধন কামনা করিতে পারে। (ক) যদি ৫০০০০ নাগরিক কোন বিশেষ সংশোধন উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে প্রস্তাব করে যে কোন ধারার সংশোধন অথবা একটি নূতন ধারা সংযোজন বাঞ্ছনীয় তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী সম্মত হইলে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংশোধন বা সংযোজনটি আইন আকারে প্রস্তুত করিয়া জনগণের ও ক্যাণ্টন সমূহের ভোটের জন্য প্রেরণ করা হয়। গণভোটে যদি অধিকাংশ নাগরিক ও অধিকাংশ ক্যাণ্টন উহা সমর্থন করেন, তাহা হইলে পরিবর্তন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হয়। যদি বিধানমণ্ডলী গণ-উদ্যোগের সহিত একমত না হইতে পারেন, তাহা হইলে সংশোধনটি সাধারণ ভাবে গ্রহণযোগ্য কি না—তাহারা এই বিষয়টি গণভোটে প্রেরণ করেন। যদি অধিকাংশ নাগরিক সাধারণভাবে বলেন যে সংশোধন কাম্য তাহা হইলে বিধানমণ্ডলী তদনুযায়ী সংশোধক আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রণীত সংশোধক গণভোটে দেন। (খ) যদি ৫০০০০ নাগরিক গণউদ্যোগের মারফত সংবিধানের আংশিক সংশোধনের একটি বিল পাঠাইয়া দেন এবং বিধানমণ্ডলী যদি গণ-উদ্যোগের সহিত একমত হয়, তাহা হইলে সেই বিলটি সরাসরি গণভোটে নাগরিক-বৃন্দ ও ক্যাণ্টনগুলির নিকট পাঠানো হয় এবং তাহাদের অধিকাংশ বিলটি গ্রহণ

করিলে তাহা আইনে পরিণত হয়। যদি বিধানমণ্ডলী গণ-উদ্যোগের সহিত একমত না হইতে পারেন, তাহা হইলে বিধানমণ্ডলী নাগরিক ও ক্যাণ্টনগুলির নিকট ঐ বিলটি ভোটের জন্য পাঠাইয়া সুপারিশ করিতে পারেন যে বিলটি জনগণের অগ্রাহ্য করা উচিত। কিম্বা বিধানমণ্ডলী নিজেরাই একটি বিল প্রস্তুত করিয়া তাহাদের বিল ও গণউদ্যোগীয় বিল একই সঙ্গে গণভোটে পাঠাইয়া সুপারিশ করেন যে গণ-উদ্যোগীয় বিলটি অগ্রাহ্য ও তাহাদের বিলটি গৃহীত হউক। এই ক্ষেত্রেও অধিকাংশ নাগরিক ও অধিকাংশ ক্যাণ্টনের সম্মতি প্রয়োজন।

ক্যাণ্টনের গণউদ্যোগ: ক্যাণ্টনীয় গণউদ্যোগের ব্যবস্থাও অনেকটা অনুরূপ। এখানেও নির্দিষ্ট সংখ্যক (ক্যাণ্টন ভেদে সংখ্যার বিভিন্নতা আছে) নাগরিক ক্যাণ্টনীয় সংবিধানে সামগ্রিক বা আংশিক সংশোধন দাবি করিতে পারেন। প্রস্তাবিত পরিবর্তন গৃহীত হইতে হইলে উভয় ক্ষেত্রেই অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন প্রয়োজন।

সাধারণ আইনের ব্যাপারেও ক্যাণ্টনে গণউদ্যোগের ব্যবস্থা আছে। এই স্থলেও নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিকগণের দাবির ভিত্তিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। (ক) প্রথমতঃ নাগরিকগণ প্রস্তাব করিতে পারেন যে বিশেষ একটি আইন গণভোটে দেওয়া হউক। তাহা হইলে ঐ আইন সম্বন্ধে গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে। নাগরিকগণ একই ভাবে প্রস্তাব করিতে পারেন যে একটি নূতন আইন বিধিবদ্ধ হউক। এই প্রস্তাবটি সাধারণ ভাবে আসিতে পারে, বা নাগরিকগণ একটি বিল প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারেন। (খ) যদি সাধারণ ভাবে আসে তাহা হইলে ক্যাণ্টনীয় পরিষদ ঐ সাধারণ প্রস্তাবটি গণভোটে দিবেন। যদি ভোটদাতাদের অধিকাংশ সাধারণ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন তাহা হইলে ক্যাণ্টনীয় পরিষদ প্রস্তাবানুযায়ী বিল প্রস্তুত করিয়া গণভোটে পাঠাইবেন। অধিকাংশ ভোটদাতার সমর্থন এখানে অপরিহার্য। (খ) কিন্তু যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিকগণ একটি বিল প্রস্তুত করিয়া ক্যাণ্টনীয় পরিষদকে পাঠাইয়া দেন, তবে পরিষদ তাহা গণভোটে পাঠাইয়া সুপারিশ করিতে পারেন যে উহা অগ্রাহ্য করা হউক। কিম্বা তাহারা নিজেরাই একটি বিল প্রস্তুত করিয়া গণ উদ্যোগীয় বিল ও তাহাদের বিল একই সঙ্গে গণভোটে দিতে পারেন এবং সুপারিশ করিতে পারেন যে পরিষদীয় বিলটি গৃহীত হউক এবং গণ উদ্যোগীয় বিল অগ্রাহ্য করা হউক। এখানেও অধিকাংশ ভোট দাতার সমর্থন আবশ্যক।

প্রত্যাহার আজ্ঞা: পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কোন কোন ক্যাণ্টনীয়

পরিষদ ইচ্ছা করিলে তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত রাজ্য পরিষদে সদস্যের কার্য কালের অবসান করাইতে পারেন।

সুইটজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য: সুইটজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এই গণতান্ত্রিক ধারাটি বরাবর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সেইজন্য ঐদেশে নাগরিকগণের গণতন্ত্র, বিশেষতঃ আইন প্রণয়নের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত থাকিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃই প্রবল। সুইস্ নাগরিকগণের এই মনোভাবের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের তুলনা করা যাইতে পারে। আমেরিকার প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের দুর্নীতি ও অন্যান্য নানা দোষ লক্ষ্য করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দিকে কোন কোন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনগণ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডে এই নেতিবাচক মনোভাব হইতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র শক্তিলাভ করে নাই। দেশের পুরাতন ঐতিহ্য, গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণাই ঐদেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে মর্যাদা দিয়াছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র দোষ হীন নহে।* কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র লক্ষণীয় সাফল্য লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক মানরো বলিতেছেন: "The advantages of direct legislation in Switzerland far outweigh its defects." ১৮৪৮ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ১৩৯টি গণভোট অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬৫ বার নাগরিকগণ সমর্থনসূচক ভোট দিয়াছেন, ৭৪ বার তাহারা প্রস্তাবিত বিষয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নাগরিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধীর বুদ্ধি ও রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। জটিল বিলগুলি ও ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাবগুলি তাহারা সাধারণতঃ মানিয়া লইতে চান নাই। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে গণভোট ও গণউদ্যোগ সুইটজারল্যাণ্ডের গণতন্ত্রকে দুর্বল না করিয়া বরং সংহত ও শক্তিশালী করিয়াছে। সুইটজারল্যাণ্ডের জনসাধারণ প্রাগ্রসর গণতন্ত্রের নাগরিক বটে, কিন্তু তাহারা সুস্থ রক্ষণশীলতা ও অগ্রগামী গণতান্ত্রিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিয়াছে। সুইস্ নাগরিকগণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তাহারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাই অন্ধের ন্যায় তাহারা দলীয় হুকুম তামিল করিবার জন্য ব্যগ্র নহেন। তাই তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ভাবে গণভোট ও গণ-উদ্যোগের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন। অবশ্য সুইটজারল্যাণ্ডের নাগরিকগণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্যের আর একটি কারণ। সুইটজারল্যাণ্ড

---

* এই বিষয়ে গ্রন্থকারদ্বয় প্রণীত 'আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের' দ্বিতীয় খণ্ডের ৪১-৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বাসীর আর একটি বিশেষত্ব এই যে তাহারা ভাববিলাসী বা ভাবপ্রবণ নহেন, তাই স্থিরমস্তিষ্কে তাহারা আপনাপন রাজনৈতিক ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে পারেন। এই গুণটি সুইটজারল্যাণ্ডের নাগরিকগণকে গণভোট গণ-উদ্যোগের ন্যায় প্রথাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করিতে সহায়তা করিয়াছে। সর্বশেষে ইহাও উল্লেখনীয় যে সুইটজারল্যাণ্ডের মানুষের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। অর্থসমস্যা সুইটজারল্যাণ্ডবাসীকে চরম বা গরম পন্থায় পরিচালিত করে নাই। সেখানে শ্রেণীসংগ্রামও সমস্যার আকারে দেখা দেয় নাই। তাই অপেক্ষাকৃত সুখী সুইস্‌গণ প্রশংসনীয় কৌশলের সহিত গণতন্ত্রকে প্রগতিশীল অথচ সুস্থপথে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক দল

সুইটজারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক দলের ইতিহাস ১৮৪৮ সাল হইতে সুরু হইয়াছে। ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পার্থক্য হেতু ঐ সময় প্রটেষ্টাণ্ট জার্মান ও প্রটেষ্টাণ্ট ফরাসী—এই দুইটি দলের উদ্ভব হয়। ইহারা যথাক্রমে উদারনৈতিক (Liberal) ও আমূল পরিবর্তনকামী বা চরমপন্থী (Radical)—এই দুই নামে পরিচিত হইতে থাকে। উদারনৈতিকেরা নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করে। চরমপন্থী বা র্যাডিক্যালরা প্রাগ্রসর গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মতপার্থক্য সত্ত্বেও এই দুইটি দল ১৮৭৪ সালের সাংবিধানিক পরিবর্তনের সময় একযোগে কাজ করিয়াছিলেন। এই দুইটি দলেরই বিরুদ্ধবাদী আর একটি দলেরও সূত্রপাত হয় ১৮৪৮ সালের কিছু পূর্বে ১৮৪৫ সালে। ঐ বৎসর ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী ক্যাণ্টনগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পরবর্তী গৃহযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ১৮৪৮ সালের সংবিধানানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। ইহারা পরবর্তীকালে রক্ষণশীল নামে পরিচিত হয়। এই দলটি ক্যাণ্টনীয় স্বাধিকারে ও ক্যাথলিকদের ধর্মমত সম্বন্ধীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। ১৮৪৮ সাল

হইতে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত উদারনৈতিক ও চরমপন্থীগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং রক্ষণশীলদল বিরোধী পক্ষে ছিল। ১৮৯১ সালে যখন রক্ষণশীল ও চরমপন্থীগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইল তখন উদারনৈতিকেরা বিরোধী পক্ষে থাকিতে বাধ্য হন। উদারনৈতিকগণের ক্ষমতা বিশেষ হ্রাস পায়। অন্যদিকে ১৮৮০ সাল নাগাদ সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভব ঘটে এবং উদারনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় এই নূতন দলটি ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর কৃষির ক্ষেত্রে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়; ইহার ফলে ১৯১৮ সালে কৃষক দল গঠিত হয় এবং শীঘ্রই একটি সুগঠিত দলে পরিণত হয়।

দলীয় কর্মসূচী: (১) আধুনিক দলগুলির মধ্যে ক্যাথলিক রক্ষণশীলদল ক্যাণ্টনের স্বার্থ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবারের পবিত্রতা, সমবায় প্রথা, ক্যাথলিকদিগের ধর্ম ও সামাজিক অধিকার, সামাজিক শান্তি ও গীর্জা কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। এই দলের একটি সমাজতান্ত্রিক শাখা আছে; তাহার প্রভাবে ক্যাথলিক রক্ষণশীল দল শ্রমিকগণের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। (২) চরমপন্থী (Radical) দল ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, গণভোট, গণ-উদ্যোগ প্রভৃতিতে বিশ্বাসী। ইহারা আমদানীর উপর উচ্চ শুল্ক ধার্য করিতে ও কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকারী একচেটিয়া ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী। (৩) কৃষকদল কৃষিপণ্যের উচ্চ মূল্য ধার্য করা, কৃষকদিগকে সরকারী সাহায্যদান প্রভৃতি কৃষি উন্নতিমূলক আইন প্রবর্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহারা মোটের উপর রক্ষণশীলতায় বিশ্বাসী। (৪) সমাজতান্ত্রিকদল আদৌ বিপ্লবী নহে। ইহারা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পার্লামেণ্ট মূলক ব্যবস্থার সমর্থক। তবে ইহারা আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন এবং ব্যাঙ্ক প্রভৃতি জাতীয়করণের পক্ষপাতী।

ইহা ব্যতীত সুইটজারল্যাণ্ডে কমিউনিষ্ট দল, শ্রমিক দল, জাতীয় ফ্রণ্ট, জাতীয় লীগ, কৃষক লীগ প্রভৃতি কয়েকটি ছোট দল রহিয়াছে। উদারনৈতিক দল এক সময় শক্তিশালী ছিল কিন্তু আজ তাহারা একেবারেই নগণ্য।

সুইটজারল্যাণ্ডের রাজনীতিতে দলের অবস্থা: যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ দুইটির, ক্যাণ্টনীয় পরিষদের ও স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন দলের ভিত্তিতেই হইয়া থাকে। তথাপি দলীয় রাজনীতির প্রভাব কোন দেশেই সুইটজারল্যাণ্ডের ন্যায় এত নগণ্য নহে।

সুইটজারল্যাণ্ডে ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পার্থক্য বিদ্যমান। তথাপি এখানে দলীয় দ্বন্দ্ব, দলীয় প্রতিযোগিতা ও হিংসা বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার কতকগুলি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, মনে রাখা প্রয়োজন যে দলীয় স্বার্থের জন্যই দলগত কোন্দল, দুর্নীতি ও অসাধুতা রাজনীতিকে কলুষিত ক'রে। দলগুলি নির্বাচনে জয়লাভ করিলে যদি ক্ষমতা ও লাভজনক পদ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে দলগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় এবং যেন তেন প্রকারেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করে। সুইটজারল্যাণ্ডের সরকারী পদগুলির—তাহা ক্যাণ্টনেই হউক বা যুক্তরাষ্ট্রেই হউক, বেতন প্রভৃতি খুব আকর্ষণীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ চিরাচরিত রীতি অনুসারে কোন দল কর্তৃক মনোনীত বলিয়া বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নিযুক্ত হন না। তাহারা সৎ, অভিজ্ঞ ও কর্মকুশলী বলিয়াই ঐ পদগুলিতে নিয়োজিত হন এবং তাহারা জাতীয় স্বার্থে বৎসরের পর বৎসর ঐ পদে নিযুক্ত হইতে থাকেন। তৃতীয়তঃ, ঐ পদগুলি পূর্ণ করিবার সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী সতর্কতার সহিত বিভিন্ন ক্যাণ্টন হইতে এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিবর্গকে ঐ পদগুলিতে নির্বাচন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দলগত ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা মারফত ঐ পদগুলি দখল করিবার সুযোগ নাই বলিলেই চলে। ইহার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বা যুক্তরাজ্যের দলগুলির ন্যায় সুইটজারল্যাণ্ডের দলগুলি তেমন সুসম্বদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে না। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণ দলগত ভাবে তাহাদের পরিষদ দুইটিতে না বসিয়া ক্যাণ্টনগত ভাবে বসিয়া থাকেন এবং অনেক সময়ই জাতীয় স্বার্থে পরিষদদ্বয়ে আনীত প্রস্তাবাদির উপর ভোট দিয়া থাকেন। এইরূপ আচরণ একপ্রকার প্রথাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদদ্বয়ের অভ্যন্তরে দলীয় সংগঠন আছে বটে কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পঞ্চমতঃ, দলগুলি ভাষা, ঐতিহ্য ও বংশগত (Racial) বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হয় নাই। রাজনৈতিক একাত্মতা তাহার ভিত্তি সেই জন্যও দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হইয়া উঠিতে পারে না। ষষ্ঠতঃ, গণভোট গণ-উদ্যোগ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নিয়মাদি সুইস্ গণতন্ত্রে বিশেষ সক্রিয়। অর্থাৎ আইনসভার একাধিপত্য সুইটজারল্যাণ্ডে নাই বলিলেই চলে। সেই কারণেও দলগত সংগঠন দানা বাঁধিতে পারে না। দেশপ্রেমিক সাধারণ নাগরিক দলগত রাজনীতি দ্বারা আপনাকে অন্যায় ভাবে প্রভাবিত হইতে দেন না।

তিনি সর্বদাই জাতীয় স্বার্থ দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থাকিয়া আপন নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করেন। এই জন্যও সুইজারল্যাণ্ডের দলাদলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া রহিয়াছে। সপ্তমতঃ, সুইটজারল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক। তাই রুজি-রোজগারের সংগ্রাম সেখানে তীব্র হইয়া উঠিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় দলীয় রাজনীতি জোরদার হইয়া উঠে না। সর্বোপরি সুইটজারল্যাণ্ডবাসীগণ ধীর-স্থির বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত। তাহারা ভাবপ্রবণ নহে। তাই দলীয় প্রচার তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। স্বাভাবিক কার্যকরী বুদ্ধি প্রয়োগে দলীয় ধাপ্পা সহজেই ধরিয়া ফেলেন। এই সকল কারণে সুইস্ দলগুলি সুইটজারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে অন্য রাষ্ট্রগুলির দলসমূহের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ঐ দেশে দলগত রাজনীতির সুবিধাগুলি আছে, অথচ তাহার দারুণ অসুবিধাগুলি পারিপার্শ্বিকের গুণে কমিয়া আসিয়াছে। এই জন্য অন্য সকল দেশ হইতে সুইটজারল্যাণ্ডে গণতন্ত্র প্রাগ্রসর হইয়াও বিপুল ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। ব্রাইস তাহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Modern Democracies-এ বলিয়াছেন যে গোঁড়া ও একগুঁয়ে দলীয় মনোভাব গণতন্ত্রের পরিপন্থী। দলীয় রাজনীতির এই দোষটি হইতে সুইটজারল্যাণ্ডের গণতন্ত্র অনেকাংশে মুক্ত।

পরিশিষ্ট (১)

সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনযন্ত্র (Executive)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ (Federal Council)

বিষয়	তথ্য
১। সংখ্যা	(১) ৭ জন
২। কার্যকাল	(২) ৪ বৎসর
৩। নির্বাচন পদ্ধতি	[৩] (ক) জাতীয় পরিষদ ও রাজ্যসভার যুক্ত-অধিবেশনে নির্বাচিত। (খ) একটি ক্যাণ্টন হইতে একাধিক ব্যক্তি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদে নির্বাচিত হইতে পারে না। (গ) এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। এই সভাপতি রাষ্ট্রপতি নামে পরিচিত। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই।
৪। বিশেষত্ব	[৪] (ক) বিভিন্ন দলীয় ব্যক্তি হইলেও একযোগে কাজ করে। (খ) বিধান-মণ্ডলী বা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের আজ্ঞা অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করে। (গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের কোন নীতি বা প্রস্তাবিত আইন বিধানমণ্ডলী বাতিল করিয়া দিলে, শাসন পরিষদ পদত্যাগ করে না। তাহারা বিধান-মণ্ডলী নির্দিষ্ট পথে আপনাদিগকে পরিচালিত করে। (ঘ) দুই পরিষদের যে কোন পরিষদে বক্তৃতা করিবার অধিকার শাসন পরিষদের সদস্যগণের রহিয়াছে। (ঙ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ বাজেট প্রস্তুত করে এবং দুই পরিষদে পেশ করিয়া থাকে।

পরিশিষ্ট (স্থ)

তিনি সর্বদাই জাতীয় স্বার্থ দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থাকিয়া আপন নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করেন। এই জন্যও সুইজারল্যাণ্ডের দলাদলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া রহিয়াছে। সপ্তমতঃ, সুইটজারল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক। তাই রুজি-রোজগারের সংগ্রাম সেখানে তীব্র হইয়া উঠিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় দলীয় রাজনীতি জোরদার হইয়া উঠে না। সর্বোপরি সুইটজারল্যাণ্ডবাসীগণ ধীর-স্থির বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত। তাহারা ভাবপ্রবণ নহে। তাই দলীয় প্রচার তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। স্বাভাবিক কার্যকরী বুদ্ধি প্রয়োগে দলীয় ধাপ্পা সহজেই ধরিয়া ফেলেন। এই সকল কারণে সুইস্ দলগুলি সুইটজারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে অন্য রাষ্ট্রগুলির দলসমূহের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ঐ দেশে দলগত রাজনীতির সুবিধাগুলি আছে, অথচ তাহার দারুণ অসুবিধাগুলি পারিপার্শ্বিকের গুণে কমিয়া আসিয়াছে। এই জন্য অন্য সকল দেশ হইতে সুইটজারল্যাণ্ডে গণতন্ত্র প্রাগ্রসর হইয়াও বিপুল ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। ব্রাইস তাহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Modern Democracies-এ বলিয়াছেন যে গোঁড়া ও একগুঁয়ে দলীয় মনোভাব গণতন্ত্রের পরিপন্থী। দলীয় রাজনীতির এই দোষটি হইতে সুইটজারল্যাণ্ডের গণতন্ত্র অনেকাংশে মুক্ত।

পরিশিষ্ট (১)

সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনযন্ত্র (Executive)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ (Federal Council)

বিষয়	তথ্য
১। সংখ্যা	(১) ৭ জন
২। কার্যকাল	(২) ৪ বৎসর
৩। নির্বাচন পদ্ধতি	[৩] (ক) জাতীয় পরিষদ ও রাজ্যসভার যুক্ত-অধিবেশনে নির্বাচিত। (খ) একটি ক্যাণ্টন হইতে একাধিক ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদে নির্বাচিত হইতে পারে না। (গ) এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। এই সভাপতি রাষ্ট্রপতি নামে পরিচিত। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই।
৪। বিশেষত্ব	[৪] (ক) বিভিন্ন দলীয় ব্যক্তি হইলেও একযোগে কাজ করে। (খ) বিধান-মণ্ডলী বা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের আজ্ঞা অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করে। (গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের কোন নীতি বা প্রস্তাবিত আইন বিধানমণ্ডলী বাতিল করিয়া দিলে, শাসন পরিষদ পদত্যাগ করে না। তাহারা বিধান-মণ্ডলী নির্দিষ্ট পথে আপনাদিগকে পরিচালিত করে। (ঘ) দুই পরিষদের যে কোন পরিষদে বক্তৃতা করিবার অধিকার শাসন পরিষদের সদস্যগণের রহিয়াছে। (ঙ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ বাজেট প্রস্তুত করে এবং দুই পরিষদে পেশ করিয়া থাকে।

পরিশিষ্ট (খ)

বিষয়	তথ্য
	(চ) বর্তমান রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় প্রশাসনিক জটিলতা বাড়িয়াছে, এই কারণে উভয় ক্ষেত্রে বিধানমণ্ডলী শাসন পরিষদের হস্তে অনেক ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছে। (ছ) আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক বিষয়ে যদিও আইনতঃ শাসন পরিষদ বিধানমণ্ডলীর নিকট দায়ী তথাপি উভয় ক্ষেত্রে শাসন পরিষদের নেতৃত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্রষ্টব্য : সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদ ব্রিটেনের ক্যাবিনেট প্রথা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রথার সংমিশ্রণে গঠিত।
৫। ক্ষমতা	[১] (ক) প্রশাসনিক ক্ষমতা (খ) কোন সরকারী বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের আপীল শুনিবার অধিকার। (গ) রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার অধিকার। (ঘ) ক্যাণ্টনীয় সরকার যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চালু করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার ক্ষমতা। (ঙ) কোন বাণিজ্যচুক্তি, পেটেণ্ট, সামরিক কর, বাণিজ্য শুল্ক, নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা।

পরিশিষ্ট (২)

সুইটজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী (Federal Assembly)

বিষয়	২ নিম্ন পরিষদ : জাতীয় পরিষদ (National Council)	৩ উচ্চ পরিষদ : রাজ্য পরিষদ (Council of States)
১। সদস্য	[১] ১৯৬ জন	[১] ৪৪ জন
২। নির্বাচন-পদ্ধতি	[২] (ক) প্রতি ক্যাণ্টন অথবা অর্ধ ক্যাণ্টন হইতে জনসংখ্যার অনুপাতে (প্রতি ২৪,০০০ নাগরিক পিছু ১ জন আনুপাতিক ভোট-প্রথানুযায়ী নির্বাচিত। কুড়ি বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষ নাগরিক-গণের ভোটাধিকার আছে। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার নাই।* (খ) প্রতি ক্যাণ্টন হইতে অন্ততঃ ২ জন এবং প্রতি অর্ধ ক্যাণ্টন হইতে অন্ততঃ ১ জন নির্বাচিত হইতেই হইবে।	[২] (ক) ১৯টি পূর্ণ ক্যাণ্টন হইতে দুই জন করিয়া ও ৬টি অর্ধ ক্যাণ্টন হইতে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকে। (খ) অধিকাংশ ক্যাণ্টন হইতে নাগরিকগণ কর্তৃক রাজ্য-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কোন কোন ক্যাণ্টনের আইন-পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচন করেন। এই বিষয়টি ক্যাণ্টনীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত। বিভিন্ন ক্যাণ্টনে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত।
৩। কার্য-কাল	[৩] ৪ বৎসর	[৩] (ক) ক্যাণ্টনীয় আইনের উপর কার্যকাল নির্ভর করে। কোন ক্যাণ্টনে ১, কোথাও ২, কোথাও বা ৪ বৎসর। অধি-কাংশ ক্যাণ্টনের নিয়মানুসারে প্রতিনিধির কার্যকাল ৩ বৎসর। (খ, কোন কোন ক্যাণ্টনে Recall প্রয়োগে প্রতিনিধির কার্যকাল খতম করা যায়।
৪। ক্ষমতা-ভুক্ত	[৪] রাজ্য পরিষদের সহিত আইনতঃ সমক্ষমতাসম্পন্ন। এমনকি আইনতঃ অর্থসংক্রান্ত বিলেও ক্ষমতা-পার্থক্য অবর্তমান। তবে বস্তুতঃ জাতীয় পরিষদের প্রভাব বেশি।	[৪] জাতীয় পরিষদের ও রাজ্য পরিষদের সাধারণ ও অর্থ-সংক্রান্ত বিল সম্বন্ধে একই ক্ষমতা। কিন্তু কার্যতঃ জাতীয় পরিষদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশি। তথাপি সকল প্রকার আইন প্রণয়নে রাজ্যপরিষদের সম্মতি প্রয়োজন।

* স্ত্রীলোকদিগকে ভোটাধিকার দিবার সপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর সংশোধনী প্রস্তাব, ১৯৫৯ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী ৬, ৫৪৯ ৩৯ (বিপক্ষে) ও ৩, ২৩, ৭২৭ (পক্ষে) ভোটে নামঞ্জুর হইয়া যায়।

পরিশিষ্ট (৩)

সুইটজারল্যাণ্ডের বিধানমণ্ডলীর (Federal Assembly) যুক্ত অধিবেশনের ক্ষমতা

[১] নিয়োগ ক্ষমতা :

(ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের সদস্যগণ (Federal council) ;

(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতিগণ ;

(গ) রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি ;

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদলের সর্বাধিনায়ক ; ও

(ঙ) প্রধান সচিব (Chancellor)

[২] বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা :

(ক) প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বা হুকুম সম্বন্ধে শাসন বা মন্ত্রি পরিষদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ক্ষমতা।

(খ) শাসনপরিষদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের এক্তিয়ার বিষয়ক মতভেদ উপস্থিত হইলে, তাহার সমাধান।

পরিশিষ্ট (৪)

সুইটজারল্যাণ্ডের
যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Federal Tribunal)

বিষয়	তথ্য
১। সংখ্যা	[১) (ক) ২৬ হইতে ২৮ জন বিচারপতি ও ১১ হইতে ১৩ জন বিকল্প বিচারক (Alternate or Ssupplementary Judges)। (খ) ৯জন বিচার-সহায়ক (Assessors) ও (গ) ফৌজদারী মোকদ্দমার জন্য জুরী
২। কার্যকাল	(২) ২ বৎসর।
৩। নিয়োগ প্রথা	(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত
৪। শ্রেণীবিভাগ	(৪) একটি মাত্র কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আপীল আদালত ও জেলা আদালতে বিভক্ত নহে।
৫। সাধারণ ক্ষমতা	[৫] (ক) নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা সংক্রান্ত অধিকার; (খ) নির্দিষ্ট ফৌজদারী মোকদ্দমা সংক্রান্ত অধিকার।
৬। বিশেষ ক্ষমতা	[৬] (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও ক্যাণ্টনীয় সরকারের মধ্যে এক্তিয়ার বা এলাকার বিরোধ। (খ) ক্যাণ্টনে ক্যাণ্টনে আইনসংক্রান্ত বিরোধ। (গ) ক্যাণ্টনীয় আইন সংবিধান-বিরোধী হইলে তাহা অবৈধ ঘোষণা করিবার অধিকার। (ঘ) নাগরিক অধিকার-ভঙ্গ সংক্রান্ত বিচার। (ঙ) আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তিভঙ্গ সংক্রান্ত বিরোধের বিচার। (চ) উচ্চ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বিভাগীয় বিচারের বিরুদ্ধে নালিশ বিচারের ক্ষমতা।

পরিশিষ্ট (৫)

সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধানিক পরিবর্তন।

(১) সংবিধানিক পরিবর্তনের নিয়ম সাধারণ আইন প্রণয়নের নিয়ম হইতে বিভিন্ন। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।

(২) বিধানমণ্ডলীর (Federal Assembly) উদ্যোগে পরিবর্তন :—দুই কক্ষ যদি সংবিধানের পরিবর্তন কামনা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে তাহারা পরিবর্তনটি প্রস্তুত করে এবং তাহা গণভোট ও ক্যাণ্টনীয় ভোটে দেওয়া হয়। প্রস্তাবিত পরিবর্তনটি

(ক) অধিকাংশ ভোটদাতা ও

(খ) অধিকাংশ ক্যাণ্টনের সম্মতি সাপেক্ষ (পূর্ণ ক্যাণ্টনের এক ভোট, অর্ধ ক্যাণ্টনের অর্ধ ভোট আছে)। কিন্তু যদি দুই কক্ষের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়, তবে (১) পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা, সেই সেই বিষয়টি গণভোটে যায়। (২) যদি অধিকাংশ ভোটদাতা পরিবর্তন কামনা করে তবে দুই কক্ষের নূতন নির্বাচন হয়। (৩) তারপর পরিবর্তনের ধারা প্রস্তুত হয় এবং (৪) উহা ক্যাণ্টনীয় ভোট ও গণভোটে যায় (৫) এই গণভোটে অধিকাশ ভোটদাতা ও অধিকাংশ ক্যাণ্টনের সম্মতি প্রয়োজন। এই কয়টি সর্ত পূর্ণ হইলে সংঘিধানের প্রস্তাবিত সংশোধন গৃহীত হয়।

(৩) গণ উদ্যোগ মারফত পরিবর্তন :—দুইপ্রকার পরিবর্তন (ক) সামগ্রিক পরিবর্তন (খ) আংশিক পরিবর্তন।

সামগ্রিক পরিবর্তন নিম্নলিখিত সর্ত-সাপেক্ষ :—

(ক) ৫০০০০ নাগরিকের স্বাক্ষর-সম্বলিত দরখাস্ত সামগ্রিক পরিবর্তন দাবি করিবে ;

(খ) তাহার পর, সামগ্রিক পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় কি না, তাহাই গণভোটে যাইবে।

(গ) যদি অধিকাংশ ভোটদাতা পরিবর্তন কামনা করে তাহা হইলে বিধানমণ্ডলীর দুই কক্ষেরই পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) পরবর্তীস্তরে নূতন নির্বাচিত বিধানমণ্ডলী সংবিধানের দরখাস্তে উল্লিখিত সামগ্রিক পরিবর্তন প্রস্তুত করে এবং ক্যাণ্টনীয় ভোট ও গণভোটে দেয়। অধিকাংশ ভোটদাতা ও ক্যাণ্টনের সম্মতি হইলে সংবিধান সংশোধিত হইয়া যায়।

আংশিক পরিবর্তন:— গণউদ্যোগ দ্বারা দুই প্রকার পরিবর্তন দাবি করা যাইতে পারে (ক) বিল মারফত সংশোধনের প্রস্তাব, ও (খ) সাধারণভাবে আংশিক সংশোধনের প্রস্তাব।

(ক) বিল মারফত আংশিক পরিবর্তনের গণদাবি:

(১) ৫০০০০ হাজার নাগরিকের দরখাস্ত সহ বিল প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) যদি বিধানমণ্ডলী উহা সমর্থন করে, তবে তাহা গণভোটে ও ক্যাণ্টন সমূহের ভোটে দেওয়া হয়। অধিকাংশ ভোটদাতা ও ক্যাণ্টনের সম্মতি হইলে ঐ সংশোধক বিল গৃহীত হয়।

(৩) যদি বিধান মণ্ডলী ঐ বিল গ্রহণ না করে তাহা হইলে তাহারা গণভোট ও ক্যাণ্টনীয় ভোটে দেওয়ার সময় সুপারিশ করিতে পারে যে বিলটি অগ্রাহ্য করা হউক; কিম্বা বিধানমণ্ডলী স্বয়ং নিজেরা বিল প্রস্তুত করিয়া, গণউদ্যোগীয় বিল ও তাহাদের নিজস্ব বিল গণভোট ও ক্যাণ্টনীয় ভোটে দিয়া সুপারিশ করিতে পারে যে বিধানমণ্ডলীর বিল গৃহীত হউক। এই বিষয়ে অধিকাংশ ভোটদাতা ও অধিকাংশ ক্যাণ্টনের মতানুযায়ী কাজ হইবে।

(খ) সাধারণ ভাবে আংশিক সংশোধনের গণদাবি নিম্নলিখিত সর্ত সাপেক্ষ:

(১) ৫০০০০ নাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত দিতে হইবে।

(২) যদি বিধানমণ্ডলী দরখাস্তের নীতি মানিয়া লয়, তবে তাহারা সংশোধনটি গঠিত করিয়া গণভোটে ও ক্যাণ্টনীয় ভোটে দিবে। অধিকাংশ ভোটদাতা ও ক্যাণ্টন সমর্থন করিলে পরিবর্তন সাধিত হইয়া যায়।

(৩) যদি বিধানমণ্ডলী উপরোক্ত গণদাবি মানিয়া না লয়, তাহা হইলে গণদাবিতে উল্লিখিত পরিবর্তন সংক্রান্ত সাধারণ প্রস্তাবটি গণভোটে দেওয়া হয়।

(৪) যদি অধিকাংশ ভোটদাতা পরিবর্তন কামনা করে তবে বিধানমণ্ডলীকে বিল প্রস্তুত করিয়া গণভোটে ও ক্যাণ্টনীয় ভোটে তাহা পেশ করিতে হইবে।

(৫) অধিকাংশ ভোটদাতা ও ক্যাণ্টন মানিয়া লইলে সংশোধক বিল গৃহীত হয়।

অতিরিক্ত পাঠ্য

সুইটজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা বিষয়ক অধ্যায়গুলি প্রস্তুত করিতে যে গ্রন্থাদি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যেসকল পুস্তক হইতে উৎসাহী পাঠকবর্গ উপকৃত হইবেন তাহার তালিকা :—

Bryce—Modern Democracies. 2 vols.

Finer—The Theory and Practice of Government. 2vols

Ghosh, R. C. The Government of the Swiss Republic

Hughes, C. The Federal Government of Switzerland

Kapoor, A. C. Select Constitutions.

Lowell, A. L. Government and Parties in Continental Europe. 2 vols.

Rappard, W. E. The Government of Switzerland.

Siva Rao, B : Select Constitutions of the World.

আধুনিক শাসন ব্যবস্থা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পটভূমি

১। **ভৌগোলিক পরিবেশঃ** পশ্চিম গোলার্ধের উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র একটি বিচিত্র দেশ। নানা জাতি, নানা সংস্কৃতি এখানে মিলিত হইয়াছে। আজ হইতে মাত্র ১৮৬ বৎসর পূর্বে এই জাতির ইতিহাস শুরু হইয়াছে। কিন্তু দেশটি এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ও অনৈক্য অতিক্রম করিয়া একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে এবং একটি নূতন সভ্যতা ও সুসম্বদ্ধ জাতি গঠনে সমর্থ হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অসাধারণ রাজনৈতিক, আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভাবলে এই জাতিটি পৃথিবীর সশ্রদ্ধ বিস্ময় জাগাইয়াছে। ইহার ফলে আধুনিক জগতের প্রতিটি দেশে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের প্রভাব কোন না কোন ভাবে সক্রিয় রহিয়াছে। বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য যে দুইটি মহাশক্তিশালী জাতি আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, তাহার অন্যতম আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সেই কারণে পৃথিবীর সর্বদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে এই জাতিটি যে আশ্চর্যজনক প্রাগ্রসরতা লাভ করিয়াছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই দেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি। পূর্বে অতলান্তিক মহাসাগর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর উত্তরে ক্যানাডা এবং দক্ষিণে মেক্সিকো ও মেক্সিকো উপসাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ এই বিরাট দেশটি আয়তনে প্রকাণ্ড—৩৫ লক্ষ ৫৭ হাজার বর্গ মাইল। পূর্বে পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ২৮০৭ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে ইহার প্রস্থ ১৫০৮ মাইল।

যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ও শক্তির কারণ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, বৃহৎ নদী, বিপুল প্রসারী উপত্যকা ও উর্বর সমতলভূমি, বৃহৎ হ্রদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সুষমাময় করিয়াছে এবং জাতির হস্তে সমৃদ্ধির উপকরণ তুলিয়া দিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র লৌহ, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি বহু মূল্যবান খনিজ পদার্থ ও উর্বর ভূমির অধিকারী। অসাধারণ সংগঠনশক্তি ও শিল্পোন্নয়নের উপযোগী আবিষ্কার বলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীগণ এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করিয়া শিল্পায়নের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী

জাতিতে পরিণত হইয়াছে। আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা অল্প। ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৬ হাজার। প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র ৫০ জনের কিছু বেশি। জনসংখ্যার আনুপাতিক স্বল্পতা এবং প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আমেরিকার দ্রুত আর্থিক উন্নতির একটি প্রধান কারণ।

২। **আমেরিকার সংস্কৃতিঃ** আমেরিকার পূর্বতন ইংরেজ উপনিবেশগুলি হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্য এই রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষা ইংরেজী। ঐতিহ্যও অনেকাংশে ইংলণ্ডেরই অনুরূপ। কিন্তু ইংরেজ সভ্যতা হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সভ্যতার পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানতঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তরের মানুষ আসিয়া বস-বাস করিয়াছে। পুরাতন ইংলণ্ডীয় সভ্যতার সহিত নবাগত এই মানুষের ঐতিহ্য মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে একটি নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহাকে আমেরিকান সভ্যতা বলা হইয়া থাকে। এই সভ্যতার সহিত ইংলণ্ডের সভ্যতা ও জীবনবোধের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তথাপি আমেরিকার সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নানা দেশ হইতে আগত অগণিত মানুষ বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষা লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে ও আসিতেছে; কিন্তু তাহারা এক-দুই পুরুষের মধ্যেই জাতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে মিলিয়া মিশিয়া আমেরিকার সভ্যতার সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছে। তাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে Melting Pot of Nations বলা হইয়া থাকে। সত্যই এখানে বিভিন্ন জাতি মিশ্রিত হইয়া তাহাদের পূর্বের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে এবং নূতন দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। তাই আমেরিকার নাগরিকগণের মধ্যে তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যবোধ ও স্বাজাত্যচেতনা সুদৃঢ়। ইংরেজ সাহিত্যিক জন বিউকান (John Buchan) বলিয়াছেন যে "The democratic testament is the one lesson that America has to teach the world." এই সুরে সুর মিলাইয়া ফরাসী ঐতিহাসিক আঁদ্রে মারোয়া (Andre Maurois) লিখিতেছেন "America has always been ready to fight for moral ideals, for the weak against the strong, for liberty against autocracy." বস্তুতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ধর্মচিন্তা, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণভোটভিত্তিক গণতন্ত্র আমেরিকার সভ্যতার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। ইহাই আমেরিকার সভ্যতার মূলসূত্র।

৩। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব : আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমেরিকার সভ্যতার মূলসূত্রটির সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স-এর সময় একদল ইংরেজ ইংলণ্ড হইতে হলাণ্ডে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহাদেরই মধ্যে অনেকে মে ফ্লাওয়ার (May Flower) নামক জাহাজে অতলান্তিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় আসিয়া নূতন বসতি স্থাপন করেন। এই নূতন উপনিবেশকারীগণ ইতিহাসে Pilgrim Fathers নামে পরিচিত। ইহারা সংখ্যায় মাত্র ৯২ জন। ইহারা ১৬২০ সালের নভেম্বর মাসে একটি স্বায়ত্তশাসনের রাজনৈতিক চুক্তি অনুযায়ী নূতন প্লিমথ (New Plymouth) নামক গণতান্ত্রিক জনপদটির পত্তন করেন। এমনি করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সূত্রপাত হইল। ১৬৮০ সাল পর্যন্ত

"Pilgrim fathers" (১৬২০)

ধর্মমতের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে ও আর্থিক উন্নতির অন্বেষণে ইংলণ্ড হইতে দলে দলে দেশত্যাগীর দল আমেরিকার পূর্বোপকূলের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ গঠন করেন। ১৬৮০ সাল পর্যন্ত হলাণ্ড, সুইডেন, জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেইন, পর্টুগাল, ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে অল্পসংখ্যক নরনারী আমেরিকায় যান। কিন্তু ১৬৮৮ সালের পর হইতে ইংলণ্ডবাসীগণ অধিক সংখ্যায় দেশত্যাগ করিয়া আমেরিকায় পাড়ি দেন নাই; তাহার কারণ এই ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের দ্বারা ধর্মমত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আইনতঃ স্বীকৃত হয় এবং পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ইংলণ্ডবাসী এই সময় হইতে লক্ষণীয় আর্থিক উন্নতির পথেও পা বাড়াইতে থাকে। কিন্তু অন্য সকল দেশ বিশেষতঃ জার্মানী, আয়ারল্যাণ্ড, ইটালী, স্কটল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, পর্টুগাল ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা বেশ বাড়িয়া যায়। এমনি করিয়া ১৬৯০ সালের মধ্যে আমেরিকায় অনেকগুলি পৃথক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া গেল। ঐ বৎসরে সমস্ত আমেরিকার উপনিবেশকারীদের মোট সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ। ইউরোপ হইতে আমেরিকায় আগত যাত্রীর ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ অবিরল ও অব্যাহত ভাবেই চলিতে থাকে। ইহার ফলে দেখা যায় যে ১৭৭৫ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব বৎসরে জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২০ লক্ষ ৫০ হাজারে। কিন্তু মোট লোকসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ইংরেজ

ঔপনিবেশিকগণের। শুধু তাহাই নহে, সমস্ত উপনিবেশগুলিতেই প্রথম হইতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ইংরেজগণ ইংলণ্ডের স্বাধীনতামূলক আইন প্রবর্তন করেন। ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta), হ্যাবিয়াস কর্পাস আইন (Habeas Carpus Act), বিল অফ রাইটস (Bill of Rights), এবং ইংলণ্ডের কমন্ ল (Common Law) প্রভৃতি ইহারা আপনাপন উপনিবেশে প্রবর্তন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথম হইতেই সর্বপ্রকার ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে এই মনুষ্য সমাজগুলি গঠিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাব

ইংরেজরাজার সহিত সংঘর্ষ : এই স্থলে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিটি উপনিবেশ আইনতঃ পত্তন করিতে হইলে ইংরেজ রাজার নিকট হইতে সনদলাভ করিতে হইত। রাজা এই সনদ দিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না, তাহার কারণ এই যে তিনি মনে করিতেন ইহার দ্বারা ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে উপনিবেশগুলিকে শক্তভাবে শাসন করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল না। এমন কি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল আইন ছিল, যাহার দ্বারা ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীগণের ও জাহাজ মালিকদের সুবিধা হইত, তাহাও অনেক সময় দৃঢ়ভাবে কার্যে পরিণত করা হইত না। মাঝে মাঝে যখন ইংরেজ রাজের প্রতিনিধি অর্থাৎ গভর্ণর দৃঢ়ভাবে শাসন করিতে অগ্রসর হইতেন, তখনই তাহার বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক আইন সভায় তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইত। ফলে দৃঢ় শাসন সম্ভব হইয়া উঠিত না। যখন সাত বৎসর ব্যাপী ইংরেজ ফরাসী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটিল, তখন (১৭৬৩ খ্রীঃ) ফরাসীরা উত্তর আমেরিকা হইতে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজ সরকারের বহু দেনা হয় এই দেনা শোধ করিবার জন্য, ইহার কিছু অংশ আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের নিকট হইতে করের মাধ্যমে আদায়ের নীতি ইংরেজ সরকার গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত পূর্বের ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানী রপ্তানী সংক্রান্ত আইনগুলি তাহারা দৃঢ়তার সহিত কাজে লাগাইতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে থাকে। তাহাদের স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এবং আমেরিকায় দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যেই ছিল ঔপনিবেশিকদিগের আয়ের প্রধান উপায়। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় জর্জ ও প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ। ঔপনিবেশিকদের বিক্ষোভে অসন্তুষ্ট হইয়া ইহারা তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার

ইংলণ্ডের সহিত সংঘর্ষ

সংকল্প গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের এই নীতি অবলম্বনের ফলস্বরূপ আমেরিকার বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। বিদ্রোহের আগুন যখন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে তখন একযোগে প্রতিরোধে অগ্রসর হইবার জন্য ১৭৭৪ সালে সকল উপনিবেশগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি মহাদেশীয় কংগ্রেস (Continental Congress) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস একটি সাময়িক জরুরী সংস্থা ছিল বলিয়া, ইহার কোন সংবিধান ছিল না; কিন্তু যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইল তখন ঔপনিবেশিকেরা তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বুঝিলেন যে বিভিন্ন উপনিবেশগুলি লইয়া একটি রাষ্ট্রসমষ্টি (Confederation) গঠন না করিলে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাই ১৭৭৬ সালে ১২ই জুন মহাদেশীয় কংগ্রেস একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া তাহাদের উপর রাষ্ট্রসমষ্টির গঠন প্রণালী বিষয়ে সুপারিশ প্রস্তুত করিবার ভার দিলেন। ১৭৭৭ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেস এই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং আমেরিকার ১৩টি রাষ্ট্র লইয়া একটি Confederation বা রাষ্ট্রসমষ্টির ভিত্তিপত্তন হয়। পরে, ১৭৮১ সালে এই Confederation বা রাষ্ট্রসমষ্টির সংবিধান (Articles of Confederation) গৃহীত হয়।

১৭৭৬ সালের ১২ই জুন কংগ্রেস একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়া তাহার উপর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিবার ভার দিলেন। ১৭৭৬ সালে ৪ঠা জুলাই আমেরিকার উপনিবেশগুলি যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে তাহা স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। জন এ্যাডামস্ (John Adams), প্যাট্রিক হেন্‌রী (Patrick Henry) ও টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson)-এর নেতৃত্ব এই বিষয়ে স্মরণীয়। ঘোষণাপত্রটি প্রধানতঃ জেফারসন কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকায় নূতন জাতির জন্মলাভের সূচনা হইল। পৃথিবীর ইতিহাসের এক নূতন পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটিত হইল।

এই ঘোষণাপত্র প্রকাশের ফলে আমেরিকার ১৩টি ইংরেজ উপনিবেশ ইংরেজ রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র (১৭৭৬)

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাইএর ঘোষণা: এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘোষণা আমেরিকার বর্তমান সংবিধানের ভিত্তিস্বরূপ। এইজন্য ইহার মর্মকথা উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক। ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিক লক্ ও ফরাসী চিন্তাবীর রুশোর প্রভাব আমেরিকার এই ঐতিহাসিক ঘোষণার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। লকের সাম্যনীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রাকৃতিক অধিকার (Natural

Rights), সামাজিক চুক্তি ও অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহের অবিসংবাদী অধিকার এই ঘোষণার মূলমন্ত্র। ঘোষণাটি শুধু যে আমেরিকার অধিবাসীদিগকে অনুপ্রাণিত করাইয়াছে তাহা নহে, ইহা যুগে যুগে সর্বদেশে সকল স্বাধীনতাকামী মানুষদের উদ্দীপনা যোগাইয়াছে। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের উপর এই ঘোষণার প্রভাব অপরিমেয়। ঘোষণাটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথমাংশটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"We hold these truths to be self evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and pursuit of Happiness. That to secure these rights Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever the form of government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organising its powers, in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. অর্থাৎ "সকল মানুষ সমান, ইহাই সৃষ্টির নিয়ম—এই নীতি আমরা সহজ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি; সৃষ্টিকর্তা তাহাদিগকে কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়াছেন, ইহার মধ্যে রহিয়াছে জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ-সন্ধানের অধিকার। এই অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করিবার জন্যই শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়া থাকে। শাসকের নগণ্য ক্ষমতা শাসিত ব্যক্তিগণের সম্মতির উপরই নির্ভরশীল। যখনই কোন শাসনযন্ত্র এই সকল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইয়া উঠে তখনই জনগণের সেই শাসনযন্ত্রটিকে পরিবর্তন বা উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থলে এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের অধিকার জন্মে, যাহার নৈতিক ভিত্তি ও ক্ষমতা-ব্যবস্থাপন এমন যে তাহার দ্বারা জনগণের সর্বাধিক সুখ ও নিরাপত্তা বিধান হয়।"

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের এই অবিস্মরণীয় বাণী দেশে দেশে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের মনে প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া ধ্বনিত হইয়াছে। আমেরিকার বিপ্লবীগণ যে বাণী অমর ভাষায় রূপদান করিয়াছিলেন, সেই বাণীটিতেই পৃথিবীর সকল দেশের বিপ্লবীবৃন্দের মনোগত আকুতি দৃপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৭৮১ সালে গৃহীত আমেরিকার রাষ্ট্রসমষ্টির (Confederation) সংবিধান ঃ ক। আইন ক্ষমতা ঃ এই রাষ্ট্রসমষ্টিতে ১৩টি রাজ্য যোগদান করে। সংবিধান অনুযায়ী নিম্নলিখিত শাসন ক্ষমতা Continental Congress বা মহাদেশীয় কংগ্রেসকে দেওয়া হয়। যথা—

কনফেডারেশন গঠন (১৭৮১)

(১) যুদ্ধ ও শান্তি; বৈদেশিক দূতগণের স্বীকৃতি; সন্ধি ও চুক্তি; নৌবহর, সৈন্য বিভাগ; প্রতিরক্ষা ব্যয়; প্রতিরাষ্ট্রের শ্বেতকায় নাগরিকগণের অনুপাতে প্রতি রাষ্ট্র হইতে সৈন্য প্রেরণের হুকুম ক্ষমতা। নৌবহর ও সৈন্য বিভাগের অধিনায়কগণের নিয়োগ; নৌ ও স্থল সৈন্য সম্বন্ধে নিয়ম কানুন।

(২) মুদ্রা, ওজন, পোষ্ট অফিস, ঋণগ্রহণ, সকল রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যয়।

(৩) প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট ছিল। কোন সিদ্ধান্তের সপক্ষে ৯টি ভোট হইলে, তাহা গৃহীত হইত। কিন্তু এই মহাদেশীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্র সমষ্টি বা Confederation-এর সংবিধান অনুযায়ী কতকগুলি অপরিহার্য ক্ষমতা ছিল না।

কংগ্রেসকে প্রত্যক্ষভাবে কোন কর স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। প্রতিরাষ্ট্রই স্বাধীন ভাবে কর স্থাপন করিত এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্থাবর সম্পত্তির মোট মুল্যের অনুপাতে প্রতি রাষ্ট্র কংগ্রেসকে অর্থ সরবরাহ করিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, বা শুল্কের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকারও মহাদেশীয় কংগ্রেসকে দেওয়া হয় নাই। একই প্রকার মুদ্রা সমস্ত মহাদেশে প্রচলন করা বা নোট চালানোর ক্ষমতাও এই কংগ্রেস পান নাই। এমন কি কংগ্রেসের সদস্যগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের আজ্ঞাবাহী প্রতিনিধি মাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন। তাহারা বেতনও পাইতেন বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোন রাষ্ট্র কত সৈন্য বা মাল মশলা সরবরাহ করিবেন তাহাই মাত্র কংগ্রেস স্থির করিতে পারিতেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রগুলির শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।

খ। শাসন ক্ষমতা ঃ মহাদেশীয় কংগ্রেসকে শাসন-পরিষদ গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই ক্ষমতা "A Committee of the States" অর্থাৎ ১৩টি রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্র হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমিটির হস্তে দেওয়া হয়। এই শাসন পরিষদটিকে দুইটি শর্তাধীনে কাজ করিতে হইত। (১) শাসন পরিষদ কংগ্রেসের দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাগুলিই কেবল ব্যবহার করিতে

পারিবে, অন্য কোন ক্ষমতা নহে। (২) দ্বিতীয়তঃ যখন কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতে থাকিবে, তখন শাসন পরিষদের একেবারেই কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

গ। **বিচার বিভাগ**ঃ যুদ্ধে ধৃত জাহাজ ও হস্তগত অন্যান্য শত্রু সম্পত্তি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য একটি উচ্চ বিচারালয় স্থাপিত হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সীমানা-বিবাদ প্রভৃতি বিষয় ফয়সালা করিবার জন্য একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত হয়।

কনফেডারেশন বা রাষ্ট্রসমষ্টির অসাফল্যের কারণঃ উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে কেন্দ্রীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসকে Confederation এর সংবিধান অনুযায়ী যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অতিশয় অপর্যাপ্ত। ইহার ফলে স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনের ক্ষেত্রে কন্‌ফেডারেশনকে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর কালেও কেন্দ্রীয় সংস্থা আপন কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ সাধারণভাবে বলা চলে যে যুদ্ধ ও শান্তি—উভয় সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারকে কন্‌ফেডারেশনের সংবিধান অনুযায়ী আপন কর্তব্য নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের শুভবুদ্ধির উপর অসহায়ভাবে নির্ভর করিতে হইত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের সহিত কেন্দ্রের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই জন্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসমষ্টি (Confederation) অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। কারণ এই ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ জন-সমর্থন হইতে যে শক্তি ও প্রতিপত্তি লাভ হয় কন্‌ফেডারেশন তাহা হইতে বঞ্চিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রসমষ্টির আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য বা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা ছিল না। ইহার ফলে একরাষ্ট্র ও অন্য রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী শুল্ক প্রাচীরগুলির উপর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ছিল না। এইজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পর হইতে শুল্ক প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকিয়া যায়। ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবাধ ভাবে চলাচল করিতে পারে না। মহাজাতীয় কংগ্রেস অর্থাৎ Confederation বা রাষ্ট্রসমষ্টির কেন্দ্রীয় সংস্থা এই বিষয়ে নিরুপায় হইয়া থাকিতে বাধ্য হইত। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সংস্থার কর স্থাপনের কোন ক্ষমতা ছিল না। এই জন্য এই সংস্থাটির আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হইয়া পড়ে। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন এই সংস্থাটি প্রশাসনিক ব্যাপারে দুর্বল হইয়া পড়ে। চতুর্থতঃ আন্তঃরাষ্ট্র সন্ধি বা চুক্তিগুলি, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল না; ইহাতেও রাজ্যগুলির একতা ব্যাহত হয় এবং রাষ্ট্রসমষ্টি দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহা

অসাফল্যের পাঁচটি কারণ

ব্যতীত আন্তঃরাষ্ট্র মতবিরোধ মীমাংসার বিষয়ে যদিও কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কন্‌ফেডারেশনের সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তথাপি কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছিল যে সেই ক্ষমতা অপর্যাপ্ত ছিল। পঞ্চমতঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের একতা-হীনতা, পররাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাহারা এই অনৈক্যের সর্বপ্রকার সুবিধা লইতে আরম্ভ করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্রসমষ্টি বা Confederation যে উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল তাহা সফল হইয়া উঠে নাই। কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংক্রান্ত দুর্বলতাই ইহার প্রধান কারণ। জাতিগঠনের দিক হইতে এই কনফেডারেশনের সংবিধান একেবারেই কার্যকর হইয়া উঠে নাই।

এই সংবিধান ১৭৮১ সাল হইতে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে যে সকল সংবিধানিক অসম্পূর্ণতার জন্য রাষ্ট্রসমষ্টির (Confederation) উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়াছিল, সেই সকল দোষ ত্রুটি সংশোধন কল্পেই ফিলাডেল্‌ফিয়া সম্মেলন (Philadelphia Convention) আহুত হয়। দুই বৎসরব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে ১৭৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গৃহীত হয় এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জন্মলাভ করে।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন (Philadelphia Convention) : ১৭৮৬ সালে মেরীল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়া নামক দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ মিটাইবার জন্য আন্নাপোলিস্‌ সম্মেলন আহুত হয়। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় বিবেচনা করিবার সময় কনফেডারেশনের সাংবিধানিক দোষ ত্রুটিগুলি উপস্থিত প্রতিনিধি-বর্গের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলেক্‌জ্যাণ্ডার হ্যামিলটন প্রস্তাব করেন যে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ("The situation of the United States") আলোচনা করিবার জন্য ফিলাডেলফিয়া নগরীতে ১৭৮৭ সালে একটি সর্ব-রাষ্ট্রীয় সম্মেলন আহ্বান করা হউক। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৭৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহাদেশীয় কংগ্রেস (Continental Congress) একটি প্রস্তাব করেন যে উপরোক্ত ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে আহুত হইবে : "for the sole and express purpose of revising the Articles of Confederation and reporting to Congress and the several legislatures such alterations and provisions therein as shall when agreed to in the Congress and confirmed by the States, render the Federal Constitution adequate to the exigencies of

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের ইতিহাস

government and the preservation of the Union." অর্থাৎ ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন কনফেডারেশনের সংবিধানের এমন পরিবর্তন প্রস্তাব করিবেন যাহাতে একটি কার্যকর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠিত হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সংহতি উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইতে পারে।

রোড আইল্যাণ্ড (Rhode Island) ব্যতীত অন্যান্য ১২টি রাষ্ট্র ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিবর্গ হয় রাষ্ট্রীয় আইনসভাদ্বারা নির্বাচিত বা রাষ্ট্রীয় গভর্নরগণ কর্তৃক মনোনীত হইয়া সম্মেলনে যোগ দেন। আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে কন্‌ফেডারেশনের সংবিধানের আমূল পরিবর্তন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আলোচনা পাঁচদিন চলিবার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়: "A National Government ought to be established consisting of a supreme legislative, executive and judiciary"—অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন আইন সভা, শাসন পরিষদ ও বিচারালয় স্থাপন বাঞ্ছনীয়। প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য, কিন্তু তাহারা যে সিদ্ধান্ত করিলেন সে সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ নূতন সংবিধান প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত বই কিছু নহে।

কি ভাবে নূতন সংবিধান গৃহীত হইবে, সেই বিষয়েও সম্মেলন যে প্রস্তাব করেন তাহা মহাদেশীয় কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি গ্রহণ করে। স্থির হয় যে প্রতি রাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক গণসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। যদি নয়টি রাষ্ট্রীয় গণসম্মেলন নূতন সংবিধান মানিয়া লয় তাহা হইলে উহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। ১৭৮৮ সালের জুন মাসের মধ্যে নয়টি রাষ্ট্র সংবিধান মানিয়া লয়। ১৭৮৯ সালে সংবিধান প্রবর্তিত হয়। * ১৭৮৯ সালের ২রা এপ্রিল নূতন সংবিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আহূত হয়; ৫ই এপ্রিল সেনেটের প্রথম অধিবেশন বসে। ৩০শে এপ্রিল জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম সভাপতি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন।

Bill of Rights বা মৌলিক অধিকার

যে সংবিধান প্রবর্তিত হইল তাহার একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। এই সংবিধানে মৌলিক অধিকার সম্বলিত কোন অধ্যায় আদৌ ছিল না। টমাস জেফারসন্ (Thomas Jefferson) যে আন্দোলন গড়িয়া তুলেন তাহারই ফলে কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই দশটি সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। Bill of Rights বা অধিকার-সনদ ১৭৯১ সালে

* দুইটি রাষ্ট্র—নর্থ ক্যারোলিনা ও রোড আইল্যাণ্ড অল্পদিন পরেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে।

নিয়মিতভাবে সংবিধানে স্থান পায়। ইহাই Bill of Rights বা অধিকারের সনদ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। নূতন সংবিধানের আর একটি বিশেষত্ব এই যে Confederation বা রাষ্ট্র সমষ্টির সংবিধান ও তাহার কার্যকর অভিজ্ঞতা হইতে এই নূতন সংবিধানটি যথেষ্ট মাল মশলা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও পুরাতন সংবিধানটি নূতন সংবিধান প্রণেতৃগণকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয়।

যুক্ত-রাষ্ট্রের সংবিধানের মুখবন্ধঃ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। শুধু তাহাই নহে, এই সংবিধান অন্যান্য যে কোন. সংবিধান অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ছোট। অল্প পরিসরের মধ্যে, অসাধারণ শব্দবিন্যাস কুশলতার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে শাসনব্যবস্থার সকল কথাগুলি প্রাঞ্জলতার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সংবিধানের Preamble বা মুখবন্ধ সমগ্র সংবিধানের ভিত্তি স্বরূপ। বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়া মুখবন্ধের মৌলিক নীতিগুলি বাস্তবরূপ লাভ করিয়াছে। যে আদর্শ আমেরিকার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যে আদর্শ ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতা ঘোষণায় (Declaration of Independence) বাণীমূর্তিলাভ করিয়াছিল, সংবিধানের মুখবন্ধে সেই আদর্শেরই বাস্তব ও কথঞ্চিৎ কার্যকর রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত Confederation বা রাষ্ট্রসমষ্টির সংবিধানের নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতার ইঙ্গিতও এই মুখবন্ধে নিহিত আছে। মুখবন্ধটি এইরূপ:—"We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America."

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মুখবন্ধের বৈশিষ্ট্য

মুখবন্ধটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সাতটি নীতি ইহাতে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। (১) জনগণের সার্বভৌমত্ব; (২) যুক্তরাষ্ট্র গঠন (৩) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা; (৪) আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা; (৫) সর্বরাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বিধান; (৬) সমাজ কল্যাণ ও (৭) সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা। মাত্র ৪০০০ শব্দের মধ্যে এই সংবিধানটির প্রণেতৃগণ প্রধানতঃ উপরে উল্লিখিত নীতিগুলিরই সম্প্রসারণ করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থার গোড়া পত্তন করিয়াছেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বিশেষত্ব (Characteristics of the Constitution of the United States): ১। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান বলিয়া পরিচিত। বলা বাহুল্য যে আমেরিকার শাসনব্যবস্থার বিগত একশত তিয়াত্তর বৎসরের বিবর্তনের ফলে অনেক অলিখিত অংশ শাসন ব্যবস্থায় স্থান পাইয়াছে। রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও শাসনব্যবস্থার উপর তাহাদের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার, রাষ্ট্রপতির 'ক্যাবিনেট' বা মন্ত্রিমণ্ডলী, রাষ্ট্রপতির অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের কার্যতঃ প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরিণতি, সেনেট কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উচ্চ কর্মচারী নিয়োগের হস্তক্ষেপের অনিচ্ছা প্রভৃতি অংশ সংবিধানে স্থান পায় নাই সত্য। কিন্তু এই সকলই প্রথাগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অংশীভূত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সুপ্রীমকোর্ট বা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের রায়ের মাধ্যমে সংবিধান বিবর্তিত হইয়াছে। ইহা প্রথাগত বিবর্তন নহে; বিচার ব্যবস্থার (Judicial Interpretation) মাধ্যমে শাসন পদ্ধতিতে কোন কোন ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাও সংবিধানের অলিখিত অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথা ও বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়া শাসনব্যবস্থায় অলিখিত অংশ প্রবেশ করিয়াছে।

লিখিত সংবিধান

সংবিধানের অলিখিত অংশ

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় তথাপি প্রগতিশীল। সংশোধনের নিয়মাবলী সংবিধান-নির্দিষ্ট এবং সাধারণ আইনপ্রণয়নের নিয়মাবলী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র—এই দুই স্তরেই প্রস্তাবিত সংশোধন নির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তা সত্ত্বেও গৃহ-যুদ্ধ, দুইটি মহাযুদ্ধ ও একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক সমস্যার ঝড় ঝাপটা আমেরিকার সংবিধান সহজেই অতিক্রম করিয়াছে। তাহার কারণ এই যে ইহা একটি 'living organism'; একটি যান্ত্রিক বস্তু নয়। অধ্যাপক মানরো বলিয়াছেন ..."the Government of the United States ought to be studied not as a state mechanism but as a living organism, not as a moribund heritage from the past, but as a growing concern." সত্যই চলনশীলতা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অত্যাবশকীয় সময়োপযোগী সংবিধান

সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় অথচ বিবর্তনশীল

সংশোধন, প্রথাগত বিবর্তন ও সুপ্রীম কোর্টের বিচার ব্যবস্থার (Judicial interpretation) মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার চলনশীলতা রক্ষিত হইয়াছে। সেই জন্যই অধ্যাপক মান্রো (Munro) আমেরিকার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন : "It (the Constitution of the U. S. A.) is not static but dynamic a Darwinian not a Newtonian affair."

৩। সংবিধানের সর্বশ্রেষ্ঠতা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু। সংবিধানের ৬ ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে যে "This Constitution shall be the Supreme law of the land ; and the judges in every state be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any state to the contrary notwithstanding." ১৭৮৯ সালে বিভিন্ন রাষ্ট্র এই সংবিধানের ভিত্তিতে তাহাদের স্বাধীন সত্তা পরিত্যাগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি রাষ্ট্রের একটা আশঙ্কা ছিল যে তাহাদের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রে বিপন্ন হইতে পারে। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রণেতৃগণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, কি কি ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করা হইবে। সংবিধানে কেন্দ্রে ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের স্বাধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মনে যে আশঙ্কা ছিল তাহার নিরসন হইয়া যায়। যখন বলা হইল যে সংবিধানটি সর্বশ্রেষ্ঠত্ব আইনতঃ অনস্বীকার্য তখন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিবার আর কোন আপত্তির কারণ রহিল না। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সর্বশ্রেষ্ঠতা (Supremacy) এমন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং আইনবিদ্ আমেরিকার সংবিধানকেই আমেরিকাতে আইনতঃ সর্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

সংবিধানের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব (Supremacy)

৪। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আর একটি বিশেষত্ব এই যে এই সংবিধানে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সংবিধানের মুখবন্ধেই এই কথা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মুখবন্ধ শীর্ষক অনুচ্ছেদে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই সংবিধান গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহা গণতান্ত্রিক প্রথানুযায়ী গৃহীত হইয়াছে। এই সংবিধান পরিবর্তনের নিয়মাবলীও গণতন্ত্র-ভিত্তিক। সর্বশেষে এই সংবিধান যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত

জনগণের সার্বভৌমত্ব

করিয়াছে, তাহাও সর্বসাধারণের সম্মতি অনুযায়ী চলিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জনগণের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রই এই সংবিধানের প্রাণবায়ু।

৫। এই সংবিধানের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতি একটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার বিষয়। আদি ঔপনিবেশিক Pilgrim Fathersগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মতবাদ আমেরিকার ইতিহাসের প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সজীব রহিয়াছে। ধর্ম ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারে Pilgrim Fathersগণ যেমন বিশ্বাস করিতেন সংবিধান প্রণেতৃগণের ঠিক তেমনই আনুগত্য ছিল এই আদর্শগুলির প্রতি। তাই তাহারা সরকারের হস্তে এমন ক্ষমতা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না যাহাতে ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার বিপন্ন হইতে পারে। ১৭৯১ সালে যে দশটি সংশোধক গৃহীত হয় তাহাই আমেরিকাতে Bill of Rights নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। Bill of Rights বা অধিকার সনদের মধ্য দিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার নীতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দশটি সংশোধকের মাধ্যমে সর্বপ্রকার মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই দশটি সংশোধক মূল সংবিধান গৃহীত হইবার খুবই অল্পদিনের মধ্যে গৃহীত হয়। তাই এই অধিকার সনদ এক অর্থে মূল সংবিধানেরই অংশ। ইহা ব্যতীত এই সূত্রে বিল অফ রাইট্স্ বা অধিকার সনদের পঞ্চম ধারা এবং ১৮৬৮ সালে বিধিবদ্ধ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধক বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। ইহাতে 'life, liberty or properties' অর্থাৎ জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি বিষয়ক সর্বপ্রকার অধিকার ও আইনের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের নিরঙ্কুশ সাম্য সুরক্ষিত হইয়াছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও 'Due process of Law'

অধিকার সনদের পঞ্চম ধারায় ও এই সংশোধকে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ Due process of Law নীতি ঘোষিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে আইনই হউক না কেন, যদি সুপ্রীমকোর্ট বিচারান্তে মনে করে যে তাহা সংবিধানোক্ত সাম্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, তাহা হইলে সেই আইন সুপ্রীমকোর্ট অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। এইভাবে Due process of Law নীতি অনুযায়ী বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের রক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে কাজ করিতেছে। বলা বাহুল্য ভারতীয় বিচার বিভাগের এই ক্ষমতা নাই। এই বিষয়ে ভারত ইংলণ্ডীয় প্রথা অনুসরণ করিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি অধিকার

সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে আইন করিয়া ঐ অধিকার অবস্থাবিশেষে খর্ব করা যাইতে পারে। যদি এইরূপ আইন প্রণীত হয় তাহা হইলে, সেই আইন সম্বন্ধে ভারতীয় বিচারালয়ের কোন এক্তিয়ার থাকিবে না। যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ আইনের বৈধতা বিষয়ে বিচার করিবার ক্ষমতা সুপ্রীমকোর্টের রহিয়াছে।

মৌলিক অধিকারের তিনটি উৎস

যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার তিনটি উৎস হইতে প্রবাহিত হইতেছে। প্রথমতঃ সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া কতকগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ১৭৯১ সালে ১০টি সংশোধকের মধ্য দিয়া প্রধান প্রধান অধিকারগুলি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই দশটি সংশোধনমূলক ধারা আমেরিকার ইতিহাসে Bill of Rights বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ অন্যান্য কয়েকটি সংশোধকও মৌলিক অধিকারকে সুরক্ষিত করিযাছে। ১৮৬৫ সালের চতুর্দশ সংশোধক এই সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন মৌলিক অধিকার

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১) সাধারণ ভাবে নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে শাস্তি দিবার জন্য অথবা তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য কোন বিশেষ বিল আনয়ন নিষেধ করা হইয়াছে। (২) ব্যক্তি-স্বাধীনতা (৩) বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা (৪) সংগঠনের স্বাধীনতা; (৫) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত খানাতল্লাস অথবা ওয়ারেণ্ট জারি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে; (৬) একই অপরাধের জন্য ডবল শাস্তি দান নিষিদ্ধ হইয়াছে; (৭) ফৌজদারি মোকাদ্দমায় ও বিশেষ অবস্থায় দেওয়ানী মামলায় জুরি বিচার ব্যবস্থা; (৮) বিনা বিচারে আটক নিষিদ্ধকরণ; (৯) নাগরিকগণের অঙ্গরাষ্ট্রে সাম্যমূলক ব্যবহার দাবির অধিকার; (১০) এক অঙ্গরাষ্ট্র হইতে অন্য অঙ্গরাষ্ট্রে গমনাগমনের অধিকার। (১১) যে কোন অঙ্গরাষ্ট্রে বসবাস স্থাপন ও যে কোন ব্যবসা প্রভৃতি চালাইবার অধিকার (১২) সরকার কেবলমাত্র সরকারী প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করিতে পারেন সকল ক্ষেত্রে নাগরিক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী। (১৩) প্রতি নাগরিককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে সর্বস্তরের শাসন প্রজাতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত হইবে। (১৪) জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তিবিষয়ক অধিকার Due Process of Law নীতি অনুযায়ী বিচার বিভাগের অভিভাবকের আছে বলিয়া যে

হইয়াছে। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে পৃথকীকরণ নীতি লক্ষণীয়ভাবে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে; কারণ তাহা না করিয়া যদি বিশুদ্ধ নীতিটি সংবিধানের অংশীভূত করা হইত, তাহা হইলে সংবিধানটি অকেজো হইয়া পড়িত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস প্রণীত আইন সম্বন্ধে আংশিক ভিটো ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী; এবং তিনি তাহার বাণী কংগ্রেসে প্রেরণ করিয়া বা কংগ্রেসে ভাষণ দান করিয়া আইন প্রণয়ন প্রভাবিত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থায় কংগ্রেসের বা উহার যে কোন একটি আইন-সভাকে অধিবেশনে আহ্বান করিতে পারেন। ঠিক তেমনি কংগ্রেসের অন্যতম পরিষদ—সেনেট কিছু পরিমাণে প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন। যুদ্ধঘোষণা, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধি এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চ কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ সেনেটের সম্মতিসাপেক্ষ। ইহা ব্যতীত কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে 'impeach' করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাঁহার বিচারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। বিচারবিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও প্রমাণ হয় যে বিশুদ্ধ ক্ষমতা-পৃথকীকরণের নীতি স্বীকৃত হয় নাই। কারণ সুপ্রীমকোর্টের বিচারকমণ্ডলী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন; এবং এই আদালত রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিচার-রায় দিবার অধিকারী। ইহা ব্যতীত কংগ্রেস অবস্থা বিশেষে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণকে Impeach করিতে পারেন। সর্বোপরি রাজনৈতিক দলের বিবর্তনের ফলে আইন ও প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু পৃথকীকরণ বিদ্যমান ছিল তাহা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। রাষ্ট্রপতি যে দলভুক্ত, যখন কংগ্রেসে সেই দলের প্রাধান্য থাকে তখন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অর্থাৎ আইন বিভাগের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। এইরূপ প্রায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কার্যক্ষেত্রে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতিটি আরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পৃথকীকরণ নীতির আংশিক প্রয়োগ

সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে সাংবিধানিক পৃথকীকরণ বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। নাগরিকগণ কর্তৃক রাষ্ট্রের প্রধান অর্থাৎ গভর্ণর, উচ্চ-কর্মচারি-বৃন্দ আইন সভা ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারকগণের নির্বাচন পৃথকীকরণের দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই নীতি হইতে বিচ্যুতিও লক্ষণীয়। আইন সম্বন্ধে গভর্ণরের আংশিক ভিটো (বাতিল) ক্ষমতা রহিয়াছে;

ঐ নীতি ও অঙ্গরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

তিনি আইনসভাতে বাণী প্রেরণ করিয়া আইনসভার মতামত প্রভাবিত করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত সকল অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রেই বিচার বিভাগকে শাসনপরিষদের সদস্যগণের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিচার-রায় দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

৮। বিচার বিভাগের প্রাধান্য ও অগ্রগণ্যতা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিশেষত্ব। চীফ্ জাষ্টিস্ (প্রধান বিচারপতি) হিউজ্ (Hughes) বলিয়াছেন: "We are under the constitution, but the constitution is what the judges say it is." অর্থাৎ রাষ্ট্র সংবিধানের অধীন বটে, কিন্তু সংবিধানের অর্থ কী? এই বিষয়ে বিচারালয় যে রায় দিবে তাহাই শেষ কথা। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে আইন প্রণয়ন করে, সেই আইনের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশ বিচারালয়ের নাই; কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস প্রণীত যে কোন আইন বা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিধানমণ্ডলীর যে কোন আইন সুপ্রীম কোর্ট রায়ের মারফৎ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, যদি সুপ্রীম কোর্ট মনে করে যে উক্ত আইন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পরিপন্থী। তেমনি যদি সুপ্রীম কোর্ট বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে কোন শাসন পরিষদীয় আদেশ (সে আদেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় বা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয়, যাহাই হউক না কেন) যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ভঙ্গ করিয়াছে তাহা হইলে আদেশটি অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। এই ক্ষমতাবলে সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত National Recovery Act-এর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এই সূত্রে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে সুপ্রীম কোর্টের এই অধিকার, ক্ষমতা পৃথকীকরণ-নীতি হইতে লক্ষণীয় বিচ্যুতি। ১৮০৩ সালে যখন চীফ্ জাষ্টিস্ মার্শাল সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তখন Marbury vs. Madison নামক প্রসিদ্ধ মোকদ্দমা বিচারের সময় বিচারপতি মার্শালের নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্ট সর্ব প্রথম এই ক্ষমতা ব্যবহার করে। তাহার পর হইতে প্রয়োজনানুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। এই স্থলে উল্লেখনীয় যে ১৭৮৯ সাল অর্থাৎ সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পর হইতে ১৮০২ সাল পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট এই ক্ষমতা ব্যবহার করেন নাই। কার্যতঃ সর্বপ্রকার আইন ও প্রশাসনিক আদেশের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট ভিটো (Veto) বা বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছে। ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এফ. ডি. রুজেভেল্ট বলিয়াছেন যে সুপ্রীম কোর্টকে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার তৃতীয় কক্ষ (Third House of the Legis-

বিচারবিভাগীয় প্রাধান্য

সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি তাহাদের কার্যকারক (agent) হিসাবে, সংবিধানগত কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে অনেকে বলিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের জনগণেরই দান, তাহাদেরই দ্বারা মঞ্জুরীকৃত। কেবল যুক্তরাষ্ট্র নহে, বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিও সার্বভৌম জনগণের নিকট হইতেই তাহাদের অধিকারাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে সংবিধানের মুখবন্ধেই এই কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে "We, the people of the United States,......do ordain and establish this Constitution for the United States of America." সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জন্ ক্যালহুন যে নীতির সমর্থক ছিলেন তাহার ভিত্তি নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের নিকট হইতেই তাহাদের সর্ব ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। চীফ জাষ্টিস্ মার্শাল ম্যাক্-কুলক বনাম মেরীল্যাণ্ড নামক সুপ্রসিদ্ধ মোকদ্দমার বিচার-রায়ে এই মতেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "The Government of the Union is acknowledged by all to be one of enumerated powers. But it is emphatically and truly a government of the people, in force and substance it emanates from them, its powers are granted by them, and are to be exercised directly on them, and for their benefit. The people did not design to make their government dependent on the states. Therefore, the government of the Union, though limited in its powers, is supreme within its sphere of action. Its laws, when made in pursuance of the Constitution, form the supreme law of the land. It is the government of all that acts for all." এই উদ্ধৃতিটি এতই প্রাঞ্জল যে ইহার আক্ষরিক অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। প্রধান বিচারপতি মার্শালের বক্তব্যের সারার্থ এই যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বটে কিন্তু সেই ক্ষমতা জনগণের নিকট হইতেই প্রাপ্ত। এই ক্ষমতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গরাষ্ট্র সমূহের উপর নির্ভরশীল নহে। সেইজন্য কেন্দ্রের স্বক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অঙ্গরাষ্ট্র ও সর্বসাধারণ কর্তৃক অবশ্য পালনীয়।

২। যে সকল বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত সেই সকল বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা অপ্রতিহত। তাই অধ্যাপক মানরো বলিয়াছেন"........within its own

sphere, as delimited by the Constitution the authority of the Congress is supreme." যে সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য।

৩। যুক্তরাষ্ট্রের কোন অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রেরই যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার নাই। অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একটি Perpetual Union বা চিরস্থায়ী সংযুক্তিকৃত রাষ্ট্র। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-১৮৬৫) মধ্য দিয়া রক্তের অক্ষরে ইহা জাতির ইতিহাসে লিখিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সংবিধানের মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্র শুধু যে সংবিধান গঠনকালীন জনগণের কল্যাণের জন্য গঠিত হইয়াছে তাহা নহে; ভবিষ্যদ্বংশীয়দের ('posterity') মঙ্গলবিধানও এই সংগঠনের কাম্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতেই সংবিধান প্রণেতৃগণের মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের গঠন চিরস্থায়ী, আইনতঃ কোন একটি অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সমষ্টির এই ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার নাই। এই স্থলে স্মরণ করা প্রয়োজন যে সোভিয়েট সংবিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে right of secession অথবা সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

৪। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রে Residuary Powers বা অবশিষ্ট ক্ষমতা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে।* অবশিষ্ট ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে যে আমেরিকার কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল। যদি ক্ষমতাবণ্টন পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তি আছে বলিয়া মনে হইবে। সংবিধানের প্রথম ধারার অষ্টম উপধারায় কংগ্রেসের ক্ষমতা বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১৭৯১ সালে গৃহীত সংবিধানের সংশোধক দশ ধারা অনুসারে অবশিষ্ট ক্ষমতা অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা. বণ্টনের ফলে করস্থাপন ও সংগ্রহ, ঋণগ্রহণ, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রা প্রচলন, পোষ্টাফিস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি, শান্তি স্থাপন, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা অঙ্গরাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে বটে, কিন্তু সংবিধানের প্রথম ধারার দশম উপধারাবলে তাহাদিগকে কতকগুলি ক্ষমতা

* এই সূত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিশেষত্ব শীর্ষক আলোচনায় Residuary Powers বা অবশিষ্ট ক্ষমতা বিষয়ক অংশটি দ্রষ্টব্য।

ব্যবহার করিতে স্পষ্টতঃ নিষেধ করা হইয়াছে যথা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি, রাষ্ট্রসমষ্টি (Confederation) গঠন, মুদ্রা প্রচলন, কোন বহিঃরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, শান্তিকালীন সৈন্যদল গঠন প্রভৃতি। অন্যপক্ষে সংবিধান অনুসারে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর কর স্থাপন, বাক্ স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই ক্ষমতাবণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের আপেক্ষিক দৌর্বল্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পর কয়েক দশক যাবত কেন্দ্র সত্যই দুর্বল ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে বিশেষতঃ ১৮৬১-৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের (Civil War) পর কেন্দ্র ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে বিশেষতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব অর্থসংকট (১৯২৯-৩১) ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমেরিকায় যে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি করে তাহার ফলে কেন্দ্রমুখীনতা আরও বৃদ্ধি পায়। আইন প্রণয়ন, প্রথার উদ্ভব ও বিচার বিভাগীয় ভাষ্যের সাহায্যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়তির পথে চলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই কেন্দ্রমুখীনতা বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে।

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রমুখীনতা : যে সকল কারণে যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক।

১। **শিল্প বিপ্লব :** উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগ হইতেই আমেরিকার আর্থিক অবস্থায় একটি বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই সময় শিল্প বিপ্লব দ্রুত অগ্রসর হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশকে একটি একতাবদ্ধ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (United Economic Block) পরিণত করে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে জাহাজ, রেল, রাস্তা পুল প্রভৃতি অর্থনৈতিক একতাকে আরও ব্যাপকতা ও গভীরতা দান করে। সমগ্র দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার অনিবার্য, ধীরে ধীরে আমেরিকার জনমত ইহা স্বীকার করিয়া লয়। শিল্পবিপ্লবের দরুন দেশের অর্থনৈতিক ঐক্য ও সমগ্রতা যতই অনুভূত হইতে লাগিল, ততই কেন্দ্রকে আরও ক্ষমতাদান করিবার সপক্ষে জনমত সৃষ্টি হইতে লাগিল।

২। **ঐতিহাসিক কারণ :** গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিপুল জয়লাভ কেন্দ্রমুখীনতার আর একটি কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে সকল বিষয় লইয়া বিরোধের ফলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে, তাহার মধ্যে একটি ছিল এই যে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার অধিকার আছে।

এই নীতিটি যুদ্ধের মধ্য দিয়া মীমাংসা হইয়া যায়। জাতীয় স্তরে স্বীকৃত হইয়া যায় যে কেন্দ্র বা যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় ঐক্য রক্ষা কল্পে বিদ্রোহী অঙ্গরাজ্যগুলির বিরুদ্ধে আবশ্যকমত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে এবং তাহা অবশ্যকরণীয়। এইরূপে কেন্দ্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধির অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

৩। দুইটি বিশ্বযুদ্ধ: দুইটি মহাযুদ্ধের সময় জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রকে তৎপর হইতে হয়। তাহার ফলে কেন্দ্র নানা ক্ষেত্রে যুদ্ধের জরুরী অবস্থার সুযোগ লইয়া ক্ষমতা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িতে থাকে।

৪। বিশ্ব অর্থসংকট: ১৯২৯-৩১ সাল পর্যন্ত যে দুর্বার অর্থ সংকট পৃথিবীর সর্বদেশের আর্থিক কাঠামোকে প্রায় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্রে তাহার প্রভাব ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। জাতীয় শিল্প, কৃষি, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষা কল্পে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার তখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখন যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা গ্রহণ না করিলে জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বসিয়া যাইত। কেন্দ্রের এই ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ তাই সমর্থন লাভ করিয়াছিল। এই অর্থ সংকট প্রমাণ করে যে depression বা মন্দা রোধ করিতে হইলে অঙ্গরাজ্য গুলির চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কেন্দ্রকেই ক্ষমতা দান করিতে হইবে। এইরূপে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়।

৫। জাতীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য: জাতীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সরকারগুলিকে বিপুল ভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার জনস্বাস্থ্য, রাস্তা নির্মাণ, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রভৃতি কার্যে বার্ষিক ও সাময়িক অর্থ সাহায্য করেন তাহার পরিমাণ কম নহে। কেন্দ্রের অর্থসংগ্রহ ক্ষমতা বর্ধিত হওয়ায় এই সাহায্য সম্ভব হইতেছে। সেই জন্য ১৯১৩ সালে যখন কেন্দ্রের করস্থাপন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব হয়, তখন সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির পক্ষ হইতে প্রতিবাদ প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিকে লক্ষণীয় ভাবে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা আধুনিক কালে প্রসার লাভ করিয়াছে।

৬। আন্তঃরাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা: জাতীয় প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এমন সকল ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে

যাহার ক্রিয়া একটি মাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, একাধিক রাষ্ট্র ব্যাপিয়া তাহার কাজ চলিতে থাকে। টেনেসি ভ্যালী অথরিটি এই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনামূলক প্রচেষ্টা। একাধিক অঙ্গরাষ্ট্র জুড়িয়া ইহার কারবার। এই সকল প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ক্ষমতা স্বীকার না করিলে সমগ্র জাতি চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আইন প্রণয়ন, প্রথার উদ্ভব ও বিচার বিভাগীয় ভাষ্যের সাহায্যে আলোচ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়তির পথে চলিয়াছে।

৭। জাতীয় রাজনৈতিক দলের বিবর্তন: রিপাবলিক্যান ও ডেমোক্রাটিক দলের বিবর্তন জনসাধারণকে জাতীয় একতা ও সমগ্রতাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং নানা বিষয়ে যখন কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বাড়তির পথে অগ্রসর হইয়াছে তখন এই দুই জাতীয় দল তাহা সমর্থন করিয়াছে।

৮। জাতীয় সংবাদপত্রের উদ্ভব: ইহাও জাতিকে একটি অখণ্ড একাত্মতাবোধে গ্রথিত করিয়াছে এবং তাহার ফলে যে জনমত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

৯। আণবিক যুগে জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রশ্ন সর্বগ্রাসী হইয়া দেখা দিয়াছে। আধুনিক কালে জাতির প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নানা যোজনা কার্যকরী করিতে হইয়াছে। প্রাতরক্ষার প্রয়োজনে ইহা অপরিহার্য বলিয়া এই সকল বিষয়ে আপত্তি উঠিতে পরে নাই; বরং অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির সক্রিয় সহযোগিতা এই সকল যোজনার পশ্চাতে রহিয়াছে। বলা বাহুল্য এই কারণে কেন্দ্র শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

১০। জন-কল্যাণ নীতি: যুক্তরাষ্ট্র আধুনিক প্রাগ্রসর সকল গণতন্ত্রের ন্যায় একটি জন-কল্যাণ রাষ্ট্র। সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি জন-কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে অঙ্গ রাজ্যগুলির কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। অর্থাৎ জন কল্যাণের প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, যদিও এই ক্ষেত্রে তাহাদের ক্ষমতা পরোক্ষ ধরনের।

যদিও স্বীকার করিতে হইবে যে গত একশত বৎসরেরও অধিক কাল যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে জাতীয় স্বার্থে তাহার শক্তি বর্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছে তথাপি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মূল প্রকৃতির পরিবর্তন হয় নাই। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি কতকগুলি ক্ষেত্রে সংবিধানানুযায়ী স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। পুলিশ, জনস্বাস্থ্য, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, শিক্ষা, লোক কল্যাণ,

রাষ্ট্রের স্বাধিকার

আভ্যন্তরীণ আইন, এবং আভ্যন্তরীণ শাসন ও আভ্যন্তরীণ বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা অনেকাংশে অটুট রহিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রসারের ফলে আজকাল আমেরিকাতে আইনের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একই বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কেন্দ্রীয় আইন বা নিয়মাবলী এবং অঙ্গ রাষ্ট্রীয় আইন ও নিয়মাবলী দেখা যায়। ইহার যথাসম্ভব সামঞ্জস্য সাধন করা হয় বটে; তবে জটিলতার ফলে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

আইনের জটিলতা

আবশ্যকতার চাপে কিরূপে কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সংবিধানের ১ ধারার নবম উপধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর স্থাপনের ক্ষমতা অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। উপধারাটি এইরূপ: "(4) No Capilation or other direct taxes shall be laid, unless in proportion to the census or enumeration here-in-before directed to be taken." অর্থাৎ ব্যক্তিগত কর স্থাপন সর্তাধীন ছিল। সেইজন্য তাহা সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক দিক হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯১৩ সালে ষোড়শ সাংবিধানিক সংশোধন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রকে আয়কর স্থাপনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

কেন্দ্রমুখীনতার সহায়ক: উদাহরণ(১) সংবিধানের সংশোধন

দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকার সুপ্রীমকোর্ট বিভিন্ন কালে সংবিধানের এমন ব্যাখ্যা ও ভাষ্য ঘোষণা করিয়াছেন যাহার ফলে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সংবিধান যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ("to regulate commerce") দিয়াছে। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রেলপথ, জলপথ, মোটর ও বিমান যোগে মাল চলাচল নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তেমনি পাইপের সাহায্যে পেট্রোল পরিবহণ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও ও যাত্রী পরিবহণ প্রভৃতি তাহাদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসিয়াছে। এই ক্ষেত্রে "doctrine of implied powers" নীতি কার্যকর হইয়াছে। চীফ্ জাষ্টিস্ মার্শাল এই নীতিটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে যে সকল কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে, যে ক্ষমতা আক্ষরিক ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্যতীত যাহা কিছু করা অপরিহার্য

(২) সুপ্রীম কোর্টের ভাষ্য

তাহাও করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রের রহিয়াছে; অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সংবিধানে কোন কর্মপন্থা সম্বন্ধে লিখিত নিষেধ আছে কিনা। তাহা থাকিলে সে কর্মপন্থা গ্রহণীয় নহে। "Let the end be legitimate, let it be within the scope of the constitution, and all means which are appropriate, which are plainly adopten to that end, which are not prohibited but consistent with the letter of the constitution, are constitutional". (চীফ্ জাষ্টিস্ মার্শাল)

তৃতীয়তঃ, অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। ইহার ফলে একটি প্রথা কায়েম হইয়া গিয়াছে। প্রথাটি এই যে কেন্দ্র যে খাতে অর্থ দিতেছে, সেই খাতটি কেন্দ্র নিয়ম প্রণয়নের মাধ্যমে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বাড়িতেছে এবং সেই অনুপাতে অঙ্গরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্তাধীন হইয়া পড়িতেছে।

(৩) প্রথার উদ্ভব

৫ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বিবর্তন: ১৭৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ যে সংবিধান গ্রহণ করে, তাহাতে মাত্র ৭টি ধারা ছিল। এই ৭টি ধারার মধ্যে ৪টি ধারা মোট ২১টি উপাধারায় বিভক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সংবিধান। চার হাজার শব্দ সমষ্টির এই ছোট সংবিধানটি ধীরে ধীরে, জাতির প্রয়োজনানুযায়ী এক শত তিয়াত্তর বৎসরাবধি বিবর্তিত হইয়া আজ এমন আকার ধারণ করিয়াছে, যাহার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় একটি বৃহৎ প্রগতিশীল দেশের সর্বপ্রকার চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মিটিতে পারে। ব্রাইস বলিয়াছেন "...the American constitution has necessarily changed as the nation has changed, has changed in the spirit with which men regard it, and therefore in its own spirit:" অর্থাৎ জাতীয় ইতিহাসের বিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া আমেরিকার সংবিধান পরিবর্তিত হইয়াছে; এই পরিবর্তন জাতির ভাবসত্ত্বা ও সংবিধানের অন্তর্নিহিত বাণীর সহিত সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস।

আজ আমেরিকার সংবিধান বলিতে আমরা কেবল ফিলাডেল্ফিয়া সম্মেলনে গৃহীত ক্ষুদ্র সংবিধানটি ও পরবর্তী কালের সংশোধকগুলিকেই বুঝি না, কংগ্রেসের শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত আইনাবলী, বিভিন্ন শাসন যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি, সুপ্রীমকোর্টের শাসন সংক্রান্ত বিচার—সিদ্ধান্ত এবং শাসনব্যবস্থার অগণিত প্রথা প্রভৃতি সকলই আমেরিকার শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত। উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) তাঁহার Congressional Government নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন আদি

সংবিধানটির শক্তিশালী মূল হইতে শাসনব্যবস্থার নানা শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়াছে। সংবিধানানুযায়ী প্রস্তুত শাসনব্যবস্থা বিষয়ক নানা আইন ও নিয়মাবলী বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত এবং অলিখিত প্রথা সমূহই সংবিধানিক মূল হহতে উদ্ভুত শাখা প্রশাখা *। বিভিন্ন উপায়ে কী ভাবে সংবিধানটি প্রসারিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

(ক) আইন মারফৎ সম্প্রসারণ: সংবিধানের তিন ধারার প্রথম উপধারায় বলা হইয়াছে "the judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish"...... দেখা যাইতেছে যে সংবিধান সুপ্রীম কোর্টের গঠন প্রণালী ও তাহার অধীনস্থ অন্যান্য আদালতের গঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কংগ্রেসীয় আইনের দ্বারা তাহা করা হইয়াছে। কংগ্রেস সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১৭৮৯ সালের Judiciary Act বা বিচারালয় আইন দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট ও তদধীন অন্যান্য আদালত সম্বন্ধে ব্যবস্থা করে। ঠিক তেমনি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংবিধানে সামান্যই উল্লেখ করা আছে। এই সম্বন্ধেও কংগ্রেস ব্যাপক আইন প্রণয়ন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থা সংবিধানে না থাকিলেও কংগ্রেস আইনবলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে অধিকাংশ কর্মচারি নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছে। এইরূপে প্রয়োজনানুযায়ী আইন মারফৎ সংবিধান প্রসারিত হইয়াছে।

(খ) প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সংবিধানের পরিবর্তন: ইহার উদাহরণ স্বরূপ প্রথম রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন কর্তৃক ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদ স্থাপনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমেরিকার সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদের কোন উল্লেখই নাই। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন মন্ত্রিপরিষদ স্থাপন করেন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা সংবিধানের সম্প্রসারণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য যে এই ব্যবস্থা এখন প্রথাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(গ) সুপ্রীম কোর্টের ভাষ্য মারফৎ সংবিধানের সম্প্রসারণের উদাহরণও বিরল নহে। সংবিধানের প্রায় প্রতিটি ধারা ও উপধারা সুপ্রীম কোর্টের

* "......a vast constitutional system—a system branching and expanding in statutes, judicial decisions as well as in unwritten precedent."

সম্মুখে আজ্ঞাজ্ঞাপক ভাষ্যের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট তাহাদের রায়ের মাধ্যমে সংবিধানের প্রচুর সম্প্রসারণ সাধন করিয়াছেন। সংবিধানের প্রথম ধারার, অষ্টম উপধারায় আছে : "The Congress shall have power ....(3) to regulate commerce with foreign nations, and among the several states, and with Indian tribes." এই উপধারা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রকে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট ভাষ্য করিয়াছেন যে এই কর্তব্য সম্পন্ন করিতে হইলে সর্বপ্রকার চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে চীফ জাষ্টিস্ (প্রধান বিচারপতি) হিউজ (Hughes) বলিয়াছেন : "We are under the Constitution but the Constitution is what the judge say it is." অর্থাৎ জনগণ সংবিধানের অধীন বটে, কিন্তু সংবিধানের অর্থ কী, তাহা সুপ্রীম কোর্টেই বলিয়া দিবেন। উড্রো উইলসন সুপ্রীম কোর্টকে "a kind of constitutional convention in continuous session" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; অর্থাৎ সংবিধান পরিষদ যেমন সংবিধান সংক্রান্ত সকল পরিবর্তন করিবার অধিকারী, ঠিক তেমনি সুপ্রীমকোর্ট ভাষ্যের মারফতে সংবিধানের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারেন।

(ঘ) প্রথাগত পরিবর্ধন : মানুষের দীর্ঘকাল স্থায়ী অভ্যাস যেমন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, তেমনি শাসনব্যবস্থার দীর্ঘাচরিত রীতি উহার অংশীভূত হইয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপে অনেক দীর্ঘকালস্থায়ী প্রথা সংবিধানকে প্রভাবিত করিয়াছে এবং উহার কার্যকর রূপে পরিবর্তন আনিয়াছে; যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদ শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অঙ্গ; কিন্তু সংবিধানে তাহার উল্লেখ নাই। প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন প্রবর্তিত প্রথানুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের উদ্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক দলগুলির সংবিধানে স্থান নাই; থাকিতেও পারে না। কিন্তু স্বাভাবিক রাজনৈতিক কারণে দলগুলির উত্থান হইবার পর, শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাহাদের অংশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রে দলের ভূমিকা অপরিহার্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথার মধ্য দিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্প্রসারিত হইয়াছে।

(ঙ) সংবিধানের সংশোধনের ভিতর দিয়াও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

পরিবর্তিত ও সম্প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে ১৭৩ বৎসরে মাত্র ২২টি সংশোধক গৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০টি Bill of Rights বা অধিকার সনদ সম্বন্ধীয় সংশোধক ১৭৯১ সালে গৃহীত হইয়াছিল। অল্প সংখ্যক সংশোধনের হেতু এই যে সংশোধনের নিয়মাবলী জটিল ও আয়াসসাধ্য। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সংশোধনের (Amendment) মারফৎ পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণ সহজসাধ্য নহে কারণ সংবিধানটি দুষ্পরিবর্তনীয়। ১৯১৩ সালে ষোড়শ সংশোধকের বলে কংগ্রেসকে আয়করস্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ঐ বৎসরই সেনেটের নির্বাচন সম্বন্ধে (সপ্তদশ সংশোধন) যে সংশোধক গৃহীত হয়, তাহার দ্বারা সেনেটের সদস্যগণের বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে তথাকার জনগণ কর্তৃক বর্তমান প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এই সংশোধন দ্বারা পূর্বেকার অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যায়।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ঃ আমেরিকার শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত প্রশাসনিক অধ্যক্ষ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি একাধারে নৃপতি * ও প্রধানমন্ত্রী, আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের মুখপাত্র, জাতির সম্মান, ও মর্যাদার কেন্দ্রস্থল, বৈদেশিক রাষ্ট্রের চক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় একতার প্রতীক, জাতির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ক্ষেত্রবিশেষে, পরোক্ষভাবে তিনি আইন ও বিচার বিষয়ক ক্ষমতাপন্ন শাসক এবং জাতির বিরাট অমিতশক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক শক্তিধর পুরোধা। ওয়াশিংটন হইতে আরম্ভ করিয়া কেনেডি পর্যন্ত ৩৫ জন রাষ্ট্রপতি আমেরিকার ঐতিহাসিক সংবিধানকে সংরক্ষণ করিবার জন্য সাংবিধানিক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। এই একশত তিয়াত্তর বৎসরের ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগণ এই পবিত্র প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রক্ষায় পরাঙ্মুখ হন নাই। ইহাদের মধ্যে ওয়াশিংটন, জন এ্যাডামস্ জেফারসন, ম্যাডিসন, লিঙ্কন্, জ্যাকসন, থিওডোর রুজেভেল্ট, উড্রো উইলসন ও ফ্র্যাঙ্কলীন রুজেভেল্টের ন্যায় অসাধারণ মানুষ জাতির নিকট হইতে তাহাদের গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; আবার সাধারণ মানুষও অনেকে ছিলেন; কিন্তু সকলেই এই উচ্চাসনের সংস্পর্শে আসিয়া বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছেন এবং লক্ষণীয় যোগ্যতার সহিত তাহাদের

রাষ্ট্রপতির পদ-মর্যাদা

* **"The U. S. A. President combines in his person the office of King and Prime Minister." (Brogan) "The President of the United States is both more or less than a king; he is also both more or less than a Prime Minister." (Laski)**

কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিগণ যে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের সহিত তাহাদের হস্তে ন্যস্ত গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াছেন, তাহার ফলে রাষ্ট্রপতির আসনের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ধীরে ধীরে প্রথা প্রভৃতির মাধ্যমে তাহার ক্ষমতা ও মর্যাদাও বাড়তির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

পূর্ব অধ্যায়ে সংবিধানের বিবর্তন শীর্ষক আলোচনায় বলা হইয়াছে যে কংগ্রেস-প্রণীত আইন (Statute), প্রথা (Convention), সুপ্রীম কোর্টের রায় মারফত ভাষ্য (Judicial Interpretation) ও সংবিধান সংশোধনের (Amendment of the Constitution) মধ্য দিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হইয়াছে। ঠিক এই সকল পন্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রভৃতিরও বিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৭৮৯ সালে—আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির যে আসন ছিল, আজ তাহার বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই বিবর্তন সংঘটনে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ১৭৮৯ সালে ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র যখন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল তখন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক একতা ও সমগ্রতা ছিল না। সেই অবস্থা আজ আর নাই। সেইজন্য রাষ্ট্রপতি তখন যে লিখিত ও অলিখিত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন আজ তাহার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অখণ্ডতা যত বৃদ্ধি পাইয়াছে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ততই গুরুত্বলাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত বিগত একশত তিয়াত্তর বৎসরে যুক্তরাষ্ট্র, তেরটি অঙ্গরাজ্য গঠিত একতাবিহীন দেশ হইতে একটি সুসম্বদ্ধ, আর্থিক ও রাজনৈতিক বলে মহাবলীয়ান পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। তাই আধুনিক জগতে পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা অতুলনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। এই সকল কারণে এই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক অধ্যক্ষের ক্ষমতা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোন হেতু দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জাতীয় শক্তি ও আন্তর্জাতিক দায়িত্বের সহিত তাল রাখিয়া রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা: অধ্যাপক ষ্ট্রং (Strong) লিখিয়াছেন "………In no other constitutional states in the world today does there exist an officer with such vast powers as those of the President of the American Union." রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা যে শুধু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত তাহা নহে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থানুযায়ী তিনি আইন ও বিচার বিভাগের

উপরও সীমিত ক্ষমতা ব্যবহার করিবার অধিকারী। সেই জন্যই অধ্যাপক ষ্ট্রং মন্তব্য করিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় ক্ষমতাশালী কর্মকর্তা আধুনিক কোন গণতান্ত্রিক দেশেই নাই। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অমোঘ বিবর্তন জাতির এই সর্বোচ্চ কর্মকর্তার হস্তে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করিয়াছে।

প্রশাসনিক ক্ষমতা (Executive Powers) : রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনিক সর্বাধ্যক্ষ। দেশের সর্বপ্রকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে কার্যে পরিণত করাই তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সংবিধানের দ্বিতীয় ধারা অনুসারে তাঁহাকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। (ক) রাষ্ট্রপতি যাহাতে তাঁহার দায়িত্ব উপযুক্তভাবে পালন করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে উচ্চ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কারণ এই সকল কর্ম-চারীর মারফতই তিনি আপন কর্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। এই সকল নিয়োগ সেনেটের সম্মতিসাপেক্ষ। কিন্তু সেনেট সাধারণতঃ রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন না। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে নিয়োগের পূর্বে রাষ্ট্রপতি, যে অঙ্গরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারী নিয়োগ করা হইতেছে, সেই রাজ্য হইতে নির্বাচিত সেনেটের দুইজন সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন। যদি উক্ত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির দলভুক্ত হন, তবেই পরামর্শ করার প্রথা রহিয়াছে, নতুবা নহে। তাঁহারা সম্মতি দিলে ব্যক্তি বিশেষ নিযুক্ত হয়। এই সতর্কতাটুকু অবলম্বন করিলে রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সেনেট গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। বলা বাহুল্য এই প্রথানুযায়ী রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ক্ষমতা সংকীর্ণ হইয়া আসে। যদি রাষ্ট্রপতি নিজ দলীয় সংশ্লিষ্ট সেনেট সদস্যগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া নিয়োগ করেন, তাহা হইলে অন্যান্য সেনেট সদস্য সেনেট সভায় রাষ্ট্রপতির নিয়োগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া নিয়োগটি মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করেন। উপরোক্ত অবস্থায় সেনেটের অস্বীকৃতিকে Senatorial Courtesy বা সেনেট সদস্যগণের মধ্যে পারস্পরিক ভদ্রতা বলে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সহকর্মি সদস্যগণকে রাষ্ট্রপতি উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের মর্যাদারক্ষার জন্য সেনেটের অন্যান্য সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু ঐরূপ অবস্থা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে।

(১) কর্মচারী নিয়োগ ক্ষমতা

ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, রাষ্ট্রদূত, সুপ্রামকোর্টের বিচারপতি-গণ, বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থার সদস্যগণ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে সেনেটের মঞ্জুরী অপরিহার্য কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল

নিয়োগে আপত্তি করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮০ ভাগ কর্মচারী প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিযুক্ত হন। অবশিষ্ট ২০ ভাগ কর্মচারী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দকে কাজ হইতে বরখাস্ত করিতে পারেন।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধিনায়ক

রাষ্ট্রপতি সমগ্র প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। দেশ রক্ষার জন্য তিনি সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অধিকারী। তিনটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ১৮৬১-১৮৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের সময় রাষ্ট্রপতি এব্র্যাহাম লিঙ্কন হেবিয়াস করপাস আইন (Habeas Corpus Act) অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইনটি সাময়িকভাবে বাতিল (suspend) ঘোষণা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জরুরী প্রয়োজনে জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশদশকের প্রথমভাগে যে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়াছিল, সেই সংকট হইতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলীন রুজেভেল্ট ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাসমরের সময়েও রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলীন্ রুজেভেল্টের নিয়ন্ত্রণ নীতি তেমনি জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী হইয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে জনমত রাষ্ট্রপতিগণের এই ক্ষমতা ব্যবহার অপরিহার্য বলিয়া সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন।

প্রতিরক্ষা ও জরুরী ব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির আসন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বৈদেশিক সন্ধি স্থির করিতে পারেন; কিন্তু এই সন্ধি সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত হওয়া অপরিহার্য। যদি সেনেট সভায় রাষ্ট্রপতির বিপক্ষ দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তাহা হইলে সেনেটের মঞ্জুরী লাভ করা দুরূহ হইয়া উঠে। রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন প্রথম মহাসমরের শেষে ভার্‌সাই সন্ধিপত্রে (Versailles Treaty, 1919) স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; কিন্তু সেনেট এই সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করেন। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে প্রশাসনিক চুক্তি (Executive Agreement) সন্ধির কাজে লাগান হইয়াছে। অর্থাৎ সন্ধি স্থাপন না করিয়া প্রশাসনিক চুক্তি বলে সন্ধির শর্তগুলি চালু করা হইয়াছে। প্রশাসনিক চুক্তির জন্য সেনেটের সম্মতি প্রয়োজন হয় না, বলিয়া মাঝে মাঝে রাষ্ট্রপতিগণ এই পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, যখন তাঁহারা মনে করেন যে সেনেটের সম্মতি পাওয়া

দুঃসাধ্য হইবে। এইরূপে রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত অনেক সময় বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক নীতির নিয়ামক। এই বিষয়ে সেনেট সভার সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমন জটিল এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল যে এই বিষয়ে সেনেটের ভূমিকা লক্ষণীয়ভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সদা বিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও দৈনন্দিন জ্ঞান সম্পন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের নায়ক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষরূপে রাষ্ট্রপতি পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় প্রাধান্য অর্জন করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বিভাগের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবার দরুন বহির্নীতি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভের সুবিধা পান, সেনেটের ন্যায় একশত সদস্যবিশিষ্ট সভার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। এই কারণে আধুনিক কালে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অগ্রগণ্যতা স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা স্বাভাবিক ও দেশের পক্ষে কল্যাণজনক।

সেনেট ও পররাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণকে স্বীকার করিয়া লন এবং তিনিই অবস্থা বিশেষে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বা বাণিজ্য দূতের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতে পারেন এবং তাহাদের স্বদেশে ফিরাইয়া লইতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে জানাইয়া দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সেনেটের সম্মতি অনুযায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অধিকার আছে; এই বিষয়েও রাষ্ট্রপতির কার্যকরী নেতৃত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধকালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে পারেন। যে পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট বিরুদ্ধ মত ঘোষণা না করেন সেই পর্যন্ত জরুরী অবস্থার ভাষ্য কি হইবে, সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির মতামতই প্রামাণিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

বৈদেশিক দূতের স্বীকৃতি ও যুদ্ধ ঘোষণা

আইন বিভাগীয় ক্ষমতা (Legislative Powers): যদিও রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক সর্বাধ্যক্ষ এবং যদিও সংবিধানের প্রণেতৃগণ ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেস বা আইনমণ্ডলীর মধ্যে স্থান দেন নাই তথাপি তাহার আইন-গত ক্ষমতা অল্প নহে। সংবিধানের দ্বিতীয় ধারার তৃতীয় উপ-ধারায় বলা হইয়াছে: "He shall from time to time give to the Congress information of the state of the Union, and recommend to their consideration such measures as he shall consider

necessary and expedient ;.........," অর্থাৎ মাঝে মাঝে রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সম্বন্ধে কংগ্রেসকে সংবাদ প্রেরণ করিবেন এবং তিনি যে ব্যবস্থা সঙ্গত ও প্রয়োজন মনে করিবেন তাহা কংগ্রেসের বিবেচনার্থে সুপারিশ করিয়া পাঠাইবেন। এই ক্ষমতাটি বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি ব্যবহার করিয়া আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে বিশিষ্ট নেতৃত্ব দান করিয়াছেন। এই বাণী অনেক সময়ে লিখিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে, আবার কখনও কখনও রাষ্ট্রপতিগণ ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হইয়া কংগ্রেসে তাঁহাদের ভাষণদান করিয়াছেন। বাণী বা ভাষণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিগণ কংগ্রেসীয় আইন প্রণয়ন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতির ন্যায় অশেষ ক্ষমতাশালী প্রশাসনিক অধ্যক্ষের সুচিন্তিত ও নানা তথ্যসমৃদ্ধ মতামত কংগ্রেস প্রয়াশঃ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার বাণী বা ভাষণ যুক্তরাষ্ট্রে এমন জনমত সৃষ্টি করে যে তাহার বিরুদ্ধতা করা সেনেট ও প্রতিনিধি সভার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সাম্প্রতিক কালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির রেডিও ভাষণও কংগ্রেসীয় আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে কার্যকরী হইয়াছে। এই স্থলে মনে রাখা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রপতির হস্তে যে বিরাট পৃষ্ঠপোষকতা ক্ষমতা (চাকরি প্রভৃতি patronage) রহিয়াছে, জাতির নেতা হিসাবে তাঁহার যে অবিসংবাদী মর্যাদা, তাহা অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাকে দীর্ঘকাল বাধা দেওয়া কংগ্রেসীয় সদস্যগণের পক্ষে সহজ নহে। এই কারণে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব অন্য আর একটি দিক হইতে বিচার করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি যে দলভুক্ত কংগ্রেসে (অর্থাৎ সেনেট ও প্রতিনিধি সভায়) যদি সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি অতি সহজেই নিজ মতানুযায়ী আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারেন। এইরূপ অবস্থায়, আইন ক্ষমতা কার্যতঃ শাসনবিভাগের করায়ত্ত হইয়া যায়। সংবিধান প্রণেতৃগণ কখনই ইহা ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু দলীয় রাজনীতির বিবর্তন সংবিধানের আক্ষরিক পরিবর্তন না করিয়াও, সংবিধানের একটি অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

বাণী-প্রেরণের ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি আইনের ব্যাপারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি কংগ্রেস প্রণীত আইন গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন। যে বিল বা খসড়া আইন কংগ্রেসের উভয় পরিষদে গৃহীত হয় তাহা সরাসরি আইন হিসাবে বিধিবদ্ধ হইয়া যায় না। বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতিজ্ঞাপক স্বাক্ষর

অবশ্যপ্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি সম্মতিজ্ঞাপক স্বাক্ষর না করিয়া আপন ইচ্ছানুযায়ী উহা, অর্থাৎ ঐ আইনটি Veto করিতে পারেন বা আপন অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে বিলটি সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তির কারণ সহ কংগ্রেসের যে পরিষদে বিল প্রথম আলোচিত হইয়াছিল, সেই পরিষদে পাঠাইতে হইবে। যদি আলোচ্য খসড়া আইন কংগ্রেসের প্রতি পরিষদে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করে, তাহা হইলে ঐ বিলটি পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য প্রেরিত হয়। এইবারে রাষ্ট্রপতি সম্মতিসূচক স্বাক্ষর না করিলেও বিলটি বিধিমত আইনে পরিণত হইয়া যায়। ১৭৮৯ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ৬০০ বার বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি এই ভিটো ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছেন। মাত্র ৩৬টি ক্ষেত্রে ভিটো-কৃত বিলগুলি কংগ্রেসের প্রতি পরিষদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে রাষ্ট্রপতির ভিটো-ক্ষমতা বা অসম্মতিজ্ঞাপক ইচ্ছা কত বেশী কার্যকর হইতে পারে। রাষ্ট্রপতির সর্বাঙ্গীণ রাজনৈতিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রভাব, তাঁহার বিপুল পৃষ্ঠপোষকতার (Patronage) ক্ষমতা এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নিজ দলীয় সদস্যদের সহায়তা রাষ্ট্রপতির ভিটো ক্ষমতাকে প্রায় অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতা দান করিয়াছে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যাপক মানরো বলিয়াছেন "………It has developed the presidency into something like a third chamber of the Congress, thus making the chief executive a more active figure in legislation than he was originally intended to be." অর্থাৎ ভিটো ক্ষমতা মারফত রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যতঃ তৃতীয় কক্ষে পরিণত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য সংবিধান স্রষ্টাদের এই অভিপ্রায় আদৌ ছিল না। সর্বশেষে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায় যে কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির অনভিপ্রেত কোন বিল আলোচিত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি তাঁহার বাণীর মাধ্যমে ভিটোর ভয় দেখাইয়া অনেক সময় কংগ্রেস আলোচিত বিলে তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী অদল-বদল করাইয়া লইতে পারেন।

ভিটো ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কর্তব্যের আরও একটি দিক লক্ষ্য করা আবশ্যক। সংবিধানের দ্বিতীয় ধারার তৃতীয় উপধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি বিশেষ অবস্থায় ("on extraordinary occasions") কংগ্রেসের দুইটি পরিষদ অথবা

যে কোন একটির অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। তিনি যদি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন, তাহা তিনি যে উদ্দেশ্যে অধিবেশন ডাকিয়াছেন তাহার কারণ ঘোষণা মারফৎ তাঁহাকে জানাইয়া দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত কংগ্রেসের যে কোন অধিবেশন স্থগিত (adjourn) রাখিবার সময় সম্বন্ধে যদি দুই পরিষদ একমত হইতে না পারেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির হুকুম অনুযায়ী অধিবেশন স্থগিত রাখিবার সময় নির্দিষ্ট হইবে।

কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিবার ক্ষমতা

সময় অভাবে অনেক সময় কংগ্রেস আইনের প্রধান ধারাগুলি পাস করিয়া খুঁটি নাটি ব্যাপার সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিয়া থাকেন। কিছু কিছু আইন আছে, যে বিষয়ে সকল প্রকার অবস্থা আন্দাজ করিয়া, অথবা ভবিষ্যতে কিরূপে সংশ্লিষ্ট আইনের বিষয়ীভূত বস্তু সম্বন্ধে জটিলতা উত্থিত হইতে পারে তাহা কল্পনা করিয়া আইনের ছোট ছোট বিষয় নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে তাহা করিতে হইলে প্রশাসনিক ব্যাপারে যে কার্যকরী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন কংগ্রেসের সদস্যদের তাহা নাই। এই সকল ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির উপর নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহাকে Delegated Legislation কহে। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক আজ্ঞা (Executive Order) দ্বারা কার্যতঃ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ক্ষমতা ব্যবহার দ্বারা রাষ্ট্রপতি অনেক ক্ষেত্রে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৩৩ সালে গৃহীত The National Recovery Act জাতীয় আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতির হাতে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার ব্যাপক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে। ১৯৩৪ এর The Trade Agreement Act বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য চুক্তি ও তাহার প্রসার কল্পে সর্বপ্রকার বিধি নিষেধ প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়। ব্যাপক হস্তান্তরিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া উচিত কি না, সেই বিষয়ে নানা বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলীন রুজেভেল্টের সময় (১৯৩৩-৪৫) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চাপে হস্তান্তরিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বিপুলাকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক সর্বাধ্যক্ষরূপে

Delegated Legislation বা হস্তান্তরিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা

কংগ্রেসের আইন কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সন্ধির সর্তাবলী কার্যকর করিবার জন্য আদেশ (Executive Orders) জারী করিতে পারেন। তেমনি প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক হিসাবে তাঁহাকে বহু আজ্ঞা প্রকাশ করিতে হয়, যাহা আইনের তুল্য এবং অন্যান্য আইনের ন্যায়ই কাজ করিতে থাকে।

জাতীয় বাজেট প্রস্তুতির ক্ষমতা

সর্বশেষে রাষ্ট্রপতি জাতীয় বাজেট (আয় ব্যয়) প্রস্তুতির একমাত্র অধিকারী। বাজেটের মাধ্যমে তিনি পরোক্ষ ভাবে কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীতব্য আইনের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। ভবিষ্যতে যে আইন প্রণয়ন করা হইবে তাহা যদি ব্যয়সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে, সেই আইনের জন্য অর্থবরাদ্দ করা আবশ্যক। যদি রাষ্ট্রপতি অর্থের বরাদ্দ না করেন, তাহা হইলে ঐরূপ আইন প্রণয়ন করা কংগ্রেসের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য কংগ্রেস বাজেট পরিবর্তন করিতে পারেন; বলা বাহুল্য যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রস্তুত বাজেট পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নহে।

রাষ্ট্রপতির বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতিকে বিচার বিভাগীয় তিন প্রকার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি-বিশেষকে ক্ষমা (Pardon) করিতে পারেন; কোন দণ্ডিত ব্যক্তির শাস্তি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে পারেন (Reprieve) অথবা ঘোষণা প্রকাশ করিয়া একই সঙ্গে ও একই অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমষ্টির প্রতি শাস্তিমূলক আদেশ সামগ্রিকভাবে মকুব করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু যাহারা বিধান অনুযায়ী Impeached বা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপরোক্ত তিনটি ক্ষমতার একটিও দেওয়া হয় নাই। সাধারণত রাষ্ট্রপতি Department of Justice বা বিচারবিভাগীয় সুপারিশ অনুযায়ী এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি আপন ইচ্ছায়ও এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ও নির্বাচন পদ্ধতি: সংবিধানের দ্বিতীয় ধারার প্রথম উপধারায় লিখিত হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল চার বৎসর হইবে। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার সংবিধান পরিষদে প্রথমতঃ স্থির হইয়াছিল যে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ৭ বৎসর হইবে। কিন্তু পুনর্বিবেচনার পর চার বৎসরের কার্যকালই শেষ পর্যন্ত স্থির হয়।

কার্যকাল

একই রাষ্ট্রপতি কতবার রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারেন, সেই বিষয়ে ফিলাডেলফিয়া সংবিধান প্রণয়ন সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্ত হয় না। প্রথম রাষ্ট্রপতি দুইবার নির্বাচিত হইবার পর তৃতীয় বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অস্বীকার করেন। তখন হইতে এই প্রথা দাঁড়াইয়া যায় যে কোন রাষ্ট্রপতি দুইবারের বেশী ঐ পদের জন্য নির্বাচন দ্বন্দ্বে নামিবেন না। গ্রান্ট (U. S. Grant) দুইবারের পর তৃতীয় বার তাঁহার দলের মনোনয়ন প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হন। থিওডোর রুজেভেল্ট (Theodore Roosevelt) তৃতীয় বারের নির্বাচনের জন্য দলীয় মনোনয়ন পান বটে, তবে তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন। ক্যালভিন কুলীজের (Calvin Coolidge) তৃতীয় বার নির্বাচনের কথা উঠে। তখন সেনেট প্রস্তাব গ্রহণ করে যে রাষ্ট্রপতির তৃতীয় কার্যকাল অসমীচীন এবং দেশের স্বাধীনতার ও দেশপ্রেমিকতার পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইবে। রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলীন রুজেভেল্ট ১৯৩৩ সাল হইতে পর পর দুইবার নির্বাচিত হইয়া রাষ্ট্রপতি পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪০ সালে তিনি ডেমোক্রাটিক দলের (Democratic Party) মনোনয়ন লাভ করেন এবং তৃতীয় বার বিপুল ভোটাধিক্যে রাষ্ট্রপতি রূপে পুনর্নির্বাচিত হন। এমন কি ১৯৪৪ সালে তিনি চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার এক বৎসর পর ১৯৪৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলীন্ রুজেভেল্টের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অসামান্য প্রশাসনিক সাফল্যের জন্যই আমেরিকার জনগণ ১৬১ বৎসরের পুরাতন প্রথাকে ভঙ্গ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু যে প্রথা পূর্বে প্রবর্তিত ছিল তাহার গণতান্ত্রিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য ১৯৫১ সালে সংবিধানের দ্বাবিংশতম সংশোধনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি দুইবারের বেশি রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সংবিধান প্রণয়ন সম্মেলনে যে বিষয়টি দীর্ঘতম বিতর্কের উত্থাপন করিয়াছিল, সেইটি হইতেছে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি। রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন—এইরূপ ব্যবস্থা করিলে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন লইয়া একটি বিরাট বিক্ষোভ, গণ্ডগোল ও শান্তিভঙ্গকারী আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া ফিলাডেলফিয়া সংবিধান সম্মেলন স্থির করেন যে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২ ধারায় নির্বাচন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮০৪ সালে গৃহীত দ্বাদশ সংশোধন ঐ পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করিয়াছে।

প্রতি লীপ ইয়ার (Leap Year) অর্থাৎ ৪ বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংঘটিত হয়। তাহার বহু পূর্বেই নির্বাচন আন্দোলন সুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান দল—ডেমোক্র্যাটিক দল ও রিপাবলিক্যান্ দলের অঙ্গরাষ্ট্রীয় শাখা সমূহ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে কাহাদিগকে প্রার্থী রূপে মনোনীত করা যাইতে পারে, তাহাই আলোচনা করিবার জন্য সম্মেলনে মিলিত হয় এবং দলের জাতীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্মেলনে আপনাপন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ডেমোক্র্যাটিক ও রিপালিক্যান্ দল এই সকল প্রতিনিধিবর্গ গঠিত নিজ নিজ জাতীয় সম্মেলনে মিলিত হয় এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি রূপে আপনাপন দলের প্রার্থী মনোনীত করে। প্রার্থী মনোনয়ন শেষ হইলে দুইটি দলের প্রার্থীগণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপী সফর করিতে থাকে এবং শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক অথচ তীব্র রাজনৈতিক্ সংগ্রাম সুরু হইয়া যায়। অবিরত প্রচার, সভাসমিতি, আলোচনা বৈঠক, রেডিও-টেলিভিশন্, সংবাদপত্রের আন্দোলন, মিছিল প্রভৃতি, সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রকে সরগরম করিয়া তোলে।

নির্বাচন সংস্থা (Electoral College) : প্রতি অঙ্গরাষ্ট্র হইতে যে কয়জন প্রতিনিধি সভার ও সেনেটের সদস্য কংগ্রেসে নির্বাচিত হন, প্রতি লীপ ইয়ারে (Leap Year) অর্থাৎ চার বৎসর অন্তর নভেম্বর মাসে সেই সংখ্যক নির্বাচক প্রতি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র হইতে নাগরিকগণের ভোটে নির্বাচিত হইয়া নির্বাচন সংস্থায় অথবা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলীতে স্থান পান। প্রতি অঙ্গরাষ্ট্রে প্রতিনিধিগণ তাহাদের রাষ্ট্রে মিলিত হইয়া রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ভোট দিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে তাহারা কেবল মাত্র আপন রাষ্ট্রের নাগরিকগণের মধ্য হইতেই রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি বাছিয়া লইয়া ভোট দিতে পারেন না। ঐ দুইজনের মধ্যে অন্ততঃ একজন অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইতেই হইবে। তাহার পর ভোটের বাক্স সীল করিয়া ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়। সেখানে সেনেট ও প্রতিনিধি সভার সদস্যদের সম্মুখে সেনেটের অধ্যক্ষ (Presiding Officer) কর্তৃক ভোট-বাক্সগুলি খোলা হয় এবং ভোট গণনা আরম্ভ হয়। যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি ভোট পান তিনি রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাকে নির্বাচক সংস্থার মোট সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পাইতে হইবে। যদি কেহ এইরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত তিনজনের অনধিক ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে প্রতিনিধি সভা (House of Representatives) ভোটাধিক্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিবেন ; স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই নির্বাচনে

প্রতি অঙ্গরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সম্মিলিতভাবে একটি করিয়া ভোট থাকিবে। এই নির্বাচনের সময় সমস্ত অঙ্গরাষ্ট্রগুলির অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের উপস্থিতি আবশ্যক ; এবং প্রতিনিধি সভা কর্তৃক বৈধভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে হইলে তাঁহাকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশি অঙ্গরাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করাও প্রয়োজন। যদি প্রতিনিধি সভা ৪ঠা মার্চের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য চালাইয়া যাইবেন। ডিসেম্বরে নির্বাচন শেষ হয়, তাহার পর বৎসর ২০ শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি সরকারীভাবে পদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে যদিও সংবিধানানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচক সংস্থার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তথাপি কার্যতঃ ইহা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরিণত হইয়াছে। কারণ নির্বাচন সংস্থার প্রতিটি সদস্য আপন নির্বাচনকালে তাহার দল কর্তৃক মনোনীত রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীদ্বয়কে ভোট দিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া নির্বাচিত হন। নাগরিকগণ এই সর্তেই নির্বাচকবৃন্দকে ভোট দিয়া থাকেন। অর্থাৎ নির্বাচক-মণ্ডলী নাগরিক সাধারণের আজ্ঞাবাহী মাত্র। আবার নাগরিকগণের মতামতের পশ্চাতে রহিয়াছে রাজনৈতিক দল দুইটির প্রচার। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি বস্তুতঃ নাগরিক সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রে অতি শক্তিশালী, বিপুল-অর্থবান, অত্যন্ত সুসম্বদ্ধ রাজনৈতিক দলের উদ্ভব রাষ্ট্রপতির অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনকে কার্যতঃ প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরিণত করিয়াছে।

অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরিণত

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক ও জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে। তিনি যদি নাগরিক হিসাবে অন্ততঃ ১৪ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে বস-বাস না করিয়া থাকেন তবে তিনি প্রার্থী হইতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির বেতন প্রভৃতি কংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত হয়। কিন্তু তাহা রাষ্ট্রপতির কার্যকালে বাড়ানো কিম্বা কমানো চলে না।

রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীর গুণাগুণ ও রাষ্ট্রপতির অধিকার

রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে হোয়াইট্ হাউস্ (White House) নামক রাষ্ট্রপতি ভবনে বাস করেন। তাঁহার দপ্তর খানাও ঐখানেই অবস্থিত। রাষ্ট্রপতি কোন বিচারালয়ের অধীন নহেন এবং তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য কোন পরোয়ানা বা হুকুম জারি করা চলে না। সংবিধানে উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুসারে তাঁহাকে অভিযুক্ত (Impeach) করা চলে এবং

বিচারে যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হন তাহা হইলে তাঁহাকে রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত করা চলে, বা ভবিষ্যতে কোন পদ পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায়; অন্য কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া চলে না। রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করিবার ক্ষমতা একমাত্র প্রতিনিধি সভাকে দেওয়া হইয়াছে; তাহাদের অভিযোগ অনুসারে সেনেট রাষ্ট্রপতির বিচার করিবার অধিকারী। সেনেটের বিচার সভায় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করেন। সেনেটে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে উপরে উল্লিখিত শাস্তি দান করা যাইতে পারে।

উপরাষ্ট্রপতিঃ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রথার অনুরূপ। যদিও একই সময়ে উভয়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তথাপি ঐ দুইটি নির্বাচন পৃথক রাখা হইয়াছে। নির্বাচক সংস্থার প্রতিনিধিগণ একই সময়ে পৃথক ভাবে দুইটি পদের নির্বাচনে ভোট দিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিক হইয়া থাকেন। উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল—ইহার যে কোন দুইটি হইতে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি মনোনীত হন। ভোট পাইবার সুবিধার জন্য দলগুলি এই দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া থাকে।

উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদত্যাগ ও অপসারণের ক্ষেত্রে, তাঁহার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তিনি সেনেটের সভাপতি হিসাবে কর্তব্য সম্পাদন করেন। লক্ষণীয় যে এই দিক হইতে ভারতীয় উপরাষ্ট্রপতির সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় উপরাষ্ট্রপতির সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর উপরিতন পরিষদের সভাপাল। সেনেটে ভোটের সমতা হইলে তিনি একটি ভোটের অধিকারী হন, নতুবা তিনি নিরপেক্ষ সভাপাল হিসাবে কর্তব্য করিয়া যান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উপরাষ্ট্রপতির করণীয় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই কারণে এই পদটি মর্যাদাপূর্ণ হইলেও, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে মনঃপীড়া দায়ক হইয়া উঠিতে পারে। সাম্প্রতিক কালে কোন কোন রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতিকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কর্মদক্ষ উপরাষ্ট্রপতিগণের রাজনৈতিক কর্মে সংযুক্ত হইবার সুযোগ হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলীন রুজেভেল্ট উপরাষ্ট্রপতি ওয়ালেস (Wallace) ও পরবর্তীকালে উপরাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানকে গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ভার দিয়াছিলেন; রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারও (Eisenhower) তেমনি উপরাষ্ট্রপতি নিক্সনের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। নিক্সন সময়ে সময়ে রাষ্ট্রপতির মন্ত্রী পরিষদে সভাপতিত্বও করিয়াছেন। এই নূতন পরিবর্তনের মধ্যে উপরাষ্ট্রপতিগণকে রাষ্ট্রের

কর্তব্যে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যদি উপরাষ্ট্রপতিকে কখনও রাষ্ট্রপতির স্থলে অভিষিক্ত হইতে হয়, তাহা হইলে যাহাতে তিনি যোগ্যতার সহিত রাষ্ট্রপতির কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন—এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

উপরাষ্ট্রপতি পদ-প্রার্থীর রাষ্ট্রপতি পদ-প্রার্থীদের মতই গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন। তিনিও চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনিও অবস্থা বিশেষে প্রতিনিধি সভাকর্তৃক অভিযুক্ত (Impeached) হইলে সেনেট কর্তৃক একই নিয়মানুযায়ী বিচারের অধীন।

উপসংহার ঃ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে দলীয় নেতা ও জাতির নেতা।* অমিত ক্ষমতাশালী প্রশাসনিক অধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহার গুরুত্ব কম নহে। তাঁহার বিচার বিভাগীয় অধিকারগুলি সীমিত হইলেও অর্থপূর্ণ। সমস্ত মিলাইয়া তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী প্রশাসনিক কর্তা পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না। তাই অগ্ ও রে (OGG and Ray) Introduction to American Government গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ইউরোপীয় একনায়কত্বের সর্বে-সর্বাগণ ব্যতীত সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী শাসক। সিডনী হাইম্যান তাঁহার 'The American President' গ্রন্থে লিখিতেছেন: "The American President not only reigns. He also rules. He is and does." অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রাজার ন্যায় রাজত্ব করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সত্যই আমেরিকায় ও পৃথিবীর সর্বত্র রাষ্ট্রপতি রাজারই ন্যায় সম্মানিত। তাঁহার বাস্তব ক্ষমতার তো কথাই নাই। ব্রাইস বলিয়াছেন: "The President is the nearest and the dearest substitute for a royal ideal which the Americans possess." অর্থাৎ অন্য কোন কোন দেশে যেমন রাজা রহিয়াছে, তেমনি আমেরিকার নাগরিকেরা

রাষ্ট্রপতি—দলীয় ও জাতীয় নেতা, জাতীয় মর্যাদার প্রতীক

* রাষ্ট্রপতি উডরো উইল্‌সন্ তাঁহার Congressional Government এ বলিয়াছেন: "He (President) may be both the leader of his party and the leader of the nation or he may be one or the other. It he leads the nation his party can hardly resist him."

তাহাদের গণতন্ত্রের সহিত খাপ খাওয়াইয়া রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাঁহাকে প্রায় রাজার মতই মর্যাদা ও প্রতিপত্তি দান করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দুইটি উপাদানের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব; দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক পরিবেশ। লিঙ্কন, জ্যাক্সন, থিওডোর রুজেভেল্ট ও ফ্র্যাঙ্কলীন রুজেভেল্ট যেমন ব্যক্তিত্বশালী মানুষ ছিলেন, তাঁহারা কংগ্রেসের অকুণ্ঠ সমর্থনও লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহারা যে ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন, তেমন ক্ষমতা অনেক রাষ্ট্রপতি লাভ করিবার

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল

সুযোগ পান নাই। উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে ভাগ্যবান না হইলে রাষ্ট্রপতি রাজার সম্মানের সহিত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি উইলসন্ তাঁহার 'Congressionl Government'-এ মন্তব্য করিয়াছেন: "The President has been one thing at one time and another, at another time, varying with the man who occupied the office, and with the circumstances that surround him." অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির মর্যাদা তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং যুক্তরাজ্যের (United Kingdom) প্রধান মন্ত্রী ও নৃপতি ঃ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক ও শাসন-নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একক ও অনন্য। রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদ তাঁহার উপদেষ্টা বা সহকারী মাত্র। তাহারা রাষ্ট্রপতির নীতি (Policy) কার্যে পরিণত করিবার যন্ত্র বই কিছু নহে। রাষ্ট্রপতি তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন অথবা ইচ্ছা করিলে, তাহা না-ও করিতে পারেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু যুক্তরাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট গঠন করেন সত্য; কিন্তু ক্যাবিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণ করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর নাই। কারণ ক্যাবিনেটই যুক্তরাজ্যে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতার অধিকারী, প্রধান মন্ত্রী একা নহেন। তাঁহার মত ক্যাবিনেট গ্রহণ না করিলে তিনি ক্যাবিনেট ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাহা করিলে তিনি নিজ দলের নিকটেই অপদস্থ হইয়া যান। তাই সেইরূপ পন্থা তিনি কদাচিৎ অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শাসক হিসাবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা শক্তিশালী।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে

রাষ্ট্রপতির অপ্রত্যক্ষ আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা রহিয়াছে এবং তাহার গুরুত্বও কম নহে ; কিন্তু তথাপি যুক্তরাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর হস্তে যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আছে তাহার তুলনায় রাষ্ট্রপতির অনুরূপ ক্ষমতা নগণ্য। বলা বাহুল্য যে প্রধানমন্ত্রীর পশ্চাতে কমন্‌স সভার অধিকাংশের দলীয় সমর্থন আছে বলিয়াই প্রধানমন্ত্রী ও তাহার ক্যাবিনেট সহকর্মীগণ আইনপ্রণয়ন ক্ষেত্রে প্রায় সর্বসময় ক্ষমতাশীল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই স্থলেও প্রধানমন্ত্রী একক নহেন। এই ক্ষমতা সমগ্র ক্যাবিনেটের ; তবে প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদী নেতৃত্ব তাঁহাকে আইনের ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের অথবা জাতির প্রতিনিধি ও প্রশাসনিক অধ্যক্ষ। তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচক-সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন বটে, কিন্তু এই নির্বাচন কার্যতঃ প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরিণত হইয়াছে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীও পরোক্ষভাবে সমগ্র নাগরিক বা জাতি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাহার কারণ এই যে সাধারণ নির্বাচনের সময় ব্রিটেনের নির্বাচক-মণ্ডলী তিনটি দলের মধ্যে একটি দল এবং তাহার নেতাকে সমর্থন করে। নির্বাচন দ্বারা একটি দল কমন্‌স্ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সেই দলের নেতাই প্রধান মন্ত্রীরূপে সরকার গঠন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রধান মন্ত্রী জাতির প্রতিনিধি। ইহা ব্যতীত তিনি কমন্‌স্ সভারও পরোক্ষভাবে মনোনীত প্রধান-শাসক। কারণ তিনি এবং তাঁহার ক্যাবিনেট কমন্‌স্ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন-পুষ্ট। আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কংগ্রেসের সহিত এইরূপ অঙ্গাঙ্গী যোগ নাই। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টের নেতা। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা ন্যূন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সদস্য হিসাবে যে ব্যক্তিগত প্রভাব পার্লামেণ্টের উপর বিস্তার করিতে পারেন, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের উপর তদ্রূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। কারণ তিনি কংগ্রেসের সদস্য নহেন। তাঁহার মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যগণও কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি বাণী প্রেরণ করিয়া, কোন বিশেষ উপলক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হইয়া ভাষণ দান করিয়া এবং এবং আপন দলীয় সদস্যগণের মারফত পরোক্ষ প্রভাব কংগ্রেসের উপর বিস্তার করিতে পারেন। ইহার মূল্য কম না হইলেও, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাজ্যের পার্লামেণ্টের উপর যে ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার সহিত তুলনীয় নহে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কোন একটি দলের নায়ক। তাঁহাকে দলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা এবং দলের বিশ্বাস অর্জন করিতে হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে দলের নির্দেশ অগ্রাহ্যও করিতে পারেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যদি আপন দলকে অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই কারণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিরঙ্কুশ, প্রধানমন্ত্রীর নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সমগ্র প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষ পদমর্যাদা নাই। যুক্তরাজ্যে রাজা স্বয়ং ব্রিটিশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অধিনায়ক। তবে প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী ক্যাবিনেটের নেতা হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্বন্ধেও তিনি সেই সূত্রে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপতি সেনেটের সম্মতিক্রমে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অধিকারী। এই ক্ষেত্রে যদিও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সেনেটের সম্মতি সাপেক্ষ, তথাপি কার্যতঃ রাষ্টপতির নেতৃত্ব এই বিষয়ে প্রায় নিরঙ্কুশ। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য, কিন্তু এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেটকেই গ্রহণ করিতে হয়। এই স্থলেও পার্লামেণ্টের সম্মতি অপরিহার্য; কিন্তু তাহা নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জাতীয় নেতা, আমেরিকার গণতান্ত্রিক সমাজের মুখপাত্র, বৈদেশিক রাষ্ট্রের চক্ষে ও কার্যতঃ জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। পররাষ্ট্রের দূত ও প্রতিনিধি জাতির পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত ও সম্বর্ধিত হন। এই দিকেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ন্যূন। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির আসন ব্রিটিশ নৃপতির সঙ্গে তুলনীয়। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে যুক্তরাজ্যের জাতীয় জীবনে রাজার যে অশেষ সম্মানের স্থান তাহা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির নাই। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের চতুর্দিকে যুগযুগান্তের একটি ভাবালুতার মণ্ডল সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ইহার ফলে জাতির অন্তর্লোকের মণিকোঠায় সম্ভ্রম, গৌরব ও পূজার আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যুক্তরাজ্যের নৃপতির আসনের প্রাচীনতা ও ঐতিহ্যও ইহাকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। যুক্ত-রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও সাম্যমূলক পরিবেশে এইরূপ মনোভাবের উদয় সম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি মাত্র চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি ব্রিটিশ রাজের ন্যায় সমালোচনার উর্ধ্বেও নহেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির আসন ঐ অর্থে পূজ্য আসন নহে; কিন্তু তিনি জাতির মর্যাদার প্রতীক এবং যে গণতান্ত্রিক শ্রদ্ধার তিনি

অধিকারী তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন প্রকৃত শাসকের ভাগ্যে জোটে নাই। কিন্তু রাষ্ট্রপতির প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা বিপুল। ব্রিটিশরাজের তাহা একেবারেই নাই। সত্যই বলা হইয়াছে: "The American President not only reigns. He also rules." (Hyman)

উপরোক্ত আলোচনা হইতে অধ্যাপক ল্যাস্কির মত সমর্থিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে: "The President of the United States is both more or less than a King, he is also both more and less than a Prime Minister." অর্থাৎ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে নৃপতি বা প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা গৌরব ও ক্ষমতায় ছোট এবং বড়"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদ এবং শাসনবিভাগ

(President's Cabinet and the Departments)

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিপরিষদ একেবারেই উল্লিখিত হয় নাই। মন্ত্রিপরিষদটি সংবিধান বহির্ভূত, পরবর্তীকালে উদ্ভূত শাসন যন্ত্র। ১৭৮৯ সালের সংবিধানের দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় উপধারায় লিখিত হইয়াছে "He (President) may require the opinion in writing of the principal offices in each of the executive departments upon any subject relating to the duties of their respective office...." অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি প্রতি শাসন বিভাগের অধ্যক্ষকে তাঁহার বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত মতামত দিবার জন্য আজ্ঞা করিতে পারেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন প্রথমতঃ সেনেট ও পরে সুপ্রীমকোর্টের নিকট রাষ্ট্রপরিচালন নীতি সম্বন্ধে উপদেশ চাহিয়া পাঠান। তাহারা কোন মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন। ১৭৯১ সালে তিনি বিভিন্ন বিভাগের কর্তাদের বৈঠক ডাকিয়া আলোচনা সুরু করেন। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের সূচনা হইল। ১৭৯৩ সাল হইতে রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে সম্মিলিত বিভাগীয় অধ্যক্ষদের সমষ্টি 'Cabinet' নামে পরিচিত হয়। ক্যাবিনেট বা মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত, তাঁহার সহকারী বিশেষ। ক্যাবিনেটের

সম্মিলিত অস্তিত্ব নাই। মন্ত্রিপরিষদের প্রতি সদস্য পৃথকভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়িত্বশীল। ক্যাবিনেটের স্বরূপ ও প্রকৃত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। তিনি তাহাদের নিয়োগ করেন, এবং তিনি তাঁহার অভিরুচি অনুযায়ী ক্যাবিনেটের কোন সদস্যকে বিদায় দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ করিতে পারেন অথবা তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াও শাসন কার্য পরিচালনা করিতে পারেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাই করুন কেন, রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট এখন শাসন ব্যবস্থার একটি স্বীকৃত অংশ, যদিও আইনের চক্ষে তাহার কোন সত্তা নাই। রাষ্ট্রপতির পরামর্শ দাতা, মন্ত্রিপরিষদীয় সদস্যগণ কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারেন না। ক্যাবিনেটের অধিবেশন সাধারণতঃ সপ্তাহে একবার হইয়া থাকে। আলোচনার ধরা বাঁধা কোন নিয়ম নাই, আলোচ্য বিষয় কদাচিৎ ভোটে দেওয়া হয় এবং আলোচনার কোন সরকারী বিবরণীও রক্ষিত হয় না। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের ন্যায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের কোন সম্মিলিত সত্তা নাই। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের প্রতি সদস্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহাদের বিভাগের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে দায়ী। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আপন দল হইতেই তাহার ক্যাবিনেট সহকর্মীদের বাছিয়া লন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি অন্য দলীয় বা নির্দলীয় ব্যক্তিকে তাহার ক্যাবিনেটে স্থান দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি রুজেভেল্ট ১৯৪০ সালে ষ্টিম্‌সন (Stimson) ও নক্স (Knox) নামক দুই জন বিশিষ্ট রিপাবলিক্যানকে আপন ক্যাবিনেটে স্থান দিয়াছিলেন যদিও তিনি নিজে ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতা ছিলেন। তাহার পূর্বে থিওডোর রুজেভেল্ট ও টাফ্‌টও (Taft) ডেমোক্র্যাটিক দলের ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, যদিও তাঁহারা উভয়েই ছিলেন রিপাবলিক্যান দলভুক্ত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বীয় দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে ক্যাবিনেটে না লইয়া পারেন না, তাহার কারণ এই যে তিনি নিজে দলের সর্বশ্রেষ্ঠ পার্লামেণ্টারী নেতা বলিয়া দলীয় একতা রক্ষা করিতে উৎসুক থাকেন। উল্লিখিত উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে তাহা করিতে হয় না। তাঁহার ইচ্ছা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ; দলীয় নির্দেশ তাহার মনোনয়নকে বাধা দিতে পারে না। তবে রাষ্ট্রপতির দলভুক্ত ব্যক্তিগণই সাধারণতঃ মনোনীত হইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট তাহার পরামর্শদাতা মাত্র

রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের সাপ্তাহিক আলোচনা বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ

সম্বন্ধে তথ্য জানিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়া থাকেন। বিভাগগুলির কার্যাবলী সামঞ্জস্য সাধন (co-ordination) আলোচনা বৈঠকের একটি প্রধান কাজ। তাই অধ্যাপক মান্‌রো (Munro) লিখিয়াছেন: "They (Cabinet meetings) provide a clearing house which helps the administration to put unity to its programme." অর্থাৎ ক্যাবিনেট সভাগুলি বিভিন্ন বিভাগের নীতির আদান প্রদান ও মিলন ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

অধ্যাপক অগ্‌ (Ogg) লিখিয়াছেন: "A Cabinet officer must assume that he will live in his term in the Presidential shadow." অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটের মন্ত্রী তাহার কার্যকাল রাষ্ট্রপতির ছায়াতেই অতিবাহিত করেন। ইহা খুবই সত্য; কিন্তু ক্যাবিনেট সদস্যগণ বক্তৃতা ও সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে অনেক সময় জনমত গঠন করিয়া থাকেন এবং সরকারী প্রচেষ্টার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে প্রয়াস পান। ইহা ব্যতীত প্রতি মন্ত্রী একটি বিভাগের কর্তা হিসাবে সেই বিভাগের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা করেন এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী তাহাকে তথ্য সরবরাহ করেন এবং উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রতি মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার বিভাগীয় কর্মচারিগণের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করেন। কোন কোন বিভাগের (*যথা বাণিজ্য বিভাগ ও অর্থবিভাগ প্রভৃতি*) আধা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও রহিয়াছে। শুল্ক স্থাপন, কর নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ক বিবাদের প্রাথমিক মোকদ্দমা মীমাংসার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রিবর্গের কর্তব্যাদি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা যদিও প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী শাসক নহেন, তথাপি তাঁহাদের করণীয় কার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার ধারা ও সৌকর্য্য তাহাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ (Departments of Administration)

১। **রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী (The Secretary of State):** যুক্তরাষ্ট্রে সবশুদ্ধ দশটি বিভাগ আছে। প্রতি বিভাগ একজন মন্ত্রী পরিচালনা করেন। প্রতি মন্ত্রী বৎসরে ১৫,০০০ ডলার বেতন পাইয়া থাকেন। রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী পররাষ্ট্র বিভাগের কর্তা। ইনি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সকল সন্ধি প্রভৃতি তাহার

দপ্তরে রক্ষা করিয়া থাকেন। কোন কোন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীকে পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়া থাকেন। এইরূপ করিলে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী ক্যাবিনেটের মধ্যে ও বাহিরে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে অন্যান্য মন্ত্রী অপেক্ষা প্রাধান্য পান। ক্যাবিনেট সভায় তাহার আসন রাষ্ট্রপতির দক্ষিণে। এই প্রাধান্য আছে বলিয়া তিনি যুক্ত-রাষ্ট্রের সরকারী সীল-মোহরের (The Great seal of the United States) রক্ষক। তাহার দপ্তরই সমস্ত আভ্যন্তরীণ চিঠিপত্রাদি নিয়মিত ভাবে, বিভাগ অনুযায়ী বণ্টন করিবার অধিকারী। কংগ্রেসের সমস্ত আইন আদেশ তাহার দপ্তরেই সযত্নে রক্ষিত হয়।

২। অর্থমন্ত্রী (Secretary of the Treasury):—ইনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থবিভাগের কর্তা ও রাষ্ট্রীয় অর্থকোষের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের কর আদায় ও তাহার সংরক্ষণ, কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী জাতীয় অর্থভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ দান, মুদ্রা প্রস্তুত করণ, কর ফাঁকি, জাল মুদ্রা সম্বন্ধে তদন্ত প্রভৃতি কর্তব্য অর্থমন্ত্রীর দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত।

৩। আইন মন্ত্রী (The Attorney-general):—ইনি বিচার বিভাগের কর্তা এবং রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গের বিভাগীয় আইন সমস্যা বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনভঙ্গ বিষয়ক তদন্ত, অপরাধীর আইনানুযায়ী বিচারান্তে শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা, জেল প্রভৃতি এই মন্ত্রীর বিভাগের অন্তর্গত।

৪। ডাক-তার বিভাগীয় মন্ত্রী:—ইনি ডাক-তার ও বেতার বিভাগের কর্তা। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এই বিভাগ হইতে বিস্তর আয় হইয়া থাকে। তাই এই বিভাগটি একটি সরকারী বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

৫। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of the Department of the Interior)—জরীপ, সরকারী জমি ক্রয়-বিক্রয়, রেড ইণ্ডিয়ানদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং Puerto Rico (পিউয়েটো রিকো), Virgin Islands (ভার্জিন দ্বীপ) প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকৃত স্থানগুলির শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি এই বিভাগের কর্তব্য।

৬। কৃষিমন্ত্রী:—(Minister of Agriculture) ইনি কৃষিবিভাগীয় প্রধান হিসাবে কৃষি, কৃষি-সার, পশুপালন শস্যনাশক কীটপতঙ্গের বিনাশ সাধন, কৃষি বিষয়ক অর্থনীতি, খাদ্য ও ঔষধ প্রভৃতি সম্বন্ধে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং বনবিভাগ, রাস্তা প্রভৃতি বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করেন।

৭। বাণিজ্য বিভাগ (Ministry of Commerce):—আদমসুমারী,

বৈদেশিক বাণিজ্য, ওজন, পেটেন্ট ও কপিরাইট, আলোকস্তম্ভ, রাসায়নিক পরীক্ষণাগার প্রভৃতিও বাণিজ্য বিভাগের এলাকাভুক্ত।

৮। শ্রমমন্ত্রী (Minister of the Department of Labour): শ্রমজীবীগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন এই মন্ত্রীর কর্তব্য। শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, নারীকর্মীদের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থাও এই বিভাগেরই করণীয়।

৯। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (Minister of the Department of National Military Establishment) : সৈন্য, নৌ ও বিমান বহর এই বিভাগের অন্তর্গত।

১০। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণমন্ত্রী (Minister of the Department of Health, Education and Welfare) :—এই বিভাগীয় মন্ত্রী জাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক কার্যে লিপ্ত আছেন।

অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান : উপরে উল্লিখিত মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিচালিত প্রধান বিভাগ বা Department ব্যতীত আরও তিন শ্রেণীর শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সেইগুলি যদিও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে তথাপি তাহাদের Department গুলির মর্যাদা নাই। বিশেষ লক্ষণীয় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি Department বা বিভাগের অধীনে নহে। তাহারা অল্প-বিস্তর স্বাধীনতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভোগ করিয়া থাকে। (ক) কতকগুলি শাসন প্রতিষ্ঠান মাত্র একজন শাসকদ্বারা পরিচালিত; (খ) কয়েকটি প্রতিষ্ঠান Board বা কমিশন নামে পরিচিত (গ) কর্পোরেশন, যেমন টেনেসি ভ্যালী অথরিটি (Tennessy Valley Authority অথবা T. V. A)। এই নিম্নতন শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণ অথবা কংগ্রেসের আইনের অধীন। (ঘ) জেল দপ্তর (Bureau of Prisons) আইন মন্ত্রীর, খনি দপ্তর (Bureau of Mines), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর, পশুপালন দপ্তর ও পথ-দপ্তর (Bureau of Public Roads) কৃষি বিভাগের নিয়ন্ত্রাধীন। বলা বাহুল্য যে এই দপ্তরগুলি রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বের এলাকাভুক্ত। কর্পোরেশনগুলি কংগ্রেসের আইনদ্বারা বিধিবদ্ধ।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনিক কর্মীগণের শ্রেণীবিভাগ : (Classification of Administrative Officers) : ব্যাপকভাবে বিবেচনা করিলে যুক্তরাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী রহিয়াছেন। যাহারা উচ্চ কর্মচারী তাহাদের সরকারী রাজনৈতিক কর্মচারী বলা যাইতে পারে। মন্ত্রিগণ, উপ-মন্ত্রী ও সহকারী মন্ত্রিগণ, দপ্তরের প্রধান (Bureau Chiefs), সরকারী বিভাগগুলির বিভিন্ন

শাখার প্রধান, শাসনতান্ত্রিক কমিশন বা বোর্ডের সদস্যগণ এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছেন নিম্নতন কর্মচারীবৃন্দ। দুইটি শ্রেণী মিলাইয়া সরকারী কর্মচারীগণের সংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ। যে নিয়মানুযায়ী এই বিভাগ করা হইয়াছে তাহা এইরূপ—যে সকল উচ্চ বা অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদাধিকারীর প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ করিতে হয়, সেই সকল পদগুলি রাজনৈতিক নিয়োগের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট সকল পদই অরাজনৈতিক নিয়োগ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই শ্রেণী-বিভাগ নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহার ইতিহাসও চিত্তাকর্ষক। রাজনৈতিক নিয়োগগুলিকে কংগ্রেসীয় আইন অনুসারে unclassified বা শ্রেণী-বহির্ভূত নিয়োগ বলা হইয়াছে। অরাজনৈতিক নিয়োগ ঐ আইন অনুযায়ী classified বা শ্রেণীভুক্ত নিয়োগ। এই আইনটি পেন্‌ডেল্‌টন আইন (Pendleton Act. 1883) বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

আমেরিকার আমলাতান্ত্রিক সংস্কার (Civil Service Reform in America): প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সরকারী কর্মচারীগণকে গুণানুসারে নিযুক্ত করিবার নীতি স্বীকার করিয়া লন। দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি জন এ্যাডামস্ (John Adams) দলীয় ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তিনি ওয়াশিংটন প্রবর্তিত নীতি মানিয়া চলেন। রাজনৈতিক দলের উগ্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির মর্যাদা ভঙ্গ হইতে লাগিল। দলীয় রাষ্ট্রপতি নূতন চাকরিতে অথবা কোন শূন্যস্থলে আপনার দলীয় ব্যক্তি এবং অনুগত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় রাষ্ট্রপতি জেফারসনের (Jefferson) আমলে এই নিয়োগনীতি প্রথম অনুসৃত হইল। এমনকি তিনি কিছু কর্মচারীর কার্যকাল খতম করিয়া সেখানে দলীয় ব্যক্তি নিয়োগ করিলেন। পরবর্তী তিন জন রাষ্ট্রপতি ম্যাডিসন, (Madison) মন্‌রো (Monroe) ও জন কুইন্‌সি এ্যাডামস জেফার্‌সনের দলভুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা বেশী লোকের চাকরি খতম করেন নাই। সপ্তম রাষ্ট্রপতি জ্যাক্‌সনের আমলে কিন্তু ঐ নীতি ব্যাপকভাবে প্রযোজিত হইল এবং তিনি অনেক কর্মচারীর কার্যকাল অবসান করাইয়া দলীয় ব্যক্তি ও আপনার লোক নিয়োগ করিলেন। এমনি করিয়া আমেরিকার 'Spoils System'-এর উদ্ভব হইল। শুধু চাকরি নহে, ক্রমশঃ কনট্রাক্ট, লাইসেন্স প্রভৃতিও দলীয় লোকদের জন্যই রাখা হইল। ১৮৩৭ সালে রাষ্ট্রপতি জ্যাক্‌সনের কার্যকাল শেষ হয়। ১৮৩৭ হইতে ১৮৮১ সালের মধ্যে 'Spoils System' (নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি) আরও বিস্তার লাভ করে। নূতন

রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ করিবার পর তিনি বিপুল সংখ্যক পুরাতন চাকুরিয়াদের নিয়োগ রদ করিয়া আপনার ব্যক্তিগত অথবা দলীয় বা উপদলীয় অনুচর, পার্শ্বচর ও সমর্থকদিগকে অথবা তাহাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে সেই স্থলগুলিতে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। যদি একদলীয় রাষ্ট্রপতির স্থানে অন্য দলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতেন তাহা হইলে পুরাতন কর্মচারীদের বরখাস্ত করিয়া তাহাদের শূন্য জায়গায় আপনার দলীয় লোক ও অনুগত ব্যক্তিদের নিয়োগ চরমে উঠিত। ১৮৮১ সালে বিংশ রাষ্ট্রপতি গারফিল্ড (Garfield) একজন বিফলমনোরথ নিয়োগ প্রার্থীর হস্তে নিহত হইলেন। এই ঘটনায় নিয়োগ সম্বন্ধীয় দুর্নীতির (Spoils System) উপর লোকচক্ষুর দৃষ্টি বিশেষভাবে পতিত হয়। দীর্ঘকালের বিক্ষুব্ধ জনমত এই ঘটনার পর আমলাতন্ত্রের নিয়োগ-নীতির সংস্কার দাবি করিতে থাকে।

১৮৮৩ সালে কংগ্রেস (Federal Service Act) অথবা যুক্ত-রাষ্ট্রীয় নিয়োগ আইন পাস করেন। এই আইনটি পেন্ডেল্টন আইন (Pendleton Act) নামে পরিচিত। এই আইন অনুযায়ী তিনজন সদস্যবিশিষ্ট একটি নিয়োগ কমিশন নিযুক্ত হয়। ব্যবস্থা করা হয় যে এই তিনজনের মধ্যে দুইজনের বেশি একদলের ব্যক্তি থাকিবে না। রাষ্ট্রপতি সেনেটের সম্মতিসাপেক্ষে এই কমিশনের সদস্য মনোনীত করিবেন। এই আইন অনুসারে নিয়োগগুলি শ্রেণীভুক্ত (classified) ও শ্রেণীবহির্ভূত (unclassified) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যবস্থা হয় যে শ্রেণীভুক্ত নিয়োগগুলি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফল অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। এই শ্রেণীবিভাগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়। আরও বিধিবদ্ধ হয় যে শ্রেণীভুক্ত চাকুরিয়াগণ রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির প্রচেষ্টায় অরাজনৈতিক অথবা শ্রেণীভুক্ত চাকুরিয়াদের আনুপাতিক সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ১৯৩৭ সালে শতকরা ৬০; ১৯৪২ সালে শতকরা ৮০ এবং ১৯৬১ সালে শতকরা ৯২ ভাগ নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলানুযায়ী হয়। কিন্তু অবশিষ্ট রাজনৈতিক নিয়োগগুলি পূর্বের নিয়মানুযায়ী চলিতেছে। এই নিয়োগের সংক্ষিপ্ত তালিকা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের আসন (Position of the Civil Service in Administration) : সিডনী ও বিয়েট্রিস্ (Sidney and Beatrice Webb) **লিখিয়াছেন :** "The Government of Great Britain is in fact carried

on, not by the cabinet, nor even the individual ministers, but by the Civil Service." অর্থাৎ ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা তথাকার ক্যাবিনেট বা এককভাবে মন্ত্রিগণের উপর নির্ভর করে না, বস্তুতঃ তাহা আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। ইহা ব্রিটেন সম্বন্ধে যেমন সত্য আমেরিকা সম্বন্ধে তাহা তদপেক্ষা সত্য। কারণ এই যে শেষোক্ত দেশের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিয়া তাহা আরও জটিল। এই জটিল শাসনতন্ত্রের সাফল্যের জন্য আমলাতন্ত্রের কর্তব্য-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বোধ ও উচ্চস্তরের নাগরিক চেতনা প্রয়োজন। তাই আমেরিকার আমলাতন্ত্র দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ আসন দখল করিয়া রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী এবং তাঁহার উপদেষ্টা মন্ত্রীমণ্ডলীর সাহায্যে প্রশাসনিক নীতি প্রবর্তন করেন; কিন্তু দৈনন্দিন প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমলাতন্ত্রের হস্তেই ন্যস্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের প্রকৃতি

(The Nature of the Congress)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রথম ধারার প্রথম উপধারায় লিখিত হইয়াছে: "All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States which shall consist of a Senate and the House of Representatives." অর্থাৎ সমস্ত আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট কংগ্রেসের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। উপরিতন কক্ষটি সেনেট ও নিম্নতন পরিষদটি প্রতিনিধি পরিষদ নামে পরিচিত। প্রথমটি অর্থাৎ সেনেট অঙ্গরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদ জাতীয় একতার প্রতীক। মোটামুটিভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই (অর্থাৎ unity in diversity) যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতির মূল কথা। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রকে union without unity বলিয়াছেন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে একপক্ষে, অঙ্গরাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার এবং অন্যপক্ষে, ঐ অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত জাতীয়তা—এই দুই-এর সামঞ্জস্য সাধিত হয়। এই দুইটি বিপরীত নীতি যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে আমেরিকার মূল তেরটি স্বাধীন রাষ্ট্র লইয়া একটি Confederation বা রাষ্ট্রসমষ্টির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ যখন Confederation গঠন করিয়াছিল তখন সকল রাষ্ট্রের সাম্য ও সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি কনফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত হয়। এই রাষ্ট্রসমষ্টিই ইংরেজ আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই রাষ্ট্রগুলিই যখন আপন সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিল তখন তাহারা স্বাধিকার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুসারে সেনেটে প্রতি অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের সমান প্রতিনিধিত্ব বজায় রহিল এবং স্ব স্ব রাষ্ট্রে তাহাদের সীমিত স্বাধিকারও রক্ষিত হইল। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসা ও বাণিজ্য ও শিল্পে সমৃদ্ধ জনবহুল উত্তরাঞ্চল হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব আসিয়াছিল। দক্ষিণের কৃষিপ্রধান ও বিরল বসতি অঞ্চলের অধিবাসীগণের একটি স্বাভাবিক সন্দেহ ছিল যে তাহারা উত্তরের জনসংখ্যার চাপে শাসনব্যবস্থায় শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। এই কারণেও উপরিতন সভায় প্রতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের সাম্য স্বীকৃত হয়। প্রতি রাষ্ট্র তাই দুইজন করিয়া সেনেটর নির্বাচন করিবার অধিকার লাভ করে। এই সূত্রে ফিলাডেলফিয়া সংবিধান সম্মেলনের (১৭৮৭) তিনজন নেতা, হ্যামিল্‌টন্ (Hamilton), ম্যাডিস্‌ন্ (Madison) ও জে (Jay) প্রণীত সমসাময়িক কালে প্রকাশিত Federalist পুস্তকের নিম্নলিখিত মন্তব্য স্মরণীয়। Federalist বলিতেছে : "...the equal vote allowed to each state is at once a constitutional recognition of the portion of the sovereignty remaining in the individual state and instrument of preserving the residuary sovereignty." অর্থাৎ সমপ্রতিনিধিত্ব নীতির মধ্য দিয়া প্রতি অঙ্গরাষ্ট্রে স্বাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই নীতি স্বাধিকার রক্ষার অস্ত্র হিসাবেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অন্য দিকে জাতির সমগ্রতা মানিয়া লওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কারণ সেখানে ঐক্যই হইতেছে মূল সূত্র ; সেখানে বিভেদের স্থান নাই।

সমগ্রতা ও ঐক্য ইতিহাসের অবদান। তাই জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি রাষ্ট্র হইতে নিম্নতন সভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের দ্বিকক্ষ ব্যবস্থার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টির মৌলিক নীতি ও ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রতিনিধি সভা (The House of Representatives) : সংবিধানের

প্রথম ধারায় এই জাতীয় আইন সভাটির গঠন পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে প্রতি ৩০ হাজার নাগরিক পিছু একজনের অনধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। নির্বাচন প্রার্থীর বয়স অন্ততঃ ২৫ বৎসর হওয়া চাই। অন্ততঃ সাত বৎসরের পুরাতন নাগরিকগণই প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। যে রাষ্ট্র হইতে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন, তাহাকে সেই রাষ্ট্রেরই নাগরিক হইতে হইবে। প্রথা অনুসারে আর একটি নিয়মও পাকা হইয়া গিয়াছে। প্রার্থী যে নির্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন, তাহাকে সেই নির্বাচন কেন্দ্রের বাসিন্দা হইতে হইবে। প্রতিনিধি সভার সদস্যগণের কার্যকাল দুই বৎসর। প্রতিনিধি সভা যখন সর্ব প্রথম নির্বাচিত হয়, তখন তাহার সদস্য সংখ্যা মাত্র ৬৫ ছিল। এখন মোট প্রতিনিধি সংখ্যা ৪৩৭ হইয়াছে।

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধক অনুযায়ী প্রতিনিধি সভা বৎসরে অন্ততঃ একবার ৩রা জানুয়ারী তারিখে অধিবেশনে মিলিত ইহবে। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের জরুরী অবস্থায় প্রতিনিধি সভার বিশেষ অধিবেশন (Special Session) অথবা দুইটি কক্ষেরই অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। ১৯৪৩ সালের একটি প্রস্তাবের বলে সেনেটের সভাপতি ও প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষকে (Speaker) বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। একই প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে সেনেটের ও প্রতিনিধি সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃদ্বয় অথবা দুই কক্ষের সংখ্যালঘু দলের নেতৃদ্বয় যদি যুক্তভাবে, সেনেটের সচিব (Secretary) ও প্রতিনিধি সভার কার্য সম্পাদকের (Clerk of the House) নিকট কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন দাবি করে, তাহা হইলে কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিতেই হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জরুরী অবস্থার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে কংগ্রেসকে আর রাষ্ট্রপতির অভিরুচির উপর নির্ভর করিতে হয় না।

১৯৬০ সালের ৮ই নভেম্বর প্রতিনিধি সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৩৭। ইহার মধ্যে ডেমোক্র্যাটিক দলের সদস্য সংখ্যা ২৬১ এবং রিপাবলিক্যান দলের সদস্যগণ সংখ্যায় ১৭৬।

অধ্যক্ষ (Speaker) : প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষ নূতন প্রতিনিধি সভার কার্যারম্ভের প্রথমে সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের কোন বয়স্ক ও অভিজ্ঞব্যক্তিই এই পদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ব্রিটিশ কমন্স্ সভার অধ্যক্ষ যেমন সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইয়া থাকেন. প্রতিনিধি সভায় তাহা কখনই

হয় না। যুক্ত-রাজ্যের কমন্‌স্ সভার অধ্যক্ষ ঐ পদে নির্বাচনের পূর্বে যদিও বা দলভুক্ত ব্যক্তি হন,অধ্যক্ষ নির্বাচনের পর তিনি সম্পূর্ণ নির্দলীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কমন্‌স্ সভার স্পীকার বা অধ্যক্ষ যদি পরবর্তীকালে সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হন, তাহা হইলে কোন দল তাহার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষের এইরূপ নির্বাচন অসম্ভব। প্রতিনিধি সভায় অধ্যক্ষ দলীয় সংশ্রব ত্যাগ করেন না। তিনি দলের অন্যতম নেতা হিসাবে সভায় তাঁহার দলকে সর্বপ্রকার সহায়তা দান করিয়া থাকেন। প্রতিনিধি সভায় যদি রাষ্ট্রপতির দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তাহা হইলে অধ্যক্ষ সভায় রাষ্ট্রপতির দলের নীতিকে জয়যুক্ত করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁহার ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। তিনি সভার সদস্য হিসাবে অন্যান্য সদস্যের ন্যায় বক্তৃতা করিতে পারেন এবং আইনতঃ তাঁহার ভোট দিবার অধিকারও রহিয়াছে; কিন্তু কার্যতঃ তিনি কেবল ভোটের সমতা হইলে বা গোপন ভোট প্রথা অবলম্বিত হইলে ভোট দিয়া থাকেন। যুক্তরাজ্যের কমন্‌স্ সভার অধ্যক্ষ কখনও বিতর্কে যোগ দেন না। তবে ভোটসাম্য হইলে তিনি ভোট দিতে পারেন। অধ্যক্ষ প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভার নিয়মাবলী কার্যে পরিণত করেন। সভায় শৃংখলা রক্ষা করেন; সিলেক্ট কমিটি ও আলোচনা কমিটি নিয়োগ করেন। তিনি সভার নিয়মাবলীর ভাষ্য (Interpretation) দিবারও অধিকারী। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত নিয়মাবলীর ভাষ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বাতিল হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ করা হয় না। এই স্থলে বলা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ কমন্‌স্ সভার অধ্যক্ষের ভাষ্য সভা কর্তৃক সর্বদা গ্রাহ্য হয়; সেই বিষয়ে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই।

প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষ যাহাকে বক্তৃতা দিবার সুযোগ দিবেন কেবল তিনিই সভায় বক্তৃতা দিতে পারিবেন অন্য কেহ নহে। এই ক্ষমতাটুকুর মধ্য দিয়া অধ্যক্ষ আপন দলকে বিতর্কে প্রভূত সুবিধা দিয়া আপন দলীয় নীতি হাসিল করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন।

সেনেট (The Senate) : ১৯৬০ সালের ৮ই নভেম্বরের নির্বাচনের পর সেনেটের মোট সদস্য সংখ্যা ১০০৩ দাঁড়াইয়াছে। এখন আলাস্কা (Alaska) ও হাওয়াই (Hawaii) লইয়া সর্বসমেত ৫০টি অঙ্গরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রতি রাষ্ট্র হইতে দুই জন করিয়া সেনেটর নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সেনেটরদের কার্যকাল ছয় বৎসর। ইহা একটি স্থায়ী পরিষদ; প্রতি দুই বৎসরে

ইহার একতৃতীয়াংশ সদস্যের কার্যকাল শেষ হয় এবং মাত্র সেইস্থানে নূতন নির্বাচন হইয়া থাকে। এই পরিচ্ছেদের প্রথম আলোচনায় বলা হইয়াছে যে জন সংখ্যা নির্বিশেষে সেনেটে সকল রাষ্ট্রেরই সমান প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহার রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কারণও উক্ত আলোচনায় বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

সেনেটে নির্বাচনপ্রার্থীকে অন্ততঃ নয় বৎসরের পুরাতন যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিক হইতে হইবে। তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরের কম হইলে চলিবে না এবং তিনি যে রাষ্ট্র হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন তাহার নাগরিক না হইলে তিনি প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না। রাষ্ট্র হইতে নির্বাচিত দুই জন সেনেটর সাধারণতঃ রাষ্ট্রের দুই বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। একটি দল যদি সহর হইতে একজন প্রার্থী মনোনীত করেন তাহা হইলে তাহাদের দলের অন্য প্রার্থীটি মনোনীত করা হয় গ্রামাঞ্চল হইতে।

সেনেটের নির্বাচনরীতি কৌতূহলোদ্দীপক। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব খুশী মনে গ্রহণ করিতে চান নাই। ১৭৮৭ সালে সংবিধান প্রণেতৃগণ অঙ্গরাষ্ট্র সরকার সমূহের শুভেচ্ছা ও সমর্থন লাভ করিবার জন্যই ব্যবস্থা করেন যে সেনেটের সদস্যগণ অঙ্গরাষ্ট্রের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে ইহার দ্বারা রাষ্ট্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটি যোগাযোগ সেতু নির্মিত হইবে এবং অঙ্গরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রেষারেষির ভাব কাটিয়া যাইবে। তাঁহারা আরও মনে করিয়াছিলেন যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমূহের বিধানমণ্ডলী যদি সেনেটরদের নির্বাচন করেন তাহা হইলে বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিগণই সেনেটর নির্বাচিত হইবেন। এই অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ফলপ্রসূ হয় নাই। রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভব ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান প্রণেতৃগণের আশা বিনষ্ট হইয়া যায়। দেখা গেল যে দলীয় ও উপদলীয় রাজনীতির চক্রান্তের দরুন সেনেটর নির্বাচন ঘিরিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দুর্নীতি বাসা বাঁধিয়াছে। ১৮৯০ হইতে ১৯১২ পর্যন্ত অন্ততঃ এগারটি অঙ্গরাষ্ট্রের মাত্র একজন করিয়া প্রতিনিধি সেনেটে নির্বাচিত হইলেন। দলাদলি, ঘুষ ও অন্যধরনের দুর্নীতি ফলে ১১টি রাষ্ট্রের বিধানমণ্ডলী তাহাদের সংবিধানিক অধিকার ব্যবহার করিতে পারিল না। Deadlock বা অচলাবস্থার সৃষ্টিই ইহার প্রধান কারণ। ১৯০১ সালে ইহার ফলে ডেলাওয়ার (Delaware) হইতে একজনও সেনেট সদস্য নির্বাচন সম্ভব হইল না।

যুক্তরাষ্ট্রের জনমত এই সকল কারণে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ১৯১৩ সালে তাই সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধকের মারফত স্থির হইল যে প্রতি রাষ্ট্র হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি নাগরিক সাধারণ কর্তৃক সেনেট সভায় নির্বাচিত হইবেন।

সেনেটর অধ্যক্ষ (Presiding Officer of the Senate) : যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি সেনেটের পদাধিকারে অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করেন। তিনি সেনেটের সদস্য নহেন। তিনি সেনেটের কমিটিও নিয়োগ করেন না। প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষ যেমন দলীয় নেতা হিসাবে, আইন প্রণয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, সেনেটের অধ্যক্ষের তেমন কোনই ক্ষমতা নাই। সদস্যগণ যখন বক্তৃতা দিতে উঠেন তখন যিনি আগে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাকেই সেনেটের অধ্যক্ষ বক্তৃতা দিবার সুযোগ দান করিতে বাধ্য। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষের এই বিষয়ে আপন মতানুযায়ী বক্তাদের বক্তৃতার সুযোগদান করিবার ক্ষমতা আছে। উপরাষ্ট্রপতি সেনেটে বক্তৃতা বা ভোট দিতে পারেন না। তবে ভোট সাম্য হইলে তাঁহার একটি ভোট দানের অধিকার রহিয়াছে। উপরাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে সেনেটে সভাপতিত্ব করিবার জন্য সেনেটের সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষের ন্যায় সেনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একজন নেতা। তিনি সেনেটের সদস্য বলিয়া যে কোন বিষয়ে বিতর্কের শেষে ভোট দিবার অধিকারী। উপরাষ্ট্রপতি যদি রাষ্ট্রপতির আসন গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সহ-সভাপতি সেনেটের সভাপতিরূপে কাজ চালাইয়া যান।

কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (The Powers and Functions of the Congress) :—সংবিধানের প্রথম ধারা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা কংগ্রেসকে দেওয়া হইয়াছে। যদিও শাসনব্যবস্থা গঠনে সংবিধান প্রণেতৃগণ ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি সচেতনভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন তথাপি তাহারা জানিতেন যে বিশুদ্ধ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্ব কার্যক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইতে পারে না; এইজন্য তাঁহারা কংগ্রেসের হস্তে অন্যান্য ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাই দেখা যায় যে আইন প্রণয়ন ব্যতীত কংগ্রেসের অন্যান্য নানাবিধ ক্ষমতা রহিয়াছে। আইন বিভাগীয় ক্ষমতা ব্যতীত কংগ্রেসের ক্ষমতা নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। (১) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা (২) নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা; (৩) শাসন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা; (৪) বিচার

বিভাগীয় ক্ষমতা (৫) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা; (৬) আদেশমূলক বা পরিদর্শনের ক্ষমতা; (৭) অনুসন্ধানের ক্ষমতা। (৮) নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা।

১। **সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পঞ্চম ধারায় সংশোধনের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে কংগ্রেসের দুই তৃতীয়াংশ সংবিধানের পরিবর্তন প্রস্তাব করিতে পারিবে। কিম্বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির দুই তৃতীয়াংশের অনুরোধে কংগ্রেস জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিবে। এই সম্মেলনের সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাব গঠনের অধিকার থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কংগ্রেসের উদ্যোগ ব্যতীত সংবিধানের কোন পরিবর্তনই সম্ভব নহে।

২। **নির্বাচন সংক্রান্ত : (Electoral Functions.)** প্রতি চার বৎসর অন্তর রাষ্ট্রপতির নির্বাচন কালে ভোট গণনার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কংগ্রেসের সম্মুখেই ভোটগণনা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যদি কোন প্রার্থী নিয়মানুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যক ভোট না পান তাহা হইলে প্রতিনিধি সভাই সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট প্রাপ্ত তিনজন প্রার্থীর মধ্য হইতে একজনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। যদি উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে কেহ উপযুক্ত সংখ্যক ভোট না পান, তবে সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট প্রাপ্ত দুই জন প্রার্থীর ভিতর হইতে সেনেট সভা একজনকে নির্বাচিত করেন। যদি রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি দুই জনেই মৃত বা অন্য কোন কারণে পদ অধিকার করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে কংগ্রেসই আইন মারফত রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদাধিকারীদ্বয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার অধিকারী। যে নিয়মানুযায়ী সেনেটের ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন তাহাও কংগ্রেস স্থির করিয়া থাকেন।

৩। **শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Executive Functions) :** পূর্বেই বলা হইয়াছে নিয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন সেনেটের সম্মতিসাপেক্ষ। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সন্ধির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম বলবৎ রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি যে মনোনয়ন করেন তাহাও সেনেটের সদস্যদের সুপাপিশ অনুযায়ী; এই সুপারিশ কচিৎ অগ্রাহ্য হয়। ইহা ব্যতীত পররাষ্ট্রনীতি নিধারণের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ক্ষমতাও অবিসংবাদী। কংগ্রেসই যুদ্ধ ঘোষণা করিবার একমাত্র অধিকারী।

৪। **বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা : (Judicial Powers)** রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটের সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় অ-সামরিক কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রতিনিধি সভা অভিযোগ করিতে

পারেন। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ অভিযুক্ত হইলে সেনেটই তাঁহাদের বিচার করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি কংগ্রেসের সংবিধানিক কর্তব্যে, যে কোন ভাবেই হোক না কেন, বাধা দান করে, সেইরূপ ব্যক্তিগণের বিচার অধিকার কংগ্রেসের রহিয়াছে।

৫। **আদেশমূলক ও পরিদর্শনের ক্ষমতা (Directive and Supervisory Functions):** শাসনবিভাগগুলি রাষ্ট্রপতি পরিচালনা করেন সত্য; কিন্তু কংগ্রেসই এই বিভাগগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ব্যতীত কংগ্রেস আইনবলে এই সকল বিভাগকে অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। কংগ্রেস কর্তৃক এই সূত্রেও বিভাগগুলির উপর কিছুটা পরোক্ষ ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব। কংগ্রেস আইন করিয়া বিভাগগুলিকে কোন বিষয়ে রিপোর্ট দিবার জন্য অথবা কোন বিশেষ পন্থায় অগ্রসর হইতে আদেশ দিতেও পারে; যুক্তরাষ্ট্রের কণ্ট্রোলার জেনারেল কংগ্রেসের নিকট দায়ী, রাষ্ট্রপতির নিকট নহে। এই কর্মচারিটির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার উপর পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কিছু পরিমাণ কংগ্রেস পরিচালনা করিতে সক্ষম। পরিশেষে সেনেট ও প্রতিনিধি সভার দুইটি স্থায়ী কমিটি আছে; আইন কি পরিমাণে কার্যে পরিণত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া কংগ্রেসীয় সমালোচনা, বিতর্ক, প্রশ্ন প্রভৃতির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার উপর কংগ্রেসের প্রভাব বিস্তার করা হইয়া থাকে।

৬। **অনুসন্ধানমূলক ক্ষমতা (Investigative Powers):** কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের সর্বময় আইনপ্রণয়নের অধিকারী হিসাবে যে কোন বিষয়ে কমিটি মারফত অনুসন্ধান করিতে পারে। ইহার দ্বারা মাঝে মাঝে দুর্নীতি ধরা পড়িয়াছে এবং শাসন ব্যবস্থা উন্নীত হইয়াছে।

৭। **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial and Budgetary Powers):** কংগ্রেসই করধার্য ও অর্থ মঞ্জুরীর কর্তা। অর্থ মঞ্জুরীর দাবী যখন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে পেশ করেন, তখন সমালোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সুযোগ কংগ্রেসের ঘটে। রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা যদি কংগ্রেস কোন ক্ষেত্রে অসমীচীন মনে করে তাহা হইলে কংগ্রেস অর্থবরাদ্দ হ্রাস করিবার প্রস্তাব আনিয়া কংগ্রেসের আপত্তি জ্ঞাপন করিতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা কংগ্রেসকে সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার দান করিয়াছে।

৮। **নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা (Policy-making Power):** কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, জনমতের প্রতীক। কংগ্রেস

প্রস্তাব, আইন, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে জনমতই প্রকাশ করিয়া থাকে। জনমত অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসননীতি গঠিত করা কংগ্রেসের একটি প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য কংগ্রেস যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। যুদ্ধ ও শান্তি, আণবিক অস্ত্র ও নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে কংগ্রেস যে নীতি নির্ধারণ করিতেছেন রাষ্ট্রপতি সেই নীতি কার্যে পরিণত করিতেছেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় রাষ্ট্রপতি নূতন একটি পন্থায় অগ্রসর হইয়াছেন। কংগ্রেস বিচার বিতর্কের মধ্য দিয়া তাহা হয় সমর্থন অথবা প্রত্যাখ্যান করিতেছে। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইল্‌সন্ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সেনেট সেই সন্ধিপত্র কিছুতেই মানিয়া লইতে পারে নাই। রাষ্ট্রপতি কেনেডির পররাষ্ট্র নীতি কংগ্রেসের মতামতেরই প্রতিফলন। কংগ্রেস সমর্থিত নীতিই শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে; তাহার অন্যথা হইতে পারে না।

কংগ্রেসের আইন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা (Legislative Powers of the Congres) :—সংবিধানের প্রথম ধারার সপ্তম ও অষ্টম উপধারায় কংগ্রেসের আইনগত ক্ষমতা উল্লিখিত হইয়াছে। সর্বসুদ্ধ যে আঠারটি বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা এইরূপ। (১) কর, জাতীয় ঋণ-পরিশোধ, প্রতিরক্ষা ও সাধারণ কল্যাণ সাধন; (২) ঋণ গ্রহণ; (৩) বৈদেশিক বাণিজ্য; (৪) নাগরিকত্ব লাভ-আইন, দেউলিয়া আইন; (৫) মুদ্রা প্রস্তুত, ওজন প্রভৃতি; (৬) মুদ্রাজালের জন্য শাস্তি বিধান; (৭) পোষ্টাফিস; (৮) বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিধান, কপি রাইট পেটেণ্ট প্রভৃতি (৯) সুপ্রীমকোর্টের অধীন বিচার আদালত স্থাপন (১০) জলদস্যুতা আন্তর্জাতিক আইনবিরুদ্ধ কার্যাবলী সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন; (১) যুদ্ধ ঘোষণা; (১২) সৈন্যদল গঠন ও তাহাদের প্রস্তুতকরণ (১৩) নৌবহর গঠন (১৪) সৈন্য ও নৌসেনা বিষয়ক আইন; (১৫) জাতীয় রক্ষী বাহিনী (militia) গঠন ও তাহাদের সাহায্যে প্রয়োজন মত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ (Insurrection) দমন প্রভৃতি (১৬) সৈন্যদল ও জাতীয় রক্ষী বাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা বষয়ক আইন (১৭) যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিজিত বা অন্যভাবে প্রাপ্ত স্থানের শাসন সম্বন্ধীয় আইন; (১৮) উপরোক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হইলে অন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ে ব্যবস্থা।

সংবিধানের প্রথম ধারার নবম উপধারায় কতকগুলি বিষয়ে কংগ্রেসকে আইন প্রণয়নে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই উপধারা অনুযায়ী ১৭৮৯-

১৯১৩ সাল পর্যন্ত আয়কর ধার্য করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কংগ্রেসের ছিল না। ১৯১৩ সালের ষোড়শ সংশোধকের বলে এই বিষয়ে কংগ্রেসকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত উপধারা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সংবিধান প্রণেতৃগণ কংগ্রেসকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আইন ক্ষমতা দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা সমূহ (Residuary Powers) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির হস্তে ন্যস্ত করাই ছিল তাহাদের নীতি।

অবশিষ্ট ক্ষমতা বা Residuary Powers

এই নীতিটি সংবিধান প্রবর্তিত হইবার দুই বৎসরের মধ্যেই ১৭৯১ সালে স্পষ্টভাবে সংবিধানের দশম সংশোধক হিসাবে গৃহীত হয়। সংশোধকটি এইরূপ: "The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited to the States, are reserved to the States respectively, or to the people." অর্থাৎ যে সকল ক্ষমতা সংবিধানে লিখিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হয় নাই এবং যে সকল ক্ষমতা হইতে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে সুষ্ঠুভাবে বঞ্চিত করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষমতা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হস্তেই থাকিবে।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কংগ্রেসের হস্তে যে সকল ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী লিখিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্যতীত কতকগুলি ক্ষমতা কংগ্রেসের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই ক্ষমতাগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক সংবিধানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিছু কিছু ক্ষমতা কংগ্রেসে বর্তিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সংবিধানের প্রথম ধারার অষ্টম উপধারার প্রথম দফায় উল্লিখিত সাধারণ কল্যাণের (General welfare) এর নামে কংগ্রেস ব্যাপক ক্ষমতা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ প্রথম ধারায় অষ্টম উপধারার শেষ অষ্টাদশতম দফায় বলা হইয়াছে যে প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী আইন প্রণয়ন করিতে হইলে যে সকল ক্ষমতা কংগ্রেসকে অপরিহার্যভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, সেই সকল বিষয়েও কংগ্রেসকে ভার দেওয়া হইল। এই দফার সুযোগ লইয়া কংগ্রেস নানা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছে। চতুর্থতঃ সংবিধানের ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, উনবিংশ ও বিংশ সংশোধকে লিখিত হইয়াছে যে ঐ সকল সংশোধকের মূল নীতিগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য কংগ্রেস যথাযোগ্য আইন ("appropriate legislation") অথবা প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত ("necessary and proper") আইনাদি প্রণয়ন করিতে পারিবে। এই সাধারণ ক্ষমতার সুযোগ লইয়াও কংগ্রেস ব্যাপকভাবে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

কংগ্রেসের পরোক্ষ ক্ষমতা

বলা বাহুল্য প্রতিটি ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে সুপ্রীমকোর্ট এই বিষয়ে উদার মনোভাব লইয়া সংবিধান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার ফলে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন দ্বারা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত করিবার সুবিধা লাভ করিয়াছেন। সংবিধান প্রবর্তনের অল্প কিছুদিন পরেই অন্যতম সংবিধান প্রণেতা আলেক্‌-জ্যাণ্ডার হ্যামিল্‌টন দাবি করেন যে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসকে দেওয়া হইয়াছে। এই কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন (Federal Bank) করা অপরিহার্য, যেমন মুদ্রা-প্রচলন করিতে হইলে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন অবশ্যকরণীয়। সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা টমাস্‌ জেফার্‌সন্‌ বলিলেন যে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে (Federal Bank) বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহা সংবিধান বিরোধী কার্য হইবে। এই আলোচনায় যে চারটি দফার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিটি ক্ষেত্রে—সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত সংবিধানের ভাষ্য দ্বারা কংগ্রেস সাধারণভাবে সমর্থিত হইয়াছে। এই সূত্রে প্রধান বিচারপতি মার্শালের ম্যাক্‌কুলক্‌ বনাম মেরীল্যাণ্ড (১৮১৯) নামক মোকদ্দমার রায় বিশেষভাবে স্মরণীয়। মার্শাল বলিয়াছেন : "Let the end be legitimate, let it be within the scope of the constitution, and all means which are appropriate, which are plainly adapted to that end, which are not prohibited but consistent with the spirit and letter of the constitution are constitutional." অর্থাৎ যদি উদ্দেশ্য আইনসঙ্গত হয়, সেই উদ্দেশ্য লাভের জন্য অবলম্বিত পন্থা যদি স্পষ্টতঃ সংবিধানবিরোধী না হয় তাহা হইলে ঐ উদ্দেশ্য লাভের জন্য সংবিধানের মূলগত নীতি ও লিখিত বাণীর সহিত সামঞ্জস্য সম্পন্ন সকল প্রকার কার্যই সংবিধানসঙ্গত বিবেচিত হইবে।

কংগ্রেসের পরোক্ষ ক্ষমতা ও সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা

সুপ্রীমকোর্টের সমর্থনের ফলে সাধারণ কল্যাণ (General Welfare Clause) সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতা এবং প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসকে প্রদত্ত ক্ষমতা হইতে উদ্ভূত পরোক্ষ ক্ষমতা ("implied powers")—প্রধানতঃ এই দুই প্রকার ক্ষমতা ব্যবহার করিবার অধিকারী হইয়া, কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সরাসরি দেওয়া আইন প্রণয়ন ক্ষমতা হইতে অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার দিক হইতে কংগ্রেসের ব্যাপক ক্ষমতা বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

কংগ্রেসের জরুরী অবস্থায় বিশেষ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে কি নাই —এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ১৯২৯-৩১ সালের অর্থনৈতিক সংকট ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কংগ্রেস কতকগুলি জরুরী আইন পাস করে। সুপ্রীমকোর্ট Home Building and Loan Association *v* Blaisdell (19:4) নামক মোকদ্দমায় রায় দেন যে "emergency does not create power". যদি কংগ্রেস প্রণীত তথাকথিত জরুরী আইন সংবিধান সম্মত হয় তাহা হইলে আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু জরুরী অবস্থা আছে বলিয়া কংগ্রেস সংবিধান বহির্ভূত কোন ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় সংবিধানে যেরূপ জরুরী অবস্থা ও তাহার ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে তেমন কিছুই নাই।

কংগ্রেসের জরুরী ক্ষমতা নাই

আইন প্রণয়নের ধারা : কংগ্রেসে বিভিন্ন ধরনের বিল, প্রস্তাব প্রভৃতি আলোচনার পর গৃহীত হয়। তাহাদের নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা হইতে পারে।

১। বিল (Bill) : ইহা খসড়া আইনের প্রস্তাব এবং ব্যাপক অথবা আধা-ব্যাপক নির্দেশমূলক খসড়া আইন। এই বিল আইন হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন।

২। সংযুক্ত প্রস্তাব (Joint Resolution) : ইহা প্রায় বিলের সম পর্যায়ের। তবে ইহা সংক্ষিপ্ত আকারের ও সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা। ইহাও রাষ্ট্রপতির নিকট তাহার সম্মতির জন্য পাঠাইতে হয়। যুক্ত প্রস্তাব বিলের ন্যায় প্রতি কক্ষে পৃথক ভাবে প্রতি কক্ষে আলোচিত হয়।

৩। সম্মিলিত প্রস্তাব (Concurrent Resolutions) : এই প্রস্তাব দুইটি কক্ষেই আলোচিত ও গৃহীত হয় বলিয়া ইহাকে সহগামী প্রস্তাব বলে। ইহা দ্বারা দুইটি কক্ষ তাহাদের মত প্রকাশ করে মাত্র। এই প্রস্তাবের আইনের মর্যাদা নাই। সম্মিলিত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হয় না।

৪। অসংযুক্ত প্রস্তাব (Simple Resolutions) : যে কোন একটি কক্ষ এই ধরনের প্রস্তাব আলোচনা ও গ্রহণ করিতে পারে। প্রতিনিধি সভা বা সেনেটের এই প্রস্তাব মতপ্রকাশের মাধ্যম মাত্র।

বিল দুই প্রকারের—(১) জনসাধারণ সম্পর্কিত বিল (Public Bill) এবং (২) ব্যক্তিগত বা ব্যক্তি-সমষ্টিগত (Group) বিল বা Private Bill. প্রথম

প্রকারের বিলের সহিত সর্বসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় প্রকার বিল ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিসমষ্টির স্বার্থেই আনীত হয়, যথা, স্বর্গত রাষ্ট্রপতির বিধবার জন্য পেন্‌সন ধার্য করিবার বিল। রেলপথ, জনকল্যাণ, শ্রমিক কল্যাণ প্রভৃতি বিল Public Bill বা জনসাধারণসম্পর্কিত বিলের পর্যায়ে পড়ে।

বিল পাসের বিভিন্ন স্তর: প্রথম পর্যায়: যে কোন সেনেটর অথবা প্রতিনিধি সভার যে কোন সদস্য আপন কক্ষে বিল পেশ করিতে পারেন। আনীত বিলের জন্য একটি বাক্স দুই কক্ষেই রক্ষিত আছে। সদস্য সেই বাক্সে বিল আপন স্বাক্ষর সহ ফেলিয়া দিলেই বিল পাসের প্রথম স্তর সমাপ্ত হয়। ইহার পর বিল ছাপা হইয়া সদস্যদের হাতে পৌঁছায়। ইহা first reading বা প্রাথমিক আলোচনার সামিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়: দ্বিতীয় পর্যায়ে বিল তাহার বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপযুক্ত স্থায়ী কমিটিতে (Standing Committee) প্রেরিত হয়। প্রতিনিধি সভার স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা সাধারণতঃ ২১ হইতে ২৫ এর মধ্যে। সেনেটে স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যাও ২৫ এর বেশি নহে। প্রতিনিধি সভার ও সেনেটের সব চেয়ে ছোট স্থায়ী কমিটিদ্বয়ের সংখ্যা যথাক্রমে দুই ও তিন। সেনেটের স্থায়ী কমিটির সংখ্যা হইতেছে ১৬। প্রতিনিধি সভায় ২০টি কমিটি আছে। দুই কক্ষের প্রতি কমিটিতে দুইটি দলের (ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিক্যান) সদস্যদের যে আনুপাতিক শক্তি, সেই অনুযায়ী দুই দলের কমিটি সদস্য নির্বাচিত হয়।

তৃতীয় পর্যায়: যে বিল কমিটিতে আসিয়াছে তাহার কোন মূল্য আছে কিনা, তাহাই প্রথম বিবেচিত হয়। যদি কমিটি সিদ্ধান্ত করেন যে বিলটি অপ্রয়োজনীয় তাহা হইলে ইহাকে ফাইল (File) বন্ধ করা হয়। অর্থাৎ ঐ বিলটিকে আর অগ্রসর হইতে দেওয়াহয় না। দেখা গিয়াছে যে শতকরা ৫০ হইতে ৭৫টি বিলই এই অবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

যে বিল এই পর্যায়ে বাঁচিয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান এবং সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কমিটি ইচ্ছা করিলে কোন কোন বিষয়ের বিশেষ আলোচনার জন্য সাব-কমিটি (শাখা কমিটি) নিযুক্ত করিতে পারে। প্রতি কমিটির সহিত স্থায়ী কর্মচারী দ্বারা গঠিত গবেষণা পরিষদ আছে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিল আলোচনা করিবার সময় কমিটি প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাদের অধিবেশনে বিল সংক্রান্ত বিষয়ে স্বার্থসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে

আহ্বান করিতে পারেন। অনেক সময় কমিটি বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রশ্নপত্র আকারে তাহাদের জ্ঞাতব্য পেশ করিতেও পারেন। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহার অভিরুচি অনুযায়ী কমিটির যে কোন সদস্যের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকারী।

কমিটি আলোচনান্তে (ক) বিলটি সংশ্লিষ্ট কক্ষে প্রেরণের সুপারিশ করিয়া লিখিতে পারেন যে বিলটি গৃহীত হউক; (খ) বিলটি সংশোধন করিয়া তাহা পাস করিবার সুপারিশ করিতে পারেন; (গ) কেবল মাত্র বিলের নামটি অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্য সমস্ত অংশ পরিবর্তন করিয়া তাহার পক্ষে সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারেন; (ঘ) কমিটি লিখিয়া পাঠাইতে পারেন যে উহা কক্ষ কর্তৃক অগ্রাহ্য করা হউক; অথবা (ঙ) কমিটি যদি বিলটিকে অসমীচীন মনে করেন তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে কিছুই না করিতে পারেন; অথবা এত দেরিতে বিরুদ্ধ মন্তব্য সহ কক্ষে পাঠাইতে পারেন যে তাহা কক্ষের বিবেচনা করিবার সুযোগই থাকিবে না। শেষোক্ত উভয় ক্ষেত্রেই বিলটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

চতুর্থ পর্যায়ঃ রিপোর্ট বা বিবরণী পেশ:—কমিটির রিপোর্ট বা বিবরণী কমিটির সভাপতি অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য কক্ষে (সেনেট বা প্রতিনিধি সভা) পেশ করিয়া থাকেন। এই রিপোর্ট আলোচনা করিবার জন্য সেনেট বা প্রতিনিধি সভা কক্ষের সমস্ত সদস্যদের লইয়া গঠিত একটি কমিটিতে পরিণত হয়। ইহাকে Committee of the Whole House কহে। সকল সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির আলোচনার নিয়ম কানুন ঢিলে-ঢালা; একই সদস্য একাধিকবার বক্তৃতা করিতে পারেন। এই সমালোচনাকে দ্বিতীয় আলোচনা বা second reading বলে। সকল সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটিতে (Committee of the whole House) স্থায়ী অধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করেন না। অন্য কেহ সাময়িক ভাবে সভাপতি পদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন * †

* এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দুই ধরনের Committee of the Whole House বা সকল সদস্য বিশিষ্ট কমিটি রহিয়াছে। Public Bill বা জনসাধারণ সংক্রান্ত বিলগুলি যে Committee of the Whole Houseএ প্রেরিত হয় তাহাকে Committee of the Whole House on the State of the Union বলে। Private Bill গুলি Committee of the Whole House for Private Billsএ প্রেরিত হয়।

† অনেক সময় Committee of the Whole House গঠিত নাও হইতে পারে। তাহা হইলে প্রতি পরিষদের সাধারণ অধিবেশনেই বিলটি আলোচিত হয়।

এই পর্যায়ে বিলটির সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইতে পারে। তাহা হয় গৃহীত বা অগ্রাহ্য হয়। আলোচনার শেষে ভোট গ্রহণ করা হয়। এই স্তরে বিলটি যদি পাস হয় তাহা হইলে উহা আবার কক্ষের সাধারণ অধিবেশনে আলোচিত হয়।

এই আলোচনাকে third reading বা তৃতীয় আলোচনা বলা হইয়া থাকে এবং গৃহীত হইলে সেনেটের অধ্যক্ষ বা প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষের স্বাক্ষর সহ অন্য পরিষদে প্রেরিত হয়। অর্থাৎ বিলটি সেনেটে প্রথম আনীত হইলে তাহা প্রতিনিধি সভায় প্রেরিত হয়। প্রতিনিধি সভায় শুরু হইলে, সেনেটে প্রেরিত হয়। একটি কক্ষ গ্রহণ করিবার পর অন্য কক্ষে প্রেরিত হইলে বিলটির আবার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা চলে এবং হয় গৃহীত কিম্বা অগ্রাহ্য হয়। যে কক্ষে উহা প্রেরিত হইয়াছে, সেই কক্ষ যদি যেরূপে বিলটি তাহাদের কাছে আসিয়াছে সেই ভাবেই পাস করে, তাহা হইলে উহা রাষ্ট্রপতির নিকট তাহার সম্মতিজ্ঞাপক স্বাক্ষরের জন্য প্রেরিত হয়। যদি রাষ্ট্রপতি বিলটি ভিটো করেন অর্থাৎ তাঁহার সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে যে কক্ষে বিলটির সূত্রপাত হইয়াছিল সেই কক্ষে তিনি তাহা ফিরাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই লিখিত ভাবে তাঁহার আপত্তির কারণ উল্লেখ করেন। তাহার পর যদি দুইটি কক্ষই তাহাদের অধিবেশনে উপস্থিত সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের ভোটে পুনরায় বিলটি পাস করেন তাহা হইলে উহা রাষ্ট্রপতির পূর্বে প্রকাশিত আপত্তি সত্ত্বেও বিলটি আইনে পরিণত। যদি রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অধিবেশন চলা কালে দশদিন বিলটির পক্ষে সম্মতি না দিয়া ফেলিয়া রাখেন, তাহা হইলেও বিলটি আইনে পরিণত হয়। যদি দশ দিনের মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া যায় এবং রাষ্ট্রপতি বিল সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহা হইলে বিলটি বাতিল হইয়া যায়।

রাষ্ট্রপতির ভিটো

প্রতিনিধি সভা বা সেনেটের দলীয় সংস্থা (Caucus System): প্রতিনিধি সভায় অথবা সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু দল দুইটির দলীয় সংস্থা রহিয়াছে। ইহাদিগকে Caucus বলে। সেনেটের ডেমোক্র্যাটিক দলীয় সংস্থা ঐ দলের সমস্ত সদস্যগণ লইয়া গঠিত। তেমনি রিপাবলিক্যান দলের সংস্থার সেনেটের রিপাবলিক্যান দলের সদস্যগণ রহিয়াছেন। ঠিক তেমনি প্রতিনিধি সভায় প্রতি দলের নিজস্ব সংস্থা রহিয়াছে। প্রতিটি সংস্থা তাহাদের দলীয় নেতা, সহকারী নেতা প্রভৃতি নিযুক্ত করেন। এই সংস্থাগুলির আদেশ

প্রতি সদস্তকে মানিয়া চলিতে হয়। প্রতি কক্ষের দলীয় সংস্থা দুইটি একটি করিয়া Steering Committee বা পরিচালনা কমিটি নিযুক্ত করে। বিল, প্রস্তাব বা যে কোন আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এই কমিটি দলের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিবার অধিকারী। পরিচালনা কমিটি কক্ষের দলীয় সংস্থার স্থলে কাজ করিতে থাকে। প্রয়োজন হইলে দলীয় সংস্থার সভা ডাকা হয়। সাধারণতঃ গুরুতর বিষয়ে এবং দলীয় স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে কড়া নির্দেশ (Whip) সদস্তগণকে পাঠানো হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় দলীয় সদস্তগণ নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দিয়া থাকেন বা যথাকর্তব্য সম্পাদন করেন। অন্যান্য বিষয়ে সদস্তগণকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

যুক্তরাজ্যে প্রকৃত শাসকমণ্ডলী অর্থাৎ ক্যাবিনেটের মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের সদস্ত। তাঁহারা আইনের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টে নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। সরকারী বিলগুলি তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া আপনাদেরই প্রচেষ্টায় পাস করাইয়া লন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার ক্যাবিনেট মন্ত্রিগণ কংগ্রেসের সদস্ত নহেন। যে সকল বিল বা প্রস্তাব তাহারা পাস করাইতে চান, তাহা কংগ্রেসে উপস্থিত করিয়া পাস করাইবার চেষ্টা তাহারা করিতে পারেন না। এই কার্য রাষ্ট্রপতির দলীয় Caucus বা সংস্থার সাহায্যে সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। Caucus বা দলীয় সংস্থা, রাষ্ট্রপতি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের মধ্যে কার্যকরী যোগসূত্র। এই কারণে কংগ্রেসের পরিচালন, বিল-প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে কক্ষাভ্যন্তরস্থ দলীয় সংস্থাগুলি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

দলীয় সংস্থা ও স্থায়ী কমিটি (Caucus and Standing Committees): দলীয় সংস্থাগুলি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিটিগুলির মাধ্যমে কাজ করে। কমিটিতে কোন কোন ব্যক্তি সদস্ত হইবেন, তাহা দলীয় সংস্থা দুইটি স্থির করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে কক্ষে দুই দলের মোট সদস্ত সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী সাধারণতঃ কমিটিতে দলীয় প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রতি কক্ষে দুইটি দলেরই দলীয় সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি আছে। রিপাবলিক্যান দলের কমিটিকে কমিটি মনোনয়ন কমিটি (Committee on Committees) বলে। ডেমোক্র্যাটিক দলের সংস্থা সর্ব প্রথম অর্থসংক্রান্ত কমিটিতে বা Committee of Ways and Means মনোনীত করে। তাহারাই অন্যান্য কমিটির সদস্তগণকে মনোনয়ন দান করে।

যুক্তরাজ্যে স্থায়ী কমিটিগুলি মূল্যহীন নহে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী কমিটি-

গুলির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাজ্যে বিলগুলি Second Reading বা দ্বিতীয় পাঠের বিস্তারিত আলোচনার পর কমিটিতে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কোন আলোচনা শুরু হইবার পূর্বেই কমিটিতে প্রেরিত হইয়া থাকে পূর্বেই ইহা বলা হইয়াছে। বিলের গঠন, বিলের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ তাহা গৃহীত হইবে কিনা, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে কমিটির উপর নির্ভর করে। ব্রিটেনে কমিটির সভাপতির কোন গুরুত্ব নাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কমিটির সভাপতি বিলের উপর বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। তাহারই নামে বিলটি কক্ষে প্রেরিত হয়। নিজেই সাধারণতঃ বিলটির রিপোর্ট কক্ষে পেশ করিয়া থাকেন।

দেখা যাইতেছে যে কমিটিগুলি দলগুলি দ্বারাই সৃষ্ট হয়। সেগুলি নামমাত্র কক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত। এইজন্য কমিটি দলীয় রাজনীতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত। যুক্তরাষ্ট্রে দলগুলির মধ্যে আঞ্চলিক ক্ষুদ্রতা প্রাদেশিকতা রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত দলগুলির মধ্যে স্বার্থবাহী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সমষ্টির প্রভাব প্রচুর। ইহার ফলে কমিটিগুলিও অনেক সময় ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির প্রসারের পক্ষে এই প্রবণতা মঙ্গলকর নহে।

সেনেটের ও প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষ—তুলনা। (Speaker of the House of Representatives and the President of the Senate—a Comparison) দুই কক্ষের আভ্যন্তরীণ গঠনের একটি লক্ষণীয় বিভেদ আছে। প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষের মর্যাদা ও আসন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১০-১১ সালের পূর্বে সমস্ত কমিটি, সেইগুলির সভাপতি সভার অধ্যক্ষই মনোনীত করিতেন এবং কাহারা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিবেন তাহাও নির্ধারণ করিতেন। এখন সে ক্ষমতা নাই ; কিন্তু তথাপি তিনি প্রতিনিধি সভার সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল সদস্য এবং তাঁহার ক্ষমতাও সেনেটের অধ্যক্ষ হইতে অনেক বেশী।* কারণ তিনি স্বয়ং দলীয় নেতা হিসাবে বক্তৃতা করিয়া বিতর্কের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। প্রতিনিধিসভার অধ্যক্ষ সভার নির্বাচিত সদস্য। সেনেটের অধ্যক্ষ সেনেটের সদস্য নহেন, সেইজন্য তিনি বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন না। প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষের নিজ ভোট ও ভোট সমতার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভোট (Casting Vote) আছে। সেনেটের অধ্যক্ষের কেবল মাত্র অতিরিক্ত ভোট রহিয়াছে। নূতন প্রতিনিধি সভার নির্বাচনের পর নূতন করিয়া তাহার অধ্যক্ষ নির্বাচিত

* প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষ শীর্ষক ও সেনেটের অধ্যক্ষ শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

হয়। সেনেটের এক তৃতীয়াংশের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের পর তাহা হয় না। কারণ সেনেটের অধ্যক্ষ হইতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি, তাঁহার কার্যকাল ৪ বৎসর।

প্রতিনিধি সভা ও সেনেটের সম্বন্ধ (The Relation of the House Reprsentatives and the Senate):—সংবিধান অনুযায়ী প্রতিনিধিসভা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক; সেনেট অঙ্গরাষ্ট্রসমূহের স্বাতন্ত্র্যের দ্যোতক। সেনেটে সকল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সম-মর্যাদা ও সম-প্রতিনিধিত্ব বর্তমান; প্রতিনিধি সভায় প্রতি রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অনুপাতে সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ধারিত হয়। অর্থসম্পর্কিত বিল প্রতিনিধি সভায় প্রথম পেশ করিতে হয়; সেনেটে পেশ করা চলে না। কিন্তু বাজেট বা অর্থসংক্রান্ত বিলের যে কোন পরিবর্তন সেনেট সভা করিতে পারেন। সেইজন্য বলা যাইতে পারে যে অর্থবিষয়ক আইনের ক্ষেত্রে কার্যতঃ দুই কক্ষের ক্ষমতার পার্থক্য নাই। অন্যান্য আইন সম্বন্ধে দুই কক্ষের ক্ষমতা সমান। সকল আইনই দুই কক্ষেই গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। দুই কক্ষের মতদ্বৈধ হইলে সম্মিলিত কমিটির (Conference Committee) মাধ্যমে মতৈক্য আনিবার প্রচেষ্টা হয়। এই কমিটিতে সাধারণতঃ প্রতি কক্ষ হইতে তিনজন নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বিশেষ অবস্থায় ৫ জন করিয়া সদস্য প্রতি কক্ষ হইতে লওয়া যাইতে পারে।

প্রতিনিধি সভায় সদস্যগণ মাত্র দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন; তাঁহাদের অনেকের অভিজ্ঞতা ব্যাপক নহে। সেনেটের সদস্যগণের ৬ বৎসর কার্যকালে তাঁহারা নানা অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন। এই কারণে তাঁহাদের মর্যাদা প্রতিনিধি সভার সদস্যগণের অপেক্ষা বেশি। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিনিধি সভার সদস্যগণ যে অঙ্গরাষ্ট্র ও ঐ রাষ্ট্রের যে অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হন তাঁহাদিগকে যথাক্রমে সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে। ইহার ফলে প্রতিনিধিগণ অঙ্গরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও আঞ্চলিক আনুগত্য দ্বারা প্রভাবিত হন। ইহার একটি অশুভ ফল এই যে প্রতিনিধি সভায় আঞ্চলিক স্বার্থের সংঘর্ষ চলিতে থাকে। সত্যকার জাতীয় স্বার্থ ইহার দরুন অনেক সময় ব্যাহত হয়। ইহার আর একটি অশুভ ফল এই যে প্রতিনিধিসভা সহজে একতাবদ্ধ হইতে পারে না। এক দলীয় ব্যক্তিরা পর্যন্ত আঞ্চলিক স্বার্থ সংঘাতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সেনেটরগণ কিন্তু জাতীয় নেতা হিসাবে জাতীয় স্বার্থের পরিপুষ্টির জন্য সচেষ্ট থাকেন। তাঁহারা অঙ্গরাষ্ট্রের জনসাধারণ কর্তৃক নিযুক্ত; অঙ্গরাষ্ট্রের স্বার্থ অবশ্য তাঁহারা রক্ষা করিতে উৎসুক হন কিন্তু আধুনিককালে অঙ্গরাষ্ট্রের

স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের সংঘাত বেশি হয় না। দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ভাবধারা শক্তিশালী হওয়ায় এইরূপ সংঘাতের ক্ষেত্রে জনমত জাতীয় স্বার্থের পরিপোষকতা করিয়া থাকে। এই সকল কারণে সেনেট বস্তুতঃ শক্তিশালী জাতীয় পরিষদে পরিণত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি কৃত নিয়োগ ও সন্ধি সম্বন্ধে সেনেটের যে বিশেষ ক্ষমতা তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সেনেটের ক্ষমতা ইদানীংকালে বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিপত্র প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা হইতেই ইহা উদ্ভূত। সেনেটের পররাষ্ট্রনীতি কমিটি (The Committee on Foreign Relations) এই ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে।

সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রতিনিধি সভার অভিযোগ ক্রমে (Impeachment) সেনেট রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি প্রভৃতি উচ্চতন কর্মচারিগণের বিচার করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারাও সেনেটের মর্যাদা সমধিক স্বীকৃত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের কয়েকটি বিশেষত্ব

(Some Peculiar Features of the American Congress) :—

(১) কক্ষ নেতা (Floor Leader): প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষ পদমর্যাদায় সর্বপ্রথম। কক্ষ-নেতা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই কক্ষ-নেতা বলে। ইনি আপন দলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন, বিতর্কে দলীয় কোন কোন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিবে, কিরূপে ভোট দিতে হইবে প্রভৃতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি প্রয়োজনবোধে সংখ্যালঘু দলের নেতার সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া বিল বা প্রস্তাব ভোটে দিবার সময় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আপন দলের পরিচালনা কমিটি (Steering Committee) কক্ষ নেতাকে নির্দেশ দিতে পারে। কক্ষ-নেতা Caucus বা প্রতিনিধি সভার দলীয় সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। পরবর্তী নির্বাচনান্তর প্রতিনিধি সভায় কক্ষ-নেতার অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হইবার বিশেষ সুযোগও থাকে। কারণ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একজন প্রধান ব্যক্তি।

(২) অবিরাম বিতর্ক (Filibustering) :—যদি একজন বা কতিপয় সেনেটর কোন বিল অত্যন্ত অপছন্দ করেন তাহা হইলে তাহার বিরোধিতা করিবার জন্য অবিরত বক্তৃতা করিয়া যাইতে পারেন। ১৯৫৩ সালে অরিগণের

(Oregon) সেনেটর মর্স (Morse) একাদিক্রমে ২২ ঘণ্টা ২৬মিঃ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহাকে আমেরিকায় অবিরাম তর্ক বা Filibustering বলে। কংগ্রেসের বাক্-স্বাধীনতায় সুযোগ লইয়া এই পন্থা অবলম্বন করা হয়। ১৯৫৯ সালের আইন অনুযায়ী এই অবিরাম বিতর্ক ক্ষমতা হ্রাস করা হইয়াছে। এখন সেনেটের সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অবিরাম বিতর্ক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে। বিরোধিতার এই উপায়টি অনেক সময় ফলপ্রসূ হইয়াছে। এই পন্থা অবলম্বন করিলে সেনেটরগণ ও জনমত বিরোধিতার কারণ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। যদি বিরোধী পক্ষের পশ্চাতে জনমতের বিপুল সমর্থন থাকে, তাহা হইলে মূল বিলের উত্থাপকগণ বিলটির বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিয়া বিলটির অবাঞ্ছিত অংশ পরিত্যাগ করিতে পারে।

অনুকূল মতসংগ্রহ (Lobbying) :—কংগ্রেসের দুই কক্ষের সদস্যদিগকে নানা প্রকারে প্রভাবিত করিয়া বিল পাস বা অগ্রাহ্য করিয়া দিবার জন্য কংগ্রেস বহির্ভূত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে যে বিপুল প্রচেষ্টা করা হইয়া থাকে তাহাকে Lobbying কহে। যুক্ত রাজ্যে অনুকূল মত সংগ্রহ আইন প্রণয়নের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একটি বিলের দ্বারা সম্ভাব্য উপকারলাভ বা ক্ষতি রোধ করিবার জন্য বিশেষ স্বার্থবাহী প্রতিষ্ঠানগুলি অনুসন্ধান পরিষদ (Research Establishment) স্থাপন করে। তাহারা পরিসংখ্যান ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের কার্যে লিপ্ত হয়। প্রতিষ্ঠানগুলি সংবাদপত্র, রেডিও, বিজ্ঞাপন, জনসভা, চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, টেলিফোন প্রভৃতির মাধ্যমে জনমত গঠন করিতে থাকে। কংগ্রেসের প্রাক্তন সদস্যগণ অর্থলাভ করিয়া কংগ্রেসের বর্তমান সদস্য-দিগকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করেন। সাধারণতঃ অত্যন্ত মেধাবী ও দক্ষ ব্যক্তিদিগকে এই সকল কার্যে নিযুক্ত করা হয়। স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি উৎকোচ দানেও বিরত হয় না। দেখা যাইতেছে যে জনমত গঠনের দিক হইতে অনুকূল মত সংগ্রহের উপকারিতা রহিয়াছে, কিন্তু ইহার দ্বারা উৎকোচ ও অন্যান্য ধরনের দুর্নীতি প্রসার লাভ করিয়াছে।

নির্বাচন কেন্দ্র গঠনে কারচুপি : (Gerrymandering) :—ম্যাসা-চুসেটস্ এর রাজ্যপাল (Governor Gerry) নিজ দলের অধিক সংখ্যক ব্যক্তির রাজ্যসভায় নির্বাচন সুরক্ষিত করিবার জন্য এমন ভাবে নির্বাচন কেন্দ্রগুলি গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন যে বিরোধীদলের ভোট-দাতাগণকে তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রে [illegible] এবং আপন দলের যাহাতে অধিক কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা

থাকে তাহারই জন্য তাহাদের অঞ্চলগুলি লইয়া নূতন নির্বাচন কেন্দ্র গঠন করিলেন। পুরাতন নির্বাচন কেন্দ্রগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচন কেন্দ্র সৃষ্টি হওয়ায় বিরোধীদলের অসুবিধা এবং গভর্ণর জেরির দলের সুবিধা হইল। নির্বাচন কেন্দ্র গঠনে এই শঠতা গভর্ণর জেরির নামানুসারে Gerrymandering নামে পরিচিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে এই দুর্নীতি বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু অত্যাধুনিক কালে জনমত সজাগ হইয়াছে। তাই নাগরিকগণ এইরূপ দুর্নীতি প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক। দ্বিতীয়তঃ একদল ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, অন্যদল যখন ক্ষমতা লাভ করিবে তাহারা ঐ নীতির আশ্রয় লইবে। তখন প্রথমোক্ত দল বিপন্ন হইবে—এই কথা মনে করিয়াও নির্বাচন কেন্দ্র গঠনে কারচুপি কমিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Federal Court)

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠার হেতু

যুক্ত-রাষ্ট্রীয় বিচারালয় ও তাহার রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব পৃথিবীর শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে মার্কিন দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। যুক্ত-রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভারসাম্য (balance) রক্ষা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও অঙ্গরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের উপর নির্ভরশীল। এই ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া মতদ্বৈধ ও বিরোধ উপস্থিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই মতদ্বৈধ বা বিরোধের নিরপেক্ষ মীমাংসা করিবার জন্য শাসনব্যবস্থার অভ্যন্তরে এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন যাহার উপর সকল সংশ্লিষ্ট মহলের পূর্ণ আস্থা থাকিতে পারে। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই সংবিধান প্রণেতৃগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে এই মার্কিনী পরিকল্পনার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। অবস্থা-ভেদে অল্প বিস্তর পরিবর্তন করিয়া ক্যানাডা, সুইটজারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের মূল সূত্র গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সংবিধানের প্রণেতৃগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বৈদেশিক রাষ্ট্র সমূহের সহিত যে সকল সন্ধি-চুক্তি আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, তাহার প্রামাণিক ব্যাখ্যাতা হিসেবে একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় আবশ্যক। অঙ্গরাষ্ট্রের আদালত গুলির উপর এই

বিষয়ে নির্ভর করা অনুচিত; কারণ এক অঙ্গরাষ্ট্রের আদালতের রায় অন্য রাষ্ট্র গ্রাহ্য না করিবারই সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ এক অঙ্গরাষ্ট্রের নাগরিকের সহিত অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে অঙ্গরাষ্ট্রীয় আদালতের পক্ষে ন্যায় বিচার করা সুকঠিন; এই জন্যও একটি পক্ষপাতশূন্য আদালতের প্রয়োজনীতা তাহারা অনুভব করিয়াছিলেন। সর্বোপরি সংবিধানের প্রণেতৃগণ (যাহাদের মধ্যে ক্ষুরধারবুদ্ধি কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন) তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক অভিজ্ঞতা হইতে স্পষ্ট অনুধাবন করিয়াছিলেন যে সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং কংগ্রেসীয় আইন ও অঙ্গরাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা লইয়া মতদ্বৈধ উত্থিত হওয়া অনিবার্য। সেইজন্যও এমনি একটি নিরপেক্ষ বিচারালয়ের আবশ্যকতা তাহারা অনুভব করিয়াছিলেন যাহার ব্যাখা ও ভাষ্য অবিসংবাদী ভাবে সকল পক্ষ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। এই সম্বন্ধে আলেক্‌জাণ্ডার হ্যামিল্‌টন লিখিয়াছেন "Laws are a dead letter without courts to expound and define their true meaning." অর্থাৎ যদি আইনের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোন বিচারালয় না থাকে তাহা হইলে আইন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের এলাকা (Jurisdiction) :—সংবিধানের তৃতীয় ধারার দ্বিতীয় উপধারায় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের অধিকারের পরিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ উপাধারাটি সম্বন্ধে অধ্যাপক মানরো বলিতেছেন: "As a model of concise legal phraseology, this paragraph is probably unsurpassed in the whole range of constitutional literature." অর্থাৎ শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে এমন সংক্ষিপ্ত আইনবিষয়ক রচনা পদ্ধতি অতুলনীয়। উল্লিখিত উপধারা অনুযায়ী যে সকল ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে দেওয়া হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে।

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও সন্ধি সংক্রান্ত মোকদ্দমা (Cases arising under the Federal Constitution, Laws and Treaties):

(২) বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত, অন্যান্য দূত এবং বাণিজ্যদূত প্রভৃতি সংক্রান্ত মামলা (Cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls):

(৩) আমেরিকার জাহাজ বাহির সমুদ্রে ও আমেরিকার এলাকাভুক্ত সাগরাংশে চলাফেরা কালে যদি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহার বিচার-মীমাংসা, জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগার ফলে ক্ষয়-ক্ষতির মোকদ্দমা, সামুদ্রিক বীমাব্যবস্থা জাহাজের মাল বহনের ভাড়া সংক্রান্ত মামলা, যুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ধৃত শত্রুপক্ষীয় বা শত্রুপক্ষের সহিত পরোক্ষে যুক্ত কোন শক্তির জাহাজ সম্বন্ধে বিরোধ প্রভৃতি। ইহাকে Admiralty and Maritime Jurisdiction বলে।

(৪) যে সকল মোকদ্দমায় যুক্তরাষ্ট্র অথবা একটি বা একাধিক অঙ্গরাষ্ট্র পক্ষভুক্ত থাকে (Cases in which the United States or a State of the Union is a party).

(৫) বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্রের নাগরিকের মধ্যে বিরোধ: (Controversies between the citizens of different States)

(৬) এতদ্ব্যতীত সুপ্রীম কোর্টের Habeas Corpus, Mandamus, Injunction এবং Certiorari বিষয়ক বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে।

যুক্ত-রাষ্ট্র বিচারালয় ও কংগ্রেস

সংবিধানের তৃতীয় ধারার প্রথম উপাধারাতে বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ক্ষমতা একটি সুপ্রীম কোর্ট ও তাহার অধীনস্থ আদালতের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। সুপ্রীম কোর্ট ও নিম্নস্থ বিচারালয় সমূহ কিভাবে গঠিত হইবে, কতজন বিচারপতি কোন বিচারালয়ে নিযুক্ত হইবেন, তাহা স্থির করিবার জন্য কংগ্রেসকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে বিচারপতি-গণকে স্থায়ী পদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে এবং লিখিত হইয়াছে যে বিচারক-গণের কার্যকালে তাঁহাদের বেতন প্রভৃতি কোন পরিবর্তন করা হইবে না। কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত মণ্ডলীর বিচারকের সংখ্যা এবং বেতনাদি নির্ধারণ করিবার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রে বিধানমণ্ডলী এবং শাসন কর্তৃপক্ষ বিচারালয়ের সহিত সম্পর্কহীন নহে। অন্য পক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যতঃ বিচারকদিগের নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিশুদ্ধ ক্ষমতা পৃথকীরণ নীতি এই স্থলে রক্ষিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়-সমষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ আদালত সুপ্রীম কোর্ট, কংগ্রেসীয় আইন বিচারান্তে সংবিধান বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। শাসন যন্ত্রের কার্যাবলীর উপরও অনুরূপ ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের রহিয়াছে। এইদিক হইতেও ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে। কারণ বিচার বিভাগ আইন এবং শাসন বিভাগের উপর ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় মণ্ডলীর শ্রেণীবিভাগ ও ক্ষমতা বণ্টন (Classification of Federal Courts)—

১। **সুপ্রীম কোর্ট** (সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়) : তিন প্রকার ক্ষমতা :

মৌলিক বিচার ক্ষমতা (Original Jurisdiction) :

(ক) যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কোন অঙ্গরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ।

(খ) একটি অঙ্গরাষ্ট্র ও অপর অঙ্গরাষ্ট্রের সহিত বিরোধের মোকদ্দমা।

(গ) রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি সংক্রান্ত মামলা।

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অঙ্গরাষ্ট্রের অভিযোগ।

(ঙ) এক অঙ্গরাষ্ট্র ও অন্য অঙ্গরাষ্ট্রের নাগরিকগণের মধ্যে মামলা।

আপীল ক্ষমতা : (Appellate Jurisdiction) :

(ক) নিম্নতম যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল মোকদ্দমা।

(খ) অঙ্গরাষ্ট্রীয় আদালতে বিচারীকৃত, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থসম্বলিত মোকদ্দমার আপীল।

বিচার বিভাগীয় পরীক্ষা : কংগ্রেসীয় বা অঙ্গরাষ্ট্রীয় আইন অথবা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি সংবিধান বিরোধী হয় তাহা হইলে সেই আইন বা ব্যবস্থা বিচারান্তে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার।

২। **যুক্তরাষ্ট্রীয় আপীল আদালত** (Courts of Appeal) :

(ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল।

(খ) শুল্ক, বাণিজ্য, করস্থাপন, আমদানী কর প্রভৃতি বিষয়ে কংগ্রেস যে আইন করিয়াছে, তাহার পরিচালনা (administration) সম্বন্ধে যদি আপত্তি হয় তাহা হইলে Legislative Courts অর্থাৎ আইন পরিচালন আদালতে তাহার বিচার হয়। এই সকল বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল।

(গ) যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কমিশনগুলির প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল মোকদ্দমা।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় জেলা আদালত (District Courts): মৌলিক বিচার ক্ষমতা।

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফৌজদারী (Criminal) অপরাধ ;
(খ) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আনীত দেওয়ানী মোকদ্দমা ;
(গ) বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণের মধ্যে বিবাদ সংক্রান্ত মোকদ্দমা।
(ঘ) কোন বৈদেশিক অথবা অন্য অঙ্গরাষ্ট্রের নাগরিকের বিরুদ্ধে আনীত কোন অঙ্গরাষ্ট্রের অভিযোগ।
(ঙ) পূর্বে উল্লিখিত Admiralty or maritime এলাকা সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা। (যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের এলাকা সংক্রান্ত আলোচনার ৩ নং দ্রষ্টব্য)
(চ) কংগ্রেস বৈধভাবে অন্য যে সকল মোকদ্দমার ভার এই আদালতের হাতে ন্যস্ত করিবে তাহাও এই আদালতের অধিকারভুক্ত।

আপীল আদালত (Court of Appeal): সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সমষ্টির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। তাহার অব্যবহিত নিম্নে যুক্তরাষ্ট্রীয় আপীল আদালতের স্থান। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র উপরোক্ত শ্রেণীর আপীল মোকদ্দমার শুনানীর জন্য ১০টি অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছে। এক একটি অঞ্চলে একটি করিয়া আপীল আদালত আছে। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল লইয়া গঠিত কলাম্বিয়া জেলায় (Washington D. C.) একটি আপীল আদালত আছে। এই আদালতগুলি ১৮৪৮ সালের পূর্বে Circuit Court of Appeal নামে পরিচিত ছিল। এই আদালতসমূহ ১৮৯১ সালে সুপ্রীম কোর্টের উপর আপীল মোকদ্দমার চাপ কমাইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্ততঃপক্ষে দুই জন বিচারপতির উপস্থিতিতে আপীলের শুনানী হইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় জেলা আদালত (District Courts): সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র ৮৬টি জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। কয়েকটি অঙ্গরাষ্ট্র জুড়িয়া একটি জেলা আদালত কাজ করে। আবার জনবহুল বা মোকদ্দমাবাজ অনেক অঙ্গরাষ্ট্রে দুই বা তিনটি জেলা আদালত বিদ্যমান।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা সকল

দিক চিন্তা করিয়া গঠিত হইয়াছে। মার্কিন দেশে বিচারালয় জনসাধারণের অধিকারের অভিভাবক ও প্রতিভূ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সমূহ জনগণের এই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। আমেরিকার জটিল পরস্পর নির্ভরশীল রাষ্ট্র সমষ্টি যুক্তরাজ্যে গ্রথিত হইয়াছে। এই রাজনৈতিক গঠন যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে মার্কিন মুলুকের সুগঠিত বিচার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে তাহার গুরুতর দায়িত্ব বহন করিয়া চলিয়াছে।

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সমুহের স্থান

সুপ্রীমকোর্ট : আমেরিকার সুপ্রীমকোর্ট শুধু বিচার ব্যবস্থায় নহে, সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেইজন্য সুপ্রীম কোর্টের ব্যাপক আলোচনা অপরিহার্য।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ সেনেটের সম্মতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিযুক্ত হন। একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) ও আটজন সহকারী বিচারপতি (Associate Justices) দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। ইহারা অন্ততঃ দশ বৎসর কাজ করিয়া যদি সত্তর বৎসরে অবসর গ্রহণ করেন তাহা হইলে পুরা বেতনে পেনসন পাইয়া থাকেন। অনেক সময়ই দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি তাহার দলীয় আইনজীবীগণের মধ্য হইতে বিচারপতিদিগকে মনোনীত করেন। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলীন রুজেভেল্ট যদিও ডেমোক্র্যাটিক দলের লোক ছিলেন, তথাপি তিনি একজন রিপাবলিক্যানকে প্রধান বিচারপতিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি ২০,৫০০ ডলার ও অন্যান্য বিচারপতিগণ তদপেক্ষা ৫০০ ডলার কম বেতন পাইয়া থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিচারপতি মনোনয়নের নীতি কিছু পরিমাণে স্বীকৃত হইয়া থাকে। বিচারপতিগণ দল ও অঞ্চল নির্বিশেষে নিরপেক্ষ কর্তব্য সম্পাদন করেন।

সুপ্রীম কোর্টের গঠন।

সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিচারপতি সংবিধান অনুযায়ী প্রতিনিধি সভা কর্তৃক অভিযুক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলে সেনেট সভা তাহার বিচার করিবার অধিকারী। ১৮০৪ সালে স্যামুয়েল চেস্ নামক একজন বিচারপতির সেনেট সভায় বিচার হয় এবং তিনি নির্দোষী প্রতিপন্ন হইয়া আমরণ বিচারপতির কাজ করিয়া যান।

বিচারপতিগণের বিচার (Impeachment)

বিচার বিভাগীয় পরীক্ষা (Judicial Review) : সুপ্রীম কোর্টের যে

সকল ক্ষমতার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে বিচার বিভাগীয় পরীক্ষা বা Judicial Review সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা। "Judicial review is the examination by the Courts, in cases actually before them, of legislative statutes and executive and administrative acts to determine whether or not they are prohibited by a written constitution or are in excess of powers granted by it." Dimock and Dimock : American Government in Action

ইহার অর্থ

অর্থাৎ কোন বিশেষ মোকদ্দমা যদি সুপ্রীম কোর্টের নিকট বিচারের জন্য আসে তাহা হইলে ঐ মামলা বিচারকালে, আইনগত আবশ্যকতা অনুযায়ী, সুপ্রীমকোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ব্যাখ্যা করিয়া এবং বিরোধীয় বিষয়বস্তু পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করিতে পারেন যে, কোন বিশেষ আইন বা শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কোন আজ্ঞা সংবিধান অনুসারে অবৈধ।

মারবেরী বনাম ম্যাডিসন (১৮০৩) নামক সুপ্রসিদ্ধ মোকদ্দমার রায় দান কালে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মার্শাল মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সুপ্রীম কোর্টের উপরোক্ত ক্ষমতা রহিয়াছে। কারণ সংবিধানের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব যুক্তরাষ্ট্রে অবিসংবাদীরূপে স্বীকৃত। এইজন্য যদি কোন কংগ্রেসীয় আইন সংবিধানের বিধি লংঘন করে, তাহা হইলে সেই আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের রহিয়াছে। প্রধান বিচারপতি মার্শাল আরও বলিয়াছিলেন যে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ নিয়োগ কালে গ্রহণ করিয়াছেন। যদি কংগ্রেসীয় আইন তাহাদের মতে সংবিধানবিরোধী হয় তাহা হইলে সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিচারপতিগণকে ঘোষণা করিতেই হইবে যে উক্ত আইনটি অবৈধ ; গত্যন্তর নাই। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট এক হিসাবে সংবিধানের ব্যাখ্যাতা, রক্ষক ও অভিভাবক।

বিচার বিভাগীয় পরীক্ষা এবং প্রধান বিচারপতি মার্শালের ভূমিকা—মারবেরী বনাম ম্যাডিসন

চীফ জাষ্টিস্ মার্শালের মত সমসাময়িক কালে নির্বিবাদে অনেকেই মানিয়া লইতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারস্‌ন্ বলিয়াছিলেন যে সংবিধান প্রণেতৃগণ ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং তাহারা কখনও ইচ্ছা করেন নাই যে শাসনব্যবস্থার একটি বিভাগ অর্থাৎ বিচার বিভাগ আইন বিভাগের ক্ষমতার উপর তদারকী করিবে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে মার্শালের পক্ষে যে যুক্তি দেখানো হইয়াছে তাহা মারবেরী বনাম ম্যাডিসন মোকদ্দমার

ন্যায়কে আরও শক্তিশালী করিয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে সংবিধানের ষষ্ঠ ধারার দ্বিতীয় উপধারায় লিখিত হইয়াছে : "This Constitution.........shall be the supreme law of the land.........." দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানের তৃতীয় ধারার দ্বিতীয় উপধারায় বলা হইয়াছে যে "The judicial power shall extend to all cases in law and equity arising under this constitution, the laws of the United States, and treaties made and which shall be made under their authority........." সংবিধান হইতে এই দুইটি উদ্ধৃতির অর্থ হইতেছে এই যে একদিকে সংবিধানের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে (ছয় ধারায় দ্বিতীয় উপধারা), আবার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে যে (তিন ধারার দ্বিতীয় উপধারা) যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সন্ধিচুক্তি এবং সর্বপ্রকার আইন ব্যবস্থা (যুক্তরাষ্ট্রীয় ও অঙ্গরাষ্ট্রীয়)বিচার বিভাগের ক্ষমতাধীন থাকিবে। সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা আলেকজাণ্ডার ম্যাডিসন ফেডারালিষ্ট (Fedralist) নামক সমসাময়িক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন "The interpretation of laws is the proper and peculiar province of the courts. A Constitution is, in fact, and must be, regarded by the judges as fundamental law. It must, therefore, belong to them to ascertain its meaning, as well as the meaning of any particular act proceeding from the legislative body." অর্থাৎ বিচারপতিগণই সংবিধানের ও প্রণীত আইনের ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকার। ম্যাডিসনের এই মন্তব্য টমাস জেফারসনের উক্তির বিরোধিতা করিতেছে। যুক্তির দিক হইতে চীফজাষ্টিস মার্শালের মত যে গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্য

ধীরে ধীরে সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান ব্যাখার ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং আজকাল উহা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠিয়াছে। চীফজাষ্টিস্ হিউজ বলিয়াছেন : "We are under a Constitution but the Constitution is what the judges say it is" বিচারপতি ফ্রাঙ্কফার্টার বলিয়াছেন "The Supreme Court is the Constitution" হিউজের মতে বিচারপতিগণ যেভাবে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করিবেন তাহাই সংবিধান। ফ্রাঙ্কফার্টারের মতে সুপ্রীম কোর্টই সংবিধানের প্রতীক। ইহার মধ্যে কিছুটা অত্যুক্তি থাকিলেও, এই মত সুপ্রীম কোর্টের আধুনিক ক্ষমতার দ্যোতক।

সমসাময়িক কালে যদিও প্রধান বিচারপতি মার্শালের রায় সম্বন্ধে তীব্র মতবৈধ ছিল, আধুনিক কালে সেই মতবিরোধের অনেকাংশে উপশম হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি বিচার বিভাগীয় পরীক্ষাকে এখনও অনেকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। তাহার কারণ এই যে প্রায়শঃ দলীয় রাজনীতি বিচারপতিগণের নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ইহার ফলে মার্শাল প্রবর্তিত নীতির মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই।

ফ্র্যাঙ্কলীন রুজেভেল্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার পূর্বে আমেরিকার রাজনীতিতে দীর্ঘকাল রিপ্যাবলিক্যান দলের আধিপত্য চলিয়াছিল। অল্প সময়ের জন্যই ডেমোক্রাটিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। ইহার ফলে রিপাবলিক্যান দলের আইনজীবীগণই প্রায়শঃ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। রিপাবলিক্যান দলের নীতি অনুযায়ী এই সকল বিচারপতিগণ রক্ষণশীলতার পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সংস্কারের প্রস্তাব

তাহারা সমাজকল্যাণ মূলক আইনের বিরোধিতা করিয়াছেন। এমন কি শিশুদের শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োগের বিরুদ্ধে যে কংগ্রেসীয় আইন প্রণীত হইয়াছিল তাহাও তাঁহারা বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া আপন রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের দ্বারা আপনাদিগকে পরিচালনা করিয়াছেন। তাহারা ১৮৯৫ সালে আয়কর স্থাপন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে সকল মহলেই অল্প বিস্তর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯১৩ সালে জনসাধারণ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধক গ্রহণ করিয়া নিরঙ্কুশভাবে আয় কর ধার্য করিবার ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসকে প্রদান করে। সুপ্রীম কোর্টের এই সকল জনকল্যাণবিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে একটি আপত্তি উঠে এই যে সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রে আপনাকে তৃতীয় একটি আইন পরিষদে পরিণত করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি রুজেভেল্ট সুপ্রীম কোর্টকে "Third legislature" তৃতীয় কক্ষ বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে বিচারপতিগণ দলীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ জনমত সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পদদলিত হইয়াছে এবং সুপ্রীম কোর্ট নির্বিচারে গণতন্ত্রবিরোধী কাজ করিয়া চলিয়াছে।

১৯৩৩ সালে যখন রাষ্ট্রপতি রুজেভেল্ট প্রথম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন প্রায় সুপ্রীম কোর্টের সকল বিচারপতিগণ রিপাবলিক্যান মতাবলম্বী ছিলেন। বিশ্ব

অর্থনৈতিক সংকটের কালে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা রক্ষা কল্পে রুজেভেল্টের যে সকল প্রস্তাব কংগ্রেস ১৯৩৩ সালে আইনে পরিণত করিল, তাহা New Deal বা নূতন ব্যবস্থা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯৩৫ সালে সুপ্রীম কোর্ট ইহার অধিকাংশ আইনই অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রুজেভেল্ট যখন দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন, তখন তিনি সুপ্রীম কোর্টের গঠনপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন কিন্তু কংগ্রেস তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। কিন্তু তাহার প্রচেষ্টা একেবারে বিফল হয় নাই। অল্পদিন পরেই দেখা গেল বিচারপতিগণের মধ্যে কয়েকজন পূর্ব মত পরিবর্তন করিলেন এবং কয়েকজন ডেমোক্র্যাটিক দলের মতাবলম্বী বিচারপতিও নিযুক্ত হইলেন। ইহার ফলে রুজেভেল্টের নির্দেশে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত সমাজকল্যাণমূলক সামাজিক নিরাপত্তা আইন ও রেল শ্রমিক আইন সুপ্রীম কোর্ট বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া রায় দেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিচারপতিগণ জনমতের গতি কোন পথে, তাহা লক্ষ্য করিয়া আপনাদের অতিরক্ষণশীল নীতি পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় উন্নতি কল্পে উদারনৈতিক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা নয়। প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে সামাজিক কল্যাণপ্রসূ আইন তাঁহারা ৫—৪ ভোটে অবৈধ ঘোষণা করিয়াছেন। এই সামান্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা জনগণনির্বাচিত কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত ও নাগরিক সাধারণের প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি সমর্থিত আইন বাতিল করা অগণতান্ত্রিক। তাই অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন যে নয় জনের মধ্যে ৭ জন যদি কংগ্রেসীয় আইন অবৈধ ঘোষণা করেন তবেই তাহা অবৈধ হইবে, নতুবা নহে। আর একটি প্রস্তাব এই যে যদি সুপ্রীম কোর্ট কোন কংগ্রেসীয় আইন বাতিল করিয়া দেন, তাহা হইলে কংগ্রেস যদি ঐ আইন পুনরায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করে, তবে সুপ্রীম কোর্টের বিরুদ্ধ রায় সত্ত্বেও উহা বৈধ আইনে পরিগণিত হইবে।

এই দুইটি পরিবর্তন সাধন সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষ। এই সংশোধন পাস করানো সুদূর পরাহত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কেহই সুপ্রীম কোর্টের

ঐ বিষয়ে মন্তব্য

বিচার বিভাগীয় পরীক্ষা বা Judicial Review ক্ষমতার অবসান কামনা করে না। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ জনমত ও বর্তমান প্রগতিশীল যুগোপযোগী জাতীয় স্বার্থ যদি সম্যকভাবে বিবেচনা করিয়া উপরোক্ত ক্ষমতা নিরপেক্ষ ও উদার ভাবে ব্যবহার করিতে থাকেন তাহা হইলে সংঘর্ষের সম্ভাবনার অবসান হইতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল (Political Partie..)

রাজনৈতিক দল গঠন মতভেদ ভিত্তিক। আবার মতভেদ মূলতঃ অর্থনৈতিক স্বার্থানুগ। তাই যে সমাজে শ্রেণী বিভেদ ও ধনীদরিদ্র, অধিকারী ও অনধিকারীর পার্থক্য বিদ্যমান সেই সমাজে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব অবশ্যভাবী। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রণেতৃগণ দলগঠনের বিরোধী ছিলেন। ফিলাডেলফিয়া সংবিধান সম্মেলনের অন্যতম নেতা ম্যাডিসন মনে করিতেন যে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত, যাহাতে কোন ক্রমে "Violence of faction." অথবা দলীয় হিংসা তাহাকে কলুষিত করিতে না পারে। জর্জ ওয়াশিংটন 'The Spirit of Party' অথবা দলীয় মনোভাব পরিহার করিবার জন্য নাগরিক সাধারণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। দলীয় রাজনীতি যে সকল দোষ আধুনিক কালে নিন্দিত হইয়াছে অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত জর্জ ওয়াশিংটন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। নির্বাচনমূলক শাসনব্যবস্থায় দলীয় রাজনীতি বিশেষরূপে ক্ষতিজনক বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই রাজনৈতিক দল গঠনের সূত্রপাত হয়। এইজন্যই তিনি চিন্তিত হইয়া জাতির উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী প্রচার করেন।

প্রথম যুগে দল গঠনের বিরুদ্ধ মত

ফিলাডেলফিয়া সংবিধান সম্মেলনেই রাজনৈতিক দল গঠনের প্রথম সূচনা লক্ষ্য করা যায় যদিও তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই কোন দিকে রাজনীতির গতি অগ্রসর হইতেছে। সম্মেলনে দুইটি বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন। অধিকাংশ বিশ্বাস করিতেন যে কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষমতাশালী করিতে হইবে। সেইজন্য তাহারা অঙ্গরাষ্ট্রের অনেক ক্ষমতাই যুক্তরাষ্ট্রে ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহারা হইতেছেন Federalist বা যুক্তরাষ্ট্রীয় দল। আর এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাহারা অঙ্গরাষ্ট্র হইতে অত্যল্প ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাদের Anti-Federalist বা কেন্দ্রীভূত যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বলা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ সংবিধান বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণের সময় তাহার শক্তিশালী সমর্থন

দলের উদ্ভব ও বিবর্তন

করেন ; দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ তাহার বিরোধিতা করেন। আলেক্জাণ্ডার হ্যামিলটন প্রথম দলের এবং টমাস্ জেফারসন দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন দুই জনকেই তাঁহার ক্যাবিনেট বা মন্ত্রি পরিষদে লইয়া দুই দলের মধ্যে মিলনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাবিনেটের অন্য সকল সদস্যই ছিলেন Federalist বা যুক্তরাষ্ট্রীয় দলের। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সূত্রপাত হইল দল লইয়া। টমাস জেফারসন হ্যামিলটনের নীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন। তাঁহার দলটি রিপাবলিক্যান দল নামে পরিচিত হইল। দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি জন এ্যাডামস্-এর সময় হ্যামিলটন ও জেফারসনের দুইটি দল আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল ; ১৮০০ সালে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হইল তাহাতে দলীয় ভিত্তিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। জেফারসন্ জয়লাভ করিলেন। ফেডারালিষ্টের দল শৃঙ্খলার দিকে ঝুঁকিলেন ; রিপাবলিক্যান দল মৌলিক অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিল। ১৮২৮ সালে যখন এ্যানড্রু জ্যাক্সন্ রাষ্ট্রপতি হইলেন, তখন রিপ্যাব-লিক্যান দল ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক্যান দল নামে পরিচিত হইতে থাকে এবং পরবর্তীকালে ডেমোক্র্যাট নাম ধারণ করে। ফেডারালিষ্ট দল পরবর্তী কালে প্রথমত হুইগ ও শেষে রিপাবলিক্যান নামে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়। রাষ্ট্রপতি জ্যাক্সনের কার্যকাল যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল গঠনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। তখনকার দিনে হুইগ বা রিপাবলিক্যান দল ছিল রক্ষণশীল (Conservative) আর ডেমোক্র্যাট দল ছিল উদারনৈতিক (Liberal)। রাষ্ট্রপতি এব্রাহাম লিঙ্কনের সময়ে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রিপাবলিক্যান দল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সময়ে রিপাবলিক্যান দল উচ্চ হারের আমদানী শুল্ক স্থাপন নীতি সমর্থন করে এবং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ এই দলটির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায়। ডেমোক্র্যাট দল শুল্ক হ্রাস নীতি গ্রহণ করে এবং কৃষি প্রধান দক্ষিণা-ঞ্চলের নাগরিকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতে সমর্থ হয়। রিপাবলিক্যান দল লিঙ্কনের সমর্থক ছিলেন, কারণ রিপাবলিক্যানদের ঘাঁটি ছিল উত্তরাঞ্চলে। দক্ষিণাঞ্চলে ডেমোক্র্যাটগণ সেই কালে প্রায় একাধিপত্য স্থাপন করে। দুইটি দলের সংগঠন-গত সত্তা এই সময় হইতেই গড়িয়া উঠিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ লিঙ্কনের রাষ্ট্রপতিত্ব কালে শিল্পপ্রধান উত্তরাঞ্চল দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। উল্লেখযোগ্য যে শিল্পপ্রধান উত্তরাঞ্চলে দাস শ্রমিক ছিল না। কিন্তু কৃষি প্রধান দক্ষিণে চাষাবাদ সম্পূর্ণ দাস শ্রমিক দ্বারাই চলিত। এইজন্য লিঙ্কনের দাসত্ব-বিরোধী নীতি দক্ষিণাঞ্চলে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। কারণ

দাসত্ব প্রথার অবলুপ্তি তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ১৮৬১-৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে মতভেদ।

১৯১১-১২ সালে ডেমোক্র্যাটগণ দেখিতে পায় যে শুল্কহ্রাস নীতির দরুন তাহাদের দলের রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভীষণ বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। সেইজন্য ডেমোক্র্যাটগণ তাহাদের পূর্বের শুল্কনীতি পরিত্যাগ করে। দলীয় রাজনীতির আসরে শুল্কনীতি সম্পূর্ণ মূল্যহীন হইয়া যায়। ১৯১২ সালে রিপাবলিক্যান দলের অন্তর্বিরোধের জন্য প্রোগ্রেসিভ দল বলিয়া একটি নূতন দল গঠিত হয় এবং রিপাবলিক্যান দল অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই সুযোগে উডরো উইলসন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হইলেন ১৯১৬ সালে। আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় রাষ্ট্রপতি উইলসনের জনপ্রিয়তা কমিয়া যায়। ১৯১৮ সালে তিনি যখন লীগ অফ নেশনস্ বা জাতিসংঘের চুক্তি সম্বলিত ভারসাই সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন তখন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিক্যান দল বিরাট আন্দোলন সুরু করে। সেনেট জাতিসংঘের চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া দেয়। ইহার ফলে রিপাবলিক্যান দল পুনরায় জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯১১ ১২

১৯৩৩ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট চলিতেছে; যুক্তরাষ্ট্র বিরাট আর্থিক বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। রিপাবলিক্যান দল ও সেই দলের রাষ্ট্রপতি হুভার ইহার কোনই সুরাহা করিতে পারেন না। ইহার ফলে ডেমোক্র্যাট ফ্র্যাঙ্কলীন রুজেভেল্ট রাষ্ট্রপতিপদের নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সহিত সমাজকল্যাণমূলক আইনবলে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বিপর্যয় নিবারণ করিতে সমর্থ হন। এইজন্য তিনি পর পর সর্বসমেত চার বার রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি টুম্যান তাহার স্থানে অভিষিক্ত হন। তাহার পর আবার রিপাবলিক্যান রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার পর পর দুইবার নির্বাচিত হইয়া রিপাবলিক্যান দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন কিন্তু রিপাবলিক্যান দল বিশ্বশান্তি স্থাপনে ও আণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে কোন সুষ্ঠু সমাধানে উপস্থিত হইতে অপারগ হওয়ায় ১৯৬১ সালে ডেমোক্র্যাট রাষ্ট্রপতি কেনেডি নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন।

১৯৩৩

যদিও আমেরিকার এই দুইটি বৃহৎ দল ব্যতীত অন্য কোন দলের ক্ষমতা দখলের আশা নাই তথাপি মার্কিন দেশে অন্যান্য কয়েকটি ছোট ছোট দল গড়িয়া উঠিয়াছে। Prohibition Party বা মাদকদ্রব্য নিবারণ প্রয়াসী দল, সমাজতান্ত্রিক দল, কমিউনিষ্ট দল এবং মেহনতী

ক্ষুদ্র দল সমূহ

নাগরিকগণের সংস্থাগুলি কর্তৃক গঠিতশ্রমিক শ্রেণী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির উপর সামান্য সামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

মার্কিন রাজনৈতিকদল এত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের দ্বারা গঠিত যে তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময় বোধ হয়। দলের অভ্যন্তরে নানা মতাবলম্বী মানুষ রহিয়াছে— কেহ উগ্রপন্থী, কেহ নরমপন্থী, কেহ রক্ষণশীল, কেহ উদার পন্থী, কেহ ধর্মবিশ্বাসী, কেহ বা নাস্তিক বা সন্দেহবাদী। একই দলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ রহিয়াছে বলিয়া দলের অভ্যন্তরে আবার ছোট ছোট group বা সমষ্টি রহিয়াছে। দলের মধ্যে মতদ্বৈধ প্রকাশ করিবার পূর্ণ গণতান্ত্রিক সুযোগ আছে। তবে বৃহৎ ব্যাপারে, যথা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরগুলিতে তীব্র মতভেদ প্রকাশিত করিয়াও শেষস্তরে একযোগে দলীয় স্বার্থে কাজে লাগিয়া যায়। যে উপাদানটি প্রধানতঃ এই অসম মানব গোষ্ঠীকে মোটামুটি ভাবে একতাবদ্ধ করে তাহা হইতেছে অর্থনৈতিক স্বার্থ। এই স্বর্ণবন্ধনী সকলকে সংযুক্ত করিয়া দলকে কর্মশক্তি দেয়। অধ্যাপক মান্‌রো আমেরিকার দলসমূহের সভ্যশ্রেণী বিশ্লেষণ করিয়া যে মন্তব্য করিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য: "An American political party is a mosaic made up of some millions of adherents who, by reason of ancestry, home influence, race, economic states, religion, place of abode, leadership, organisation, inertia, or reasoned preference allow themselves to be drawn into it." সত্যই বিচিত্র ঐ দেশে রাজনৈতিক দলগুলিও বিচিত্র; নানা গোষ্ঠী, নানা জাতি, নানা অর্থনৈতিক স্তর, নানা ধর্ম, নানা অঞ্চল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগত স্বার্থ, নানা আদর্শে বিশ্বাস, নানা উপদলীয় আনুগত্য লইয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী একই দলভুক্ত হইয়া আপনাপন উদ্দেশ্যলাভে দুইটি বৃহৎ জাতীয় দলে সংঘবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

আমেরিকার বৃহৎ দল দুইটির বিশ্লেষণ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দলগুলিকে আইনতঃ স্বীকার করা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাদের গুরুত্ব অসাধারণ। দলগুলিকে বাদ দিয়া আমেরিকার রাজনীতির প্রকৃতি উপলব্ধি করা অসম্ভব। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে, তাহার দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে, কংগ্রেসের আইন প্রণয়নে, এমনকি সুপ্রীম কোর্টের বিচার ব্যবস্থার উপরও দলীয় রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তেমনি অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজনীতিও দলকবলিত হইয়াছে। দলগুলির জন্য শাসনব্যবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু দলগুলিই জনমত সংহত করিয়া তাহার প্রকাশের মাধ্যম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকার গণতন্ত্র যে রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহার গতি ও প্রকৃতি—সকলই রাজনৈতিক

রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার উপর দলীয় প্রভাব

দলগুলিরই অবদান। জনসভা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন, বিজ্ঞাপন, রেডিও টেলিভিশন, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রকাশন, টেলিগ্রাম, চিঠিপত্র অঙ্গরাষ্ট্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের উপর চাপসৃষ্টি প্রভৃতির মধ্যমে দলগুলি আমেরিকার শাসনব্যবস্থার সহিত জনমতের যোগসাধন করিয়া গণতন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। সর্বদেশে সর্বকালে দলের যে সকল দোষক্রটি থাকে তাহা আমেরিকার দলসমূহ বর্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি তাহারা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

দলীয় প্রচার ব্যবস্থা

আমেরিকার দলগুলি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রধানতঃ চার প্রকার কার্যে লিপ্ত থাকে—"formulating issues, nominating candidates, maintaining a collective and continuing responsibility and stirring up the political interest of the people" (Munro)। অর্থাৎ রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সুশৃঙ্খল বিন্যাস, দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন, সকল রাজনৈতিক বিষয়ে সামগ্রিক ও সর্বকালীন দায়িত্ব গ্রহণ ও জনগণের রাজনৈতিক মতামত গঠনই আমেরিকার দলগুলির প্রধান কর্তব্য। প্রার্থী মনোনয়নের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য দলীয় সংস্থা (Caucus) সম্মেলন ও ভোটার-গণের সভা আহ্বান অপরিহার্য। প্রচেষ্টা ব্যতীত মনোনীত প্রার্থীর সাফল্য অসম্ভব। তাই তাহারা অর্থসংগ্রহ এবং কর্মীদল গঠন করে, বিভিন্ন স্তরের কমিটি ও নেতা নির্বাচন করে। নির্বাচন কেন্দ্রে, অঙ্গরাষ্ট্রে, সময়ে সময়ে অঞ্চলে ও জাতীয় ক্ষেত্রে—প্রতিস্তরে সংগঠনের প্রয়োজন আছে। স্বেচ্ছাসেবক বা নিঃস্বার্থ কর্মীদের দ্বারা এই বিরাট দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন সম্ভব নহে। তাই প্রতি দল আপন দলভুক্ত, বেতনভুক্ অসংখ্য কর্মী নিয়োগ করে। আমেরিকার 'Party boss' বা দলীয় কর্তা ও নির্বাচন মোড়লগণের প্রভাব প্রতি দলের মধ্যেই প্রচুর। বিভিন্ন প্রার্থীর দলীয় মনোনয়নের সময় দলীয় কর্তা বা Party bossগণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রতি প্রার্থীর নির্বাচন মোড়ল তাহার প্রার্থীর পক্ষে, এবং অন্যান্য নির্বাচন মোড়লের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া আপন প্রার্থীর মনোনয়ন সুনিশ্চিত করিবার প্রয়াস পান। নিম্নতম স্তর হইতে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই ছোট বড় নানা Party boss ও নির্বাচন মোড়ল বিশেষ সক্রিয় থাকেন। এইরূপে দলগুলি তাহাদের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্য সম্পাদন করে।

দলীয় কার্যাবলী

Party boss বা দলীয় মোড়ল

আমেরিকার রাজনীতি ক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিক্যান দল অতিশয় শক্তিশালী। এই দুইটি দলকেই জাতীয় দল হিসাবে আখ্যা দেওয়া চলে; অন্য সকল দলই নগণ্য। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-দলীয় রাজনীতি আমেরিকার গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে। একদল সরকার পরিচালন করে অন্যদল শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সমালোচনায় লিপ্ত থাকে। বহুদলের দ্বারা গঠিত ও সরকার তদ্রূপ গঠিত বিরোধী পক্ষ দুর্বল না হইয়া পারে না। এই কারণে দ্বি-দল নীতি আমেরিকার গণতন্ত্রে একটি শক্তিশালী সুস্থতা আনিয়া দিয়াছে।

আমেরিকার দ্বি-দলীয় নীতির সুবিধা

আধুনিক কালে কি আভ্যন্তরীণ নীতি, কি পররাষ্ট্রনীতি—কোন ক্ষেত্রেই দুই দলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। সংগঠনগত ঐতিহ্য, পরস্পরবিরোধী প্রভাবশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সমর্থন, পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক এবং আঞ্চলিক স্বার্থ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও দখলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিক্যান দল আজকাল আপনাপন স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিয়াছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে শিল্পপ্রধান অঞ্চলে রিপাবলিক্যান দল লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অন্যপক্ষে ডেমোক্র্যাট দল দক্ষিণ এবং মধ্য পশ্চিমের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে আপনাদের প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় দুইটি দলের প্রতিনিধিবর্গের যে জাতীয় সম্মেলন হয়, তাহা পর্যালোচনা করিলে আমেরিকার দলগত নীতির মূলসূত্র পাওয়া যায়। দুই দলের জাতীয় সম্মেলনের মত বেসরকারী গণতান্ত্রিক সম্মেলন পৃথিবীতে বিরল। এক-একটি দল কি উপাদানে গঠিত, কি বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব দলের অভ্যন্তরে চলিতেছে—এই সকল বিষয়ের তথ্যমূলক সন্ধান জাতীয় সম্মেলন দুইটিতে পাওয়া যাইতে পারে। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিক্যান দলের জাতীয় সম্মেলন আমেরিকার গণতন্ত্রের শক্তি ও দুর্বলতার প্রতীক।

দুইটি বৃহৎ দলের নীতিগত পার্থক্য-হীনতা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অঙ্গরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা

আমেরিকার সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে অঙ্গরাষ্ট্র সমূহের শাসন-পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের দিক হইতে বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণীত ও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই ১৩টি অঙ্গরাষ্ট্র লিখিত সংবিধানের ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বিদ্যমান ছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে সকল প্রতিনিধি ফিলাডেলফিয়া সংবিধান সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলেই ঐ রাষ্ট্রগুলিরই প্রতিনিধি ছিলেন।

অঙ্গরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে স্বীকৃত হয় যে রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকিবে না। Residuary Powers বা অবশিষ্ট ক্ষমতা অঙ্গরাষ্ট্রের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল আমেরিকার এবং বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতির বিবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইয়াছে এবং অনেক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাষ্ট্র একযোগে কাজ করিতেছে। আধুনিক কালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা সুপ্রীমকোর্টের সিদ্ধান্তের ফলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অঙ্গরাষ্ট্রগুলি কেন্দ্রের নিকট হইতে বিপুল অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। এই সাহায্যদানপদ্ধতির মধ্য দিয়া যুক্তরাজ্য আজকাল অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে। তথাপি বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি তাহাদের পূর্বতন ক্ষমতার বেশীর ভাগই এখনও নির্বিবাদে ব্যবহার করিতেছে।

আধুনিক কালে অঙ্গরাষ্ট্রের প্রভাবের হানি

আভ্যন্তরীণ যান-বাহন, সম্পত্তি বিষয়ক আইন, শিল্প ও ব্যবসা, জনকল্যাণ-মূলক প্রচেষ্টা, ফৌজদারী, আইন এবং আভ্যন্তরীণ শ্রমনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। অঙ্গরাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত তাহার সীমানা যুক্তরাষ্ট্র সরকার পরিবর্তন করিতে পারে না।

অঙ্গরাষ্ট্রের ক্ষমতার পরিধি

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে, সমস্ত অঙ্গরাষ্ট্রগুলির শাসনপদ্ধতি

প্রজাতান্ত্রিক হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল অঙ্গরাষ্ট্রকৃত আইন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বৈধভাবে প্রণীত আইনের বিরোধী, সেইরূপ অঙ্গরাষ্ট্রীয় আইনও অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্র নূতন অঙ্গরাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইতে পারেন। এই ক্ষমতানুযায়ী সম্প্রতিক কালে এ্যালাস্কা ও হাওয়াইকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে। নবাগত অঙ্গরাষ্ট্রের সংবিধান কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হওয়া আবশ্যক। ৫০টি রাষ্ট্র ও Washington D.C. বা Federal Distirct of Columbia লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। আয়তন, শিল্পশক্তি এবং জনবহুলতার দিক হইতে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সমতা অবর্তমান, তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সকলকেই পার্থক্য নির্বিশেষে সমমর্যাদা দান করা হইয়াছে। সেনেটে সমপ্রতিনিধিত্ব নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। তাই প্রতিরাষ্ট্র হইতে দুইজন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনেটরগনির্বাচিত হন।

অঙ্গরাষ্ট্র সম্বন্ধে সংবিধানের বিধি

বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের শাসনব্যবস্থার কাঠামো একই প্রকারের। সকলেরই লিখিত সংবিধান আছে। সংবিধানের মুখবন্ধে সংবিধানের মূলনীতি লিখিত রহিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকার-গুলির সহিত সহযোগিতায় জনগণের মঙ্গল সাধনই সংবিধানের উদ্দেশ্য। সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষিত হইয়াছে; শাসনবিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের গঠন পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত স্থানীয় শাসনব্যবস্থার গঠনপ্রণালীও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যে সকল সর্তে ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কাজ করিতে পারিবে তাহাও সংবিধানে স্থান পাইয়াছে। সর্বশেষে অঙ্গরাষ্ট্রের সংবিধান পরিবর্তনের নিয়মও একটি ধারায় উল্লিখিত আছে। বলা বাহুল্য যে প্রতি অঙ্গরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী জনগণের হস্তেই রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে।

অঙ্গরাষ্ট্রীয় সংবিধান-গুলির প্রধান বিশেষত্ব

অঙ্গরাষ্ট্রগুলি কার্যকলাপের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বিরাট প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সম্যক প্রসার রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সকল অঙ্গরাষ্ট্রেই অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, রাস্তা ও পুল প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দ্রুত চলাচলের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিবার নীতি প্রতি অঙ্গরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। এই দিকে

অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সাফল্য

ইহাদের সাফল্য লক্ষণীয়। চতুর্থতঃ পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের প্রতিপালন, রক্ষাবেক্ষণ ও শিক্ষা; অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি আতুরগণের জন্য ব্যবস্থা, বৃদ্ধদিগের জন্য আশ্রয় গৃহ (Homes) বেকারদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা ও দরিদ্র নাগরিকগণের প্রতিপালন ব্যাপকভাবে সকল অঙ্গরাষ্ট্রই গ্রহণ করিয়াছে। পঞ্চমতঃ অঙ্গরাষ্ট্র নাগরিকগণের জীবনধারণের মানরক্ষাকল্পে ও শ্রমজীবীগণের কল্যাণার্থে নানা আইন প্রণয়ন করিয়াছে। ষষ্ঠতঃ রাষ্ট্রের সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ জীবজন্তু রক্ষা ও পরিপোষণকল্পে অঙ্গরাষ্ট্রীয় সরকার সমূহ সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার ক্রটি করে না। সপ্তমতঃ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধণের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং আবশ্যকমত সর্বপ্রকার শিল্পের আইনতঃ নিয়ন্ত্রণনীতি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আধুনিক উদারনৈতিক প্রাগ্রসর রাষ্ট্রগুলি যে সকল ব্যবস্থা জনকল্যাণ ও শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সেই সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছে।

আইন বিভাগ

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি ব্যতীত সকল রাষ্ট্রেই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা বিদ্যমান। একমাত্র নেব্রাস্কার এক কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নামানুসারে অঙ্গরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ সেনেট ও নিম্ন পরিষদ প্রতিনিধি সভা (House of Representatives) নামে পরিচিত। সেনেটের সদস্যগণ কাউন্টি (County) কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কোথায়ও দেখা যায় একাধিক কাউন্টি মিলিয়া সেনেটের নির্বাচন কেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র সমসংখ্যক সেনেটর নির্বাচিত করেন। প্রতিনিধি সভা জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন সাধারণ কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত হন। সেনেটরদের কার্যকাল প্রতিনিধি সভা হইতে দীর্ঘতর। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সেনেটের এক তৃতীয়াংশের কার্যকাল শেষ হয় এবং সেই স্থলে নূতন নির্বাচন হয়। সেনেটের নির্বাচনপ্রার্থীগণের বয়স প্রতিনিধি সভার নির্বাচন প্রার্থীগণের অপেক্ষা বেশী হওয়া প্রয়োজন। প্রায় সকল রাষ্ট্রেই বৎসরে আইন সভার দুইটি অধিবেশন হয়। কোন কোন রাষ্ট্রে বৎসরে একটি অধিবেশন হয়।

বিল সেনেটে বা প্রতিনিধি সভায় উত্থাপন করা যায়। অর্থ-সংক্রান্ত বিল নিম্ন পরিষদে উত্থাপন করিতে হইবে—এইরূপ নিয়ম আছে। বিল দুইটি পরিষদেই পাস না হইলে তাহা বাতিল হইয়া যায়। বিল দুই পরিষদে পাস হইলে গভর্ণরের নিকট তাহার স্বাক্ষরের জন্য পেশ করিতে হয়। তিনি তাহা স্বাক্ষর

না করিয়া যে পরিষদে বিলের সূত্রপাত হইয়াছে, সেখানে তাহার অসম্মতির কারণ সহ ফেরত দিতে পারেন, অর্থাৎ ভিটো করিতে পারেন। যদি দুই পরিষদ নির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ঐ বিলটি পুনরায় পাস করে, তবে তাহা গভর্ণরের আপত্তি সত্ত্বেও আইনে পরিণত হয়। কোন বিল ভিটো না করিয়া রাষ্ট্রপাল আইন পরিষদদ্বয়কে গৃহীত আইন পুনর্বিবেচনার অনুরোধও করিতে পারেন। কোন কোন রাষ্ট্রে এইরূপ অবস্থায় শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিল পাস করিলেই তাহা রাষ্ট্রপালের আপত্তি সত্ত্বেও আইনে পরিণত হয়; দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হয় না। উত্তর ক্যারলিনায় রাষ্ট্রপালের ভিটো ক্ষমতা নাই।

শাসন বিভাগঃ অঙ্গরাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তাগণ হইতেছেন Governor (রাষ্ট্রপাল), Lieutenant-Governor (সহকারী রাষ্ট্রপাল), একজন সচিব (Secretary of State), হিসাব পরীক্ষক (Auditor), কোষাধ্যক্ষ (Treasurer) ও পরিদর্শক (Superintendent)। কোন কোন অঙ্গরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপাল দুই বৎসরের জন্য, কোথায়ও বা চার বৎসরের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপাল প্রতিনিধি সভা কর্তৃক অভিযুক্ত (Impeached) হইলে, সেনেট তাহার বিচার করেন। সেনেটের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে রাষ্ট্রপালকে শাস্তি দেওয়া চলে। উত্তর ড্যাকোটা (North Dakota) প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিকের দাবিতে রাষ্ট্রপালকে তাহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারে। ইহাকে Recall বা প্রত্যাহার আজ্ঞা বলে। সহকারী রাষ্ট্রপাল, রাষ্ট্রপালের ন্যায়ই জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপালের অপারগতার ক্ষেত্রে সহকারী রাষ্ট্রপাল তাঁহার স্থলভিষিক্ত হন।

রাষ্ট্রপালের ক্ষমতাঃ নিয়োগ, কর্মচারিগণকে পদ হইতে অপসারণ, রাষ্ট্রশাসনযন্ত্রের পরিদর্শন, সৈন্য বিভাগীয় ক্ষমতা; অর্থবিষয়ক ক্ষমতা, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধরক্ষা ও আবশ্যক মত সহযোগিতা দান, শাস্তি মকুব ও মার্জনা প্রভৃতি। রাষ্ট্রপালের নিয়োগ সেনেটের সম্মতিসাপেক্ষ। রাষ্ট্রপালের ক্ষমতা তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আপন দলে তাঁহার প্রতিপত্তির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

রাষ্ট্রপালের নিয়োগ ক্ষমতা আধুনিক কালে বেশ ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রপাল অঙ্গরাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা দল (State guard) ও রাষ্ট্রীয় নাগরিক সৈন্যদলের (militia) সর্বাধ্যক্ষ (Commander-in-chief) তিনি নাগরিক সৈন্য-

দলের সৈনাধ্যক্ষগণকে নিয়োগ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপালই বার্ষিক বাজেট ও আয় ব্যয়ের হিসাব আইনমণ্ডলীতে পেশ করেন।

রাষ্ট্রপাল পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়ণের উপর লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনি একটি দলের নেতা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার হস্তে অনেক নিয়োগ ও অন্যান্য ক্ষমতা রহিয়াছে। এইজন্য রাষ্ট্রপালের প্রভাব প্রতিপত্তি খুবই বেশি। সেনেটের প্রতিনিধি সভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপালের প্রভাব প্রতিপত্তি উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাই কার্যতঃ আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপালের অপ্রত্যক্ষ ক্ষমতা কম নহে। রাষ্ট্রপাল কোন আইনের প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর বিশেষ অধিবেশনও আহ্বান করিতে পারেন এবং জনসাধারণের নিকট বিধানমণ্ডলীর বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমে অভিযোগও করিতে পারেন। তাহা হইলে উভয় সভার সদস্যগণকে নির্বাচকদের নিকট কোন না কোনভাবে জবাবদিহি করিতে হয়, নতুবা তাহাদের পরবর্তী নির্বাচন বিপন্ন হইতে পারে। এইজন্য আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপালের পরোক্ষ ক্ষমতা লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য যে রাষ্ট্রপাল অবস্থা বিশেষে, ভিটোর ভয় দেখাইয়া কোন আলোচ্য বিলে আপন ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন সাধন করাইয়া লইতেও পারেন। আইন বিষয়ক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা রাষ্ট্রপালের রহিয়াছে। তিনি হুকুম বলে (ordinance) কোন আইন সম্বন্ধীয় খুঁটি নাটি সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্রপাল অঙ্গরাষ্ট্র শাসনব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনের অধিকারী।

বিচার বিভাগঃ অঙ্গরাষ্ট্রের বিচারবিভাগের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। প্রতি রাষ্ট্রের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে। মোটামুটি ভাবে রাষ্ট্রীয় বিচারালয়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। **স্থানীয় শান্তিরক্ষা মুলক বিচারালয়** (Court of the Justices of the Peace) এই আদালত ছোট খাট ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা বিচার করে।

২। **কাউণ্টি ও মিউনিসিপ্যাল আদালত (County and Municipal Court)**: এই আদালত উপরে উল্লিখিত বিচারালয় হইতে আগত আপীল মামলার মীমাংসা করে। ইহা ছাড়া ইহা একটু গুরুতর অপরাধের বা বেশি দাবির দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করে।

৩। **উচ্চ আদালত (Superior Court)**: এই আদালত কাউন্টি ও

মিউসিসিপ্যাল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত এই বিচারালয়, কাউন্টি আদালত যে সকল অপরাধের বিচার করিতে পারে, তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ বিচারের অধিকারী। ঠিক তেমনি উচ্চ দাবির দেওয়ানী মোকদ্দমারও এই আদালত বিচার করিয়া থাকে।

(৪) **অঙ্গরাষ্ট্রীয় সুপ্রীম কোর্ট:** অঙ্গরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টই সর্বোচ্চ বিচারালয়। এই বিচারালয় হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীম কোর্টে কোন আপীল হয় না। কিন্তু অঙ্গরাষ্ট্রের সকল বিচারালয় হইতে এই আদালতে আপীল হইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের দশ-বারটি অঙ্গরাষ্ট্র বাদে অন্য সকল রাষ্ট্রেই বিচারপতিগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। Inpeachment বা আইনসভার অভিযোগ ক্রমে বিচারপতিগণের বিচার হইতে পারে। কোন কোন রাজ্যে বিচারকগণের কার্যকাল প্রত্যাহার আজ্ঞা (Recall) দ্বারা অবসান করা যাইতে পারে।

নবম পরিচ্ছেদ

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা

(Local Self Government)

নগর শাসন-পদ্ধতি (City Government): যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরে বিভিন্ন ধরনের শাসন-পদ্ধতি বর্তমান রহিয়াছে। সর্বত্র নাগরিক সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি কেন্দ্রীয় Council বা পরিষদ রহিয়াছে। এই পরিষদটি নগর-শাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। নগরের শাসনযন্ত্রটি পরিচালন ও পরিদর্শনের জন্য একজন মেয়র বা ম্যানেজারও নির্বাচিত হন। সহরের শাসন-যন্ত্রের কাজ বিভিন্ন বিভাগীয় কর্তাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রতি বিভাগে বহুসংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত হন।

তিন প্রকার নগর শাসন-ব্যবস্থা দেখা যায়:

(১) কোন কোন সহরে ভোটদাতাগণ প্রধান কর্ম-কর্তারূপে একজন মেয়র এবং নগর শাসনের ব্যবস্থামূলক নিয়মাদি প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদ (Council) (কোন কোন সহরে পরিষদীয় সদস্যগণ অলডারম্যান বলিয়া পরিচিত)

নির্বাচন করেন। Councillors বা পরিষদীয় সদস্যগণ (অথবা অল্‌ডারম্যান-গণ) সহরের বিভিন্ন অঞ্চল বা ward হইতে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কোন কোন সহরে ওয়ার্ড হইতে কাউন্সিলার বা অল্‌ডারম্যান নির্বাচিত না হইয়া সমগ্র সহরের ভোটারদের ভোটে তাহারা নির্বাচিত হন। অর্থাৎ সমস্ত সহরটাই একটি কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হয়।

(২) কোন কোন নগর-শাসন ব্যবস্থানুযায়ী ভোটদাতাগণ কয়েকজন প্রধান কর্মচারী নির্বাচিত করেন। ইহারা নগর-শাসন কমিশন নামে পরিচিত হন।

(৩) কোন কোন সহরে ভোটারগণ অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। তাহারা সহর শাসনের নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়া থাকেন। এই প্রতিনিধি মণ্ডলীকে একজন নগর-ম্যানেজার (City Manager) নিযুক্ত করিবার ভার দেওয়া হয়। এই নগর ম্যানেজারই নগর-শাসনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন।

প্রথম ব্যবস্থাটিকে মেয়র—কাউন্সিল পদ্ধতি (Mayor-Council Plan) দ্বিতীয়টি কমিশনমূলক নগর শাসনব্যবস্থা (Commission form of government) ও তৃতীয়টিকে সহর ম্যানেজার পদ্ধতি (City Manager Plan) বলে। অনেক সহরে এই তিনটি পদ্ধতির কিছু কিছু অংশ লইয়া মিশ্র শাসন-পদ্ধতি গঠিত হইয়াছে।

মেয়র-পরিষদ (Council) পদ্ধতি : প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে মেয়র-কাউন্সিল পদ্ধতি আমেরিকার প্রায় প্রতিটি সহরে প্রচলিত ছিল। ইহাই সহর শাসন-পদ্ধতিগুলির মধ্যে সর্ব পুরাতন পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সহিত জাতীয় ও অঙ্গরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মিল রহিয়াছে। মেয়র জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং সাধারণতঃ তাহাকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। তিনি নগর-শাসনের বিভিন্ন বিভাগীয় কর্তাদের ও নিম্নতন অনেক কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন। অবশ্য কোন কোন সহরে মেয়রের নিয়োগ সহর কাউন্সিলের (City Council) সম্মতিসাপেক্ষ। সহর শাসনের জন্য প্রণীত নিয়মাবলী মেয়র ভিটো করিতে পারেন। তিনিই সকল আইন ও নিয়মাবলী বহুসংখ্যক কর্মচারীর সহায়তায় কার্যে পরিণত করিয়া থাকেন। তিনিই বাজেট প্রস্তুত করিয়া নগর পরিষদের (City Council) নিকট সম্মতির জন্য পেশ করিবার অধিকারী।

নগর পরিষদ বা City Council সহরের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে আইন ও নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যবহার করেন। পরিষদ যে সকল আইন পাস করেন, সেই গুলিকে Ordinance বলা হয়। কিন্তু যে আইন অনুসারে নগর

পরিষদ গঠিত হইয়াছে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া পরিষদ অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে অঙ্গরাষ্ট্রীয় সংবিধান বা আইন অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বা আইন বিরোধী কোন অর্ডিন্যান্স নগর পরিষদ প্রণয়ন করিলে তাহা অবৈধ বিবেচিত হইবে। নগর পরিষদ করের পরিমাণ ধার্য করিয়া কর আদায় করিতে পারেন। মেয়রের পরামর্শ শুনিবার পর পরিষদ কোন বিভাগের জন্য কত অর্থ কি প্রয়োজনে বিনিয়োগ করিবে, তাহা স্থির করে।

কমিশন পদ্ধতি: কমিশন পদ্ধতি মূলক নগর শাসনব্যবস্থা উপরোক্ত প্রথার অনেক পরে উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রথানুযায়ী সাধারণতঃ অঞ্চল নির্বিশেষে সহরের সমস্ত নাগরিকেরা তিন অথবা ততোধিক (অল্পসংখ্যক) প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তাহাদের উপরই সহর শাসনের আইন, নিয়ম প্রণয়ন এবং তাহা কার্যে পরিণত করিবার ভার দেওয়া হয়। তাহারাই করের পরিমাণ ধার্য করে এবং কিরূপে লব্ধ অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহা নির্ধারণ করে। বিভিন্ন বিভাগীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য কমিশনারগণ বিশ্বাসী এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃত (recognised) কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের উপর ভার দিয়া থাকেন এই প্রতিষ্ঠানের কাজ কমিশনারগণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। কমিশনারগণের মধ্যে একজন সভাপতি বা (Chairman) হিসাবে কাজ করেন; তিনি অনেক সময় মেয়র নামে পরিচিত হন।

সহরের শাসনব্যবস্থার কাজ কর্ম বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত থাকে, যথা, নগরের উন্নতি সাধন, অর্থ বিভাগ, উন্মুক্ত স্থান পার্ক, নগরের সম্পত্তি, যানবাহন চলাচল কালে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি। একজন করিয়া কমিশনার এক বা একাধিক বিভাগের পরিদর্শনের কাজে নিযুক্ত থাকেন।

নগর ম্যানেজার পদ্ধতি: ১৯০৮ সালে ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত ষ্টনটন্ সহরে এই প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে অনেক সহর ঐ প্রথা প্রবর্তন করিয়াছে। এই নিয়মানুসারে সহরের ভোটারগণ একটি ছোট পরিষদ (Council) নির্বাচিত করেন। কাউন্সিলার বা পরিষদ সদস্যগণ নগর শাসনের জন্য আইন নিয়মাদি প্রস্তুত করেন এবং নগর শাসন সংক্রান্ত মোটামুটি একটা প্ল্যান বা পরিকল্পনা গঠন করিয়া থাকেন। কাউন্সিলারদিগের আর একটি বিশেষ কর্তব্য আছে। তাহারা সুষ্ঠুভাবে নগর শাসন পরিচালনা করিবার জন্য একজন অভিজ্ঞ ও গুণসম্পন্ন শাসককে নিযুক্ত করেন। ইহাকে City Manager বা নগর শাসন ম্যানেজার বলে। পরিষদীয় আইনাদি কার্যে পরিণত করা এই

নগর শাসন ম্যানেজারের কর্তব্য। নগর পরিষদের অর্থ ভাণ্ডার হইতে কোন্ খাতে, কি প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়িত হইবে, City Manager বা নগর শাসনকর্তা তাহা পরিষদের নিকট সুপারিশ করেন। সাধারণতঃ যতকাল পর্যন্ত পরিষদ ম্যানেজারের কাজে সন্তুষ্ট থাকেন, ততকাল পর্যন্ত নগর ম্যানেজার বা নগর-শাসনকর্তা তাহার কার্যে বহাল থাকেন। পরিষদ ইচ্ছা করিলে নগর শাসন কর্তাকে (City Manager) বরখাস্ত করিতে পারেন।

নাগরিক বিচারালয়ঃ প্রতি সহরে স্থানীয় মোকদ্দমার বিচারের জন্য আদালত আছে। বড় সহরে বিভিন্ন প্রকার মোকদ্দমার বিচারের জন্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত রহিয়াছে। এই বিষয়টি অঙ্গরাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

কাউণ্টিশাসন ব্যবস্থাঃ যুক্ত রাষ্ট্রের নগর শাসনব্যবস্থা সহরাঞ্চলে বিস্তৃত। গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা অন্যরূপ। প্রতি অঙ্গ রাষ্ট্র বিভিন্ন কাউণ্টিতে বিভক্ত। প্রতি কাউণ্টি ছোট ছোট দুই চারিটি সহর ও কতকগুলি গ্রাম লইয়া গঠিত। এই সকল গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বনিম্ন শাসনব্যবস্থা।

কাউণ্টি শাসনের জন্য কমিশনার বোর্ড নিযুক্ত হয়। সাধারণতঃ কাউণ্টির সকল ভোটারদের ভোটে ঐ বোর্ড নির্বাচিত হইয়া থাকে। নির্বাচিত অথবা নিযুক্ত কর্মচারিগণের সাহায্যে কাউণ্টি শাসনের বিভিন্ন কর্তব্য বোর্ড সম্পন্ন করিয়া থাকে। কাউণ্টিতে পুলিশের অধ্যক্ষ হইতেছেন শেরিফ। ছোট ছোট ফৌজদারি বা দেওয়ানী মামলার বিচার কাউণ্টি আদালতে নিষ্পন্ন হয়। এই আদালতকে Court of the Justice of the Peace বলে। ইহা ব্যতীত কাউণ্টি কোষাধ্যক্ষ, হিসাব পরীক্ষক ও কর ধার্যকারী এ্যাসেসর রহিয়াছে। কর হইতে কাউণ্টির শাসনের খরচ নির্বাহ হয়। জন্ম মৃত্যু বিবাহ প্রভৃতির খতিয়ান রাখিবার ভার কাউণ্টি কেরাণীর (County Clerk) উপর দেওয়া হইয়াছে। অনেক কাউণ্টিতে স্কুল পরিদর্শক রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারি প্রভৃতিও আছে। বলা বাহুল্য বোর্ড কাউণ্টির মধ্যে রাস্তা-পুল নির্মাণ, রক্ষণ প্রভৃতিও আতুর সেবা প্রভৃতির দিকে বিশেষ নজর রাখেন।

কাউণ্টি ম্যানেজার শাসন পদ্ধতিঃ আধুনিক কালে কোন্ কোন্ কাউণ্টি চিরাচরিত কাউণ্টি শাসনব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কাউণ্টি ম্যানেজার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ভোটারগণ অল্প কয়েকজন

সদস্য সমন্বিত একটি কমিশনার মণ্ডলী গঠন করেন। কমিশনারগণ একজন অভিজ্ঞ শাসককে কাউণ্টি ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত করে। কমিশনারগণ হিসাব পরীক্ষক ও সরকারী উকিল (prosecuting attorney) নিযুক্ত করেন ; অন্য সকল কর্মচারীগণকে কাউণ্টি ম্যানেজার-ই নিযুক্ত করেন। কাউণ্টি ম্যানেজার কাউণ্টির করণীয় সকল কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বোর্ডের নিকট সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসাবে দায়ী থাকেন।

ছোট ছোট সহর ও গ্রামের শাসন-পদ্ধতি : একটি ছোট সহর বা গ্রাম অঙ্গরাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট আপনাদের নিজস্ব স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার অনুমতি প্রার্থনা—করিতে পারে। যদি এই অনুমতি তাহারা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে আপনাপন অঞ্চলে এই ক্ষুদ্র সহর বা গ্রাম রাস্তা তৈরী ও সংরক্ষণ, আলোর ব্যবস্থা, জলসরবরাহ, পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপক সংস্থা গঠন, জনস্বাস্থ্যমূলক নিয়মাবলী প্রণয়ন, আবর্জনা অপসারণ, করস্থাপন এবং কাউণ্টির বা স্কুল কেন্দ্রগুলির কর্মচারিগণের সহিত সহযোগিতা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই সকল কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ছোট সহরে বা গ্রামে শাসন বোর্ড বা পরিষদ স্থাপিত হয়। বোর্ড বা পরিষদের সদস্যগণ ছোট সহরটির বা গ্রামের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইরা থাকেন। কোন কোন ছোট সহর বা গ্রাম জনসাধারণের ভোটে ঐ বোর্ডের একজন সভাপতি বা মেয়র নির্বাচন করেন। সাধারণতঃ ছোট সহর বা গ্রামের পরিষদ একজন জনস্বাস্থ্য কর্মচারী ও সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

নিউ ইংল্যাণ্ডের ছোট সহর শাসনব্যবস্থা : উপরোক্ত আলোচনার সূত্রে নিউ ইংল্যাণ্ডের কোন কোন ছোট সহরের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা লক্ষ্যণীয়। বৎসরে অন্ততঃ একদিন সমগ্র ভোটারগণ প্রত্যক্ষ গণসভায় মিলিত হয় এবং স্থানীয় রাস্তা, পুল, ছোটখাট পথ, স্কুল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনান্তে আপনাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাহারা করের হার ধার্য করিয়া দেয় এবং করলব্ধ অর্থ কী ভাবে ব্যয়িত হইবে তাহাও স্থির করে। এই প্রত্যক্ষ গণসভা সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য কর্মচারি নিয়োগ করিয়া থাকে। নিউ ইংল্যাণ্ডের এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ক্ষমতা কোন প্রতিনিধির হস্তে অর্পণ করা হয় না। জনসাধারণই সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। নিউ ইংলণ্ডের ছোট সহর শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দশম পরিচ্ছেদ

সংবিধানের সংশোধন *

(Amendment of the Constitution)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পঞ্চম ধারায় সংবিধান সংশোধনের প্রণালী লিখিত হইয়াছে। সংবিধা[illegible]শোধনের নিয়ম কানুন যেরূপে গঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সংবিধান প্রণেতৃগণ দ্রুত ও অবিবেচনাপ্রসূত সংশোধনের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। এই স্থলে মনে রাখা প্রয়োজন, ১৭৮৯ সালে যে ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র তাহাদের সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা স্বাধিকার সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিল। পাছে সংবিধানের দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহাদের আপন অঙ্গরাষ্ট্রীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, সেই দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল। তাই ফিলাডেলফিয়া সংবিধান সম্মেলনে সংবিধান প্রণেতৃগণ ইচ্ছাপূর্বক সংবিধানটিকে দুষ্পরিবর্তনীয় করিয়া রাখিয়াছেন। এই পন্থা অবলম্বন করায় অঙ্গরাষ্ট্রগুলি নিশ্চিন্ত মনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

সংবিধান বিশেষরূপে দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) বলিয়াই ১৭৮৯ খ্রীঃ হইতে আজ পর্যন্ত মাত্র বাইশটি সংশো[illegible]ীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দশটি পরিবর্তন ম্যাসাচুসেটস্, ভার্জিনিয়া ও নি[illegible] রাষ্ট্রত্রয়কে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আনিবার জন্য ১৭৯১ সালেই গৃহীত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৭৯১ সাল হইতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত মাত্র ১১টি সংশোধন স্বীকৃত হইয়াছে।

সংবিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম লক্ষণীয়। প্রথমতঃ সংবিধান রিবর্তন যদিও বস্তুতঃ আইনগত পরিবর্তন তথাপি তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতির াবশ্যকতা নাই। ঠিক তেমনি অঙ্গরাষ্ট্রের বিধানমণ্ডলী যখন সম্মতি দান Ratify) করে, তখনও অঙ্গরাষ্ট্রীয় গভর্ণর বা রাজ্যপালগণের সম্মতিরও ্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস বা জাতীয় সম্মেলন সংশোধনী প্রস্তাব হণ করিবার কতকালের মধ্যে অঙ্গরাষ্ট্রীয় সম্মতি বা Ratification প্রয়োজন াহার কোন নির্দেশ সংবিধান সংশোধনমূলক পঞ্চম ধারায় নাই। কিন্তু

* আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধন শীর্ষক পরিশিষ্ট এই সূত্রে অবশ্য পাঠ্য

কংগ্রেসের সময় নির্দেশ করিবার অধিকার আছে এবং কংগ্রেস অষ্টাদশ, বিংশ ও একবিংশ সংশোধনের বিষয়ে ৭ বৎসরের সীমা নির্দেশ করিয়াছিল। উপরোক্ত দুইটি ব্যবস্থাই সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মীমাংসিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পঞ্চম ধারায় লিখিত হইয়াছে যে সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাব কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গ্রহণ করিতে পারে। প্রশ্ন উঠিয়াছিল—কংগ্রেসের প্রতি কক্ষের সদস্য-মণ্ডলীর দুই-তৃতীয়াংশ, [illegible] যাহারা কংগ্রেসের কক্ষ দুইটির সভায় উপস্থিত থাকিবেন, তাহাদের দুই-তৃতীয়াংশ। সংবিধানে এই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি লিখিত হয় নাই। যাহা হউক, এই দুই-তৃতীয়াংশের অর্থ এই যে যাহারা অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন তাহাদেরই দুই-তৃতীয়াংশ, মোট সদস্য-মণ্ডলীর দুই-তৃতীয়াংশ নহে—এই মতই গৃহীত হইয়াছে।